মীরা মন বৃন্দাবন

অমিয় সিদ্ধার্থ

সাহিত্য সংস্থা
১৪/এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৯/এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশ কাল : ১লা বৈশাখ ১৩৬৩

প্রচ্ছদ : বিদ্যা অশোক

মুদ্রক :
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২, বিডন রো
কলিকাতা-৯

নিখিল ও বুলবুল-কে
দাদা

"If I know, to Love was to
invite pain
I would have proclaimed
by beat of dram
let none Love,"

"The poems of Mirabai do not cover a wide range of Subjects. They are strictly a form of Self expression, completely dedicated to krishna, It is difficult to gange from her poetry that she had lived in a time of political up heavals and internal intrigues. She did not use her poetry to Criticize religious rituals like kabir, nor did she present a highly idealized portrait of her deity like Tulsidas. She regarded her Seef first and force most a devotee completely absorbed in Krishna. That is why she Sang of Him, not of human beings."

॥ ভূমিকা ॥

মীরাবাঈ বৃন্দাবনে এসেছিলেন পরিণত বয়সে। সাধনার মধ্যপথে। যে সাধনার শুরু কৈশোরে তার পূর্ণ পরিণতি শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণের লীলাভূমিতে। মীরাবাঈ-এর সাধনার সমাপ্তি ঘটেছে কৃষ্ণ দর্শনে। এবং এ দর্শন ঘটেছে ভক্তি মার্গের বিভিন্ন সাধনার পথ ধরে ধরে। তাঁর রচিত সংগীত ভক্তি-ভাবনা ও ভক্তি-রসের পূর্ণকুম্ভ। যে ভাবনা ও রসের উদ্বোধন ঘটেছিল রাজস্থানে। কিন্তু প্লাবিত হয়েছিল সমস্ত ভারতবর্ষে। যা আজও অমলিন ও অজেয়। বাংলাদেশেও মীরাবাঈ হাজির হয়েছেন তার গানের পসরা নিয়ে। ভক্তি-ভাবনা ও ভক্তি-রসের নির্যাস নিয়ে। মীরাবাঈ-এর গান শোনেনি এমন মানুষ দুর্লভ। কৃষ্ণ দর্শনের এমন সেবাব্রতী এবং কৃষ্ণ-রসের এমন সংগীত রচনা আজও অনুপস্থিত। মীরাবাঈ-এর পর ভারতবর্ষে অনেক সাধিকার আবির্ভাব হয়েছে, অনেক সাধিকা সাধনার পরিণতিতে এসে পা দিয়েছেন। কিন্তু-কৃষ্ণ ভজনায় মীরাবাঈ আজও একক ও অনন্যা। কিশোর কালে তার যে কৃষ্ণ-অনুভব, পরিণত বয়সে সে অনুভব দর্শনে ও দীক্ষায় সমাপ্তি।

দীক্ষা তিনি কিশোর কালেই নিয়েছিলেন রুহিদাসের কাছে। কিন্তু সে দীক্ষা ছিল অনুভবের দীক্ষা। অনুসরণের দীক্ষা। যে দীক্ষা পরিণত বয়সে রসের পূর্ণকুম্ভে পরিসমাপ্তি। চিতোর তার যৌবনের লীলাভূমি। বৃন্দাবন তার বার্ধক্যের বারাণসী। চিতোরের বিবাহিত জীবনে সাধনার নৈরাশ্য এলেও নৈরাজ্যে পরিণত হয়নি। সেখানে শ্বশুর মহারাণা সংগ্রামসিংহ ও স্বামী ভোজরাজের অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁকে যৌবনেও যোগিনী হতে সহযোগিতা করেছে। ফলে সাধনায় অগ্রসরতায় কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ও ভোজরাজের আকস্মিক মৃত্যু তার জীবনে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছিল এবং সাধনায় অপরিসিম ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের তৃতীয় পুত্র বিক্রমাজিৎ সিংহ রাণা হয়ে মীরাবাঈ এর ওপর যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল, তাঁর দীর্ঘ সাধনায় যে আঘাত হেনেছিল তা অবর্ণনীয়। তাঁকে হত্যা করবার যে পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিল ইতিহাস তার স্বাক্ষী হয়ে আছে। এবং এ পরিকল্পনা একবার নয় বারবার। কিন্তু কৃষ্ণ অনুভবে এবং কৃষ্ণ ভাবনায় পরিপুষ্ট মীরাবাঈ, বারবার সে পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে কৃষ্ণ-ভাবনা ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী সমুচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। গুরু নানক, কবীর ও চৈতন্যদেবের বাণীর উত্তর সাধিকা হিসাবে মীরাবাঈ অনন্যা। এবং তাদের সর্বধর্ম সমন্বতার বাণীর প্রতিফলন ঘটাতে গিয়েই চিতোরে মীরাবাঈ-কে এই অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। তবুও তিনি চিতোরে সর্বধর্ম সমন্বয়তা এবং বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদ প্রচার থেকে পিছিয়ে আসেন নি। সমস্ত জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন সত্ত্বেও রাণা বিক্রমাজিৎ-এর অত্যাচারে, শেষে মীরাবাঈ-কে চিতোর ছাড়তে হয়েছিল। তিনি সব শেষে অত্যন্ত দুঃখে, হতাশায় এবং চরম নৈরাশ্যে চিতোর ছেড়ে শ্রীবৃন্দাবনে তাঁরই একান্ত অনুগত ভক্ত সনাতনের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন চিতোরে চলেছে নৈরাজ্যের নৃত্যভূমি। বিক্রমাজিৎ-এর জ্যেষ্ঠ রাণারা মৃত। তার মায়েরা মৃত। সর্দার ও সামন্তেরা আগ্রাসী মনোভাবে এগিয়ে আসছে। অপর রাজ্য চিতোর আক্রমণের ·সুযোগ খুঁজছে। আর অন্দর মহলে চলেছে বনবীর আর বিক্রমাজিৎ-এর শাশনহীন রাজত্ব। ফলে শোষণ সর্বত্র। বলগাবিহীন অরাজকতার মধ্যে দাঁড়িয়ে মীরাবাঈ বুঝেছিলেন যে এখানে কৃষ্ণ-ভাবনা

অথবা ভক্তিবাদ প্রচার করা নিরর্থক। তখনই তিনি সনাতনের সহযোগিতায় শ্রীবৃন্দাবনে এসে স্থিতি লাভ করেছিলেন। নৈরাশ্য ও মানসিক নৈরাজ্যের হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন। এবং নিজের মুক্তি খুঁজেছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে এসেই মীরাবাঈ-এর সাধনার যথার্থ উত্তোরণ। কৃষ্ণ-ভাবনা ও কৃষ্ণ-রসের যথার্থ পরিসমাপ্তি।

বার্ধক্যের নিঃসঙ্গ জীবনে সাধনার পরিশেষে তিনি বারবার তাঁর অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করেছেন। চিতোরের স্মৃতি চারণায় তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন শ্বশুর মহারাণা সংগ্রাম সিংহকে এবং স্বামী ভোজরাজকে। স্বামী ভোজরাজের সঙ্গে বেশীদিন সংসার করা তার সম্ভব হয়নি। যুদ্ধে ভোজরাজের আকস্মিক মৃত্যু তাঁর সংসার জীবনে যবনিকাপাত ঘটেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সাধনায় উত্তরণের মধ্যেও তিনি ভোজরাজকে ভুলে যাননি। সেখানে গিরিধারীলালের নিত্য সেবার মাধ্যমে নেপথ্যে ভোজরাজের তিনি সেবা করেছেন। সম্মান-শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ঈশ্বরীয় প্রেমকে এই মর্তভূমিতে নামিয়ে এনে ভোজরাজের স্বপ্ন ও স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আবার অন্য দিকে এই মর্তভূমির শুভ-ভাবনাকে, শুভ-উদ্বোধনকে এবং সব শেষে শ্রীবৃন্দাবনের কৃষ্ণ-ভাবনা ও সাধনাকে ঊর্ধ্বলোকে উত্তীর্ণ করে দিতে নিয়তই চেষ্টা করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন এ পথ সহজ পথ নয়। কণ্ঠকাকীর্ণ এ পথে চলতে গেলে পদে-পদে বাধা। নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের আবর্তে উদ্বেলিত। ঈশ্বরমুখী মন নিয়ে নিজের একান্ত ভক্তি, ভালবাসা ও প্রেম শ্রীকৃষ্ণের পাদ-মূলে পেঁৗছে দেওয়া দীর্ঘ জীবনের তপস্যার ফল। এ ফল জীবনে পাওয়া যাবে এ নিশ্চয়তা সামনে না রেখেই পথ চলা। তারপর পরিশেষে জীবনের শেষ সীমায় এসে হয় প্রাপ্তি। না হলে পরাজয়। তখন দীর্ঘজীবনের পরিশ্রম ও গ্লানির কথা কেউ মনে রাখবে না। কেউ সহানুভূতি জানাবে না। কৃষ্ণ-প্রেমের পথ কঠিন পথ। কণ্টকাকীর্ণ পথ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ আমার প্রতি মন রাখো ঃ আমার শরণাগত হও। তুমি আমার দর্শন পাবে।

সেই আশায় আশায় মীরাবাঈ-এর পথ চলা। তবুও তিনি জীবনের শেষ সীমায় এসে বলেছেন ঃ

"জ্যো মৈ এসা জানতী
  প্রেম কিয়ে দুখ হোঈ।
নগর দিঢ়রা পীটতী
  প্রেম ন কী জৈ কোয় ॥"

"If I know, to love was to invite pain
I would have proclaimed
by beat of dram let none love."

গাঙ্গুলী বাগান গভর্নমেণ্ট কোয়াটারস
ব্লক নং ২৫, টি/২, কলিকাতা—৪৭

॥ গ্রন্থকার।

॥ এক ॥

মীরা মন বৃন্দাবন।

মীরার মন এখন শ্রীবৃন্দাবনে সমাহিত। ভক্ত সনাতনের আশ্রমের আশ্রমিকা। সাধনায় স্থিত প্রজ্ঞা। গিরিধারীলালের নিত্য সেবিকা। পুজো আর গান ছাড়া সে এখন আর কিছুই ভাবে না। চিতোর তার জীবন থেকে মুছে গেছে। ভাবনার আকাশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। চিতোরের রানারা তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নি। যদি করতো তবে তার বাকী জীবনটা অনায়াসেই চিতোরে কেটে যেতে পারতো। গিরিধারীলালের সেবা, পুজো, গান আর চিতোরের সাধারণ মানুষের স্নেহ-ভালবাসার ছায়ায় তার শেষ জীবনটা কেটে যেতে কোনই অসুবিধা ছিল না। চিতোরের সাধারণ মানুষ তাকে ভালবাসতো। সাধু-সন্ন্যাসীরা তার কথা শুনতো। শ্রীবৃন্দাবনে একদিকে যেমন মানুষেরা তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তার নিত্যসেবায় যোগ দেয়, আসরে গান শুনতে আসে, আবার ঠিক তেমনিই তার সমালোচনাতেও মুখর হয়। এখানে এসে মীরা তার সম্পর্কে যেমন ভাল কথাও শুনেছে, তেমন বিরূপ মন্তব্যও কানে এসেছে। সুতরাং ভাল মন্দ মিশিয়েই মীরাবাঈ-এর বৃন্দাবন-জীবন পরিচালিত। কিন্তু লোকে যে যাই বলুক, মীরাবাঈ নিজে জানে যে তার মন বৃন্দাবনবাসিনী। বৃন্দাবনে বসতি।

কিন্তু চিতোরে তা' ছিল না। চিতোরে মীরাবাঈ-এর সমালোচক কেউ ছিল না। সে নিজে রাজমহিষী হয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে আসন পেতেছিল। এই সমবেদনা বোধই তাকে বরণীয় করে তুলেছিল। ফলে সাধারণ মানুষকে নিয়ে সে চিতোরে গিরিধারীলালের অনেক মন্দির তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন যদিও শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি তবুও এখানকার মানুষ মীরাবাঈকে আপন যত বেশী করে, তার চেয়ে পরও কিছু কম করে না। তবুও মীরাবাঈ-এর সঙ্কল্প, এখানে ভক্ত সনাতনের আশ্রম পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, সে গিরিধারীলালের সেবায় এখানকার সকল মানুষকেই নিয়োজিত করতে পারবে। যদি না পারে, তাহলে বুঝতে হবে তার সাধনা ব্যর্থ হয়েছে। গিরিধারীলালের সেবা, পুজো, গান, এ সব ব্যর্থ। তাহলে মীরাবাঈকে বুঝতে হবে, সে এখনও গিরিধারীলালের সেবায় যোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি। বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ভাবে নিজেকে ভাবিত করতে পারে নি। নিজেকে গড়ে তুলতে পারে নি। গিরিধারীলালের সেবা, পুজো, গান, এসব তাহলে পোষাকী। যে কারণেই হোক বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যের সঙ্গে নিজের মন অথবা অন্তরকে যুক্ত করতে পারে নি। যদি সে সত্যিই যুক্ত করতে না পেরে থাকে, তাহলে লোকে তাকে মুক্তিপ্রাণা মীরাবাঈ বলবে না। মীরাবাঈ-এর মাঝে মাঝে মনে হয় বিক্রমাজিৎ সিংহের সঙ্গে তার তর্কযুদ্ধে নামা ঠিক হয় নি। বিক্রমাজিৎ সিংহ তার শ্বশুর মহারাণা সংগ্রাম সিংহের

সেজো ছেলে। বয়সে বড়ই তরুণ। কিন্তু সেই সময় তর্ক যুদ্ধে না নেমেও উপায় ছিল না। সেইজন্যেই মীরাবাঈ মনে করে সে এখনও নিজেকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব করে গড়ে তুলতে পারে নি। কারণ বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যের গোড়াতেই বলা আছে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে তর্ক না করা। এবং তার্কিক লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করা। কিন্তু সেই মুহূর্তে মীরাবাঈ নিজেকে সামলাতে পারেনি।

মহর্ষি নারদ বলেছেন ঃ কখনও তর্ক করবে না।

বেদে বলা হয়েছে ঃ নৈষা তর্কেন মতিরাপ নেয়া—

অচিন্ত্য খলু যে ভাগ নস্তাং তর্কেন যোজয়েৎ

(স্কন্ধ পুরাণ, প্রভাস খণ্ড)

অচিন্ত্য খলু যে ভাব কখনও তাকে তর্কের যোজনা করবে না।

এখন মনে হয় বিক্রমাজিৎ সিংহের খলু ভাব। তার সঙ্গে তর্কে নামা মীরাবাঈ-এর উচিত হয়নি। এখন যেন সবই মীরাবাঈ এর পর পর মনে পড়ছে। কারণ এ সবই তার জানা। কিন্তু সেইদিন, সেই মুহূর্তে সে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল।

মীরাবাঈ জানে কল্যাণ কল্পতরুতে বলা আছে ঃ

আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের খবর লয়ে

বিবাদ না করে বুদ্ধিমান।

বাসুদেব সার্বভৌম বলেছেন ঃ

তার্কিক শৃগাল সঙ্গে কেউ কেউ করি।

সেই মুখে কেমনে বা কহি কৃষ্ণহরি ॥

এ প্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর কথাও মনে পড়ে মীরার। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী একজন পণ্ডিত এবং তার্কিক ব্যক্তি। এখানে তাঁর খ্যাতি আকাশচুম্বী। এমন শ্রীজীব গোস্বামীও একবার এক বিদ্যাভিমানী তার্কিক পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে নেমে শ্রীরূপ গোস্বামীর হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন।

প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনে এসে শ্রীজীব গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল মীরাবাঈ। সে শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গেও শাস্ত্র আলোচনায় বসতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রথমে শ্রীজীব গোস্বামী রাজী হননি। তিনি জানিয়েছিলেন, কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় বসতে তিনি রাজী নন। কারণ এতে সাধনায় ব্যাঘাত হতে পারে।

মীরাবাঈ তার জবাবে জানিয়েছিল, তিনি কেন নিজেকে পুরুষ ভাবছেন। শ্রীবৃন্দাবনে একজনই মাত্র পুরুষ আছেন। তিনি রাইবিলাসী কৃষ্ণ। শ্রীজীব গোস্বামী যদি নিজেকে পুরুষ ভাবেন, তবে বংশীধারী রাইবিলাসীকে শ্রীবৃন্দাবন ছেড়ে চলে যেতে হয়। শ্রীজীব গোস্বামী কি সেটাই চান?

এ প্রশ্নের জবাব দেননি শ্রীজীব গোস্বামী। তিনি শাস্ত্র আলোচনায় বসতে রাজী হয়েছিলেন। মীরাবাঈ শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করে দেখেছে, তাঁর পাণ্ডিত্য প্রায় সাগর-সমান। জ্ঞান, ভক্তি, ধী-শক্তি, সাধনা, অধ্যবসায়—এসবের সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু তিনি তার্কিক ব্যক্তি। তর্কেই তাঁর আনন্দ। ভক্তির চেয়ে যুক্তি। বিশ্বাসের চেয়ে বিশদ আলোচনাই তাঁকে আনন্দ দেয় বেশী। সমস্ত

আনন্দ-সত্তার মধ্যে সমস্ত জাগতিক ও অজাগতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে তিনি একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়ান। অথচ তাঁর দাদা শ্রীরূপ গোস্বামী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়েও সাগরের অতল জলের মত বিরাজমান। তিনি তর্ক করা দূরে থাক, কোন তার্কিক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে নারাজ। সেই কারণেই শ্রীজীব গোস্বামী যখন একজন বিদ্যাভিমানী তার্কিক পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে নেমেছিলেন, তখন তাঁকে শ্রীরূপ গোস্বামীর হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। শ্রীবৃন্দাবনে এ গল্প অধিক প্রচলিত। মীরাবাঈ শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করবার আগেও সে এ গল্প শুনেছে।

শ্রীবৃন্দাবনে এসে মীরাবাঈ মাঝে মাঝে মানসিক দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হতে থাকে। মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। তার মাঝে মাঝেই মনে হয়, সে বোধহয় তার্কিক হয়ে পড়ছে। ভক্তি আর বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে, যুক্তিকেই মুক্তির পথ বলে মনে করছে। কিন্তু মীরাবাঈ-এর ধারণা সে চিরকালই যুক্তির চেয়ে ভক্তিকেই বড় বলে বিশ্বাস করে এসেছে। ভক্তিই মুক্তির পথ বলে দিতে পারে। ভক্তিতে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূরে। এটাই মীরাবাঈ-এর বিশ্বাস। সেই সূত্র ধরেই আজ মীরাবাঈকে আবার নতুন করে শ্রীজীব গোস্বামীর তর্কের গল্পটা মনে মনে ঝালিয়ে নিয়ে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করতে হচ্ছে। নিজের মনে বল আনবার প্রয়োজন অনুভব করছে। সাধনায় যদি বিশ্বাস-আশ্বাস চলে যায়, তা'হলে কার ওপর নির্ভর করে এ অন্তবিহীন পথ পার হবে? কার ওপর অবলম্বন করে নিজেকে সাধনার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে? সুতরাং মীরার বিশ্বাস, নিজের মনে জোর ফিরিয়ে আনতে গেলে, নিজের মানসিক দৃঢ়তা ফিরে পেতে হলে, সাধনায় যাঁরা এগিয়ে আছেন, যাঁরা পণ্ডিত-প্রবর মানুষ, তাঁদের জীবনী বারবার পাঠ করা প্রয়োজন। তাঁদের চারিত্রিক ব্যাখ্যা বার বার আলোচনা করা অথবা শোনা প্রয়োজন। শ্রীজীব গোস্বামী তার্কিক হয়েও সিদ্ধপুরুষ। অথচ তাঁকেও তাঁর দাদা শ্রীরূপ গোস্বামীর কাছে, ঐ তর্কের জন্যে নিদারুণ ভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। পরে অবশ্য শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর ভাইকে ক্ষমা করেছিলেন। তবে লাঞ্ছনার পর।

সারারাত আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মীরাবাঈ অতি ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। এমন ভাবে রাত কাটানো তার জীবনে এই প্রথম। কত রাত কত ভাবে কেটেছে, কিন্তু জীবনে এমন রাত আগে কখনও আসেনি।

মীরাবাঈ মন্দিরের দরজা খুলে চত্বরে এসে দাঁড়ালো। সনাতন এরই মধ্যে স্নান সেরে পুজোয় বসেছে। সনাতনের ভক্তিই সনাতনকে মুক্তির পথ বলে দেবে। এমন মানুষ দু'একজন আসে, যারা ভক্তি ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সনাতন তাদের মধ্যে একজন।

মীরাবাঈ আর দাঁড়ালো না। স্নান সেরে একাকী যমুনাতীরে বংশীবট দর্শন করতে চলে গেল। যমুনাতীরের বংশীবট তাকে কিছুদিন থেকেই টানছে। আজকে মীরাবাঈ তারই নীচে বসে সাধনা করবে। কৃষ্ণ-ভজনা করবে। আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করবে। গান গাইবে।

যমুনাতীরের বংশীবটের নীচে মীরাবাঈ অনেকক্ষণ ধরে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলো। পরে গান ধরলো :

"বাজন দে গিরিধর লাল মুরলিয়া, বাজন দে।
সপ্ত সুরণ লো, মুরলী বাজী, কুহুঁ কালিন্দীতীর
সোর সুনত সুধিনা রহী রহী মেরী, কিত গাগর কিত চির
বৈঠী কদমকে চৌতরা, সব গ্বালন লিয়ো বুলাঈ
খেলত রোকত গ্বালিনী, মুরলী সর্বদ সুনাঈ
পালা ভালে প্রেমকে মেরো, মনধন লৈ গয়ে লুটি
মীরাকে প্রভু সাঁবরে তুম অব কহুঁ জৈ হাঁ ছুটি॥

দেখতে দেখতে সেই বংশীবটের নীচে অনেক ভক্ত জমায়েত হতে লাগলো। তারা মীরাবাঈ-এর গান শুনে মুগ্ধ। শ্রীবৃন্দাবনে মীরাবাঈ-এর গানে সকলেই মাতোয়ারা। সকলেই মীরাবাঈ-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু অমৃতের পাশে চিরকালই গড়ল অবস্থান করে। যেমন একদল মীরাবাঈ-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তেমন কিছু অংশ সমালোচনা ও কুৎসায় মুখর।

॥ দুই ॥

আজ বৈষ্ণব-ব্যাখ্যার দিন। বৈষ্ণব-ধর্মের আলাচনা সভা বসবে। নানা লোকের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে মীরাবাঈ-কে। সুতরাং মানসিক স্থিরতা না এলে অসুবিধা হতে পারে। যথাযোগ্য জবাব নাও হতে পারে। জনসভায় মাঝে মাঝে তার্কিক লোকও দেখতে পাওয়া যায়। যাঁরা অকারণ তর্ক করতে ভালবাসেন। মীরাবাঈ তর্কে অনিচ্ছুক। তার্কিক লোকের সঙ্গ করতেও অনিচ্ছুক। কিন্তু তা হলেও সময়ে সময়ে কোন উপায় থাকে না। অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং যারা এখানে মীরাবাঈ-এর নামে কলঙ্ক রটিয়ে বেড়াচ্ছে, তারাও মাঝে মাঝে এ জনসভায় আসে। মীরাবাঈ এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক। তবুও এদের নিয়ে মীরাবাঈ-এর বিপদেরও শেষ নেই। সুযোগ পেলেই মীরাবাঈ-কে অপমানিত করে বসে। বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে।

ধীরে ধীরে বেশ লোক জমে উঠলো। ভক্ত সনাতন পাশেই বসে। মীরাবাঈ আপন মনে গান গাইছে। ভক্তেরা সে গানে যোগ দিচ্ছে। মন্দিরে গিরিধারীলালের পুজো চলছে। অনেকক্ষণ পরে মীরাবাঈ-এর গান শেষ হল। এবারে বৈষ্ণব-ব্যাখ্যা ও আলোচনা। উপস্থিত সভ্যবৃন্দের দু'জনকে মীরাবাঈ ভালভাবেই চেনে। আগের সভাতেও এরা যোগ দিয়েছিল এবং মীরাবাঈ-কে অপমানিত করবার চেষ্টা করেছিল। এদের এখানে একটি আশ্রম আছে। অনেকদিন আগে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কোন প্রতিপত্তি নেই। লোকসংখ্যাও কম। মীরাবাঈ জানে যে, সে-আশ্রম সকলের দানে ও ভিক্ষায় চলে। ওদের দল মীরাবাঈ-কে একেবারেই দেখতে পারে না। এখানে

মীরাবাঈ-এর এত প্রতিপত্তি ও প্রভাবকে ওরা সুনজরে দেখে না। মীরাবাঈ-এর এখানে কোন দল নেই। মীরাবাঈ-এর কাছে সকলেরই অবারিত দ্বার। বৈষ্ণব-ধর্মে যারা বিশ্বাসী, গিরিধারীলালের নিত্য সেবায় যারা বিশ্বাসী, তারা সকলে অনায়াসেই এ মন্দিরে আসতে পারে। পূজোয় এবং গানে যোগ দিতে পারে। ধর্ম আলোচনায় বসতে পারে। কোন বাধা নেই। সেবা ও সাধনায় বিশ্বাসী মানুষের জন্যেই মীরাবাঈ-এর এই আশ্রম। এই মন্দির।

মীরাবাঈ-এর আশঙ্কা ছিল গতবারের মত এবারেও ঐ দুই ব্যক্তি মীরাবাঈ-কে ধর্ম আলোচনায় বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে। আজ মীরাবাঈ এর মন ভাল ছিল না। কিন্তু তবুও নিজেকে প্রস্তুত করে নিল সে। তারা হঠাৎ কখন কি প্রশ্ন করে বসবে, সেটা মীরাবাঈ-এর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উপস্থিত সকলের সামনে জবাব দিতে না পারলে, ওরা মীরাবাঈ কে অপমানিত করে নিজেরা কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা করবে।

ঘটনা প্রায় সেই প্রকারই দাঁড়িয়ে গেল। উপস্থিত দু'জনের একজন মীরাবাঈ-কে অপদস্থ করবার জন্যে সকলের সামনে প্রশ্ন করে বসলো আচ্ছা বলুনতো বৈষ্ণব কা'কে বলে?

মীরাবাঈ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামনে নিল। তারপর ধীরে ধীরে জবাব দিল। যিনি বিষ্ণুর উপাসক তিনিই বৈষ্ণব।

অপরজন বললোঃ আর একটু ভাল করে ব্যাখ্যা করে আমাদের বুঝিয়ে দিন। অল্পকথায় আমাদের সকলে বুঝতে না'ও পারে।

মীরাবাঈ এবারে নিজেকে সংযত করে জবাব দিল ঃ যে ব্যক্তি সর্বজীবের প্রতি সমভাবাপন্ন, বৈষ্ণবোচিত আচরণ করেন এবং যিনি নিখিল কর্ম শ্রীবিষ্ণুকে অর্পন করেন তিনিই বৈষ্ণব।

লোভ মোহং মদ ক্রোধ কামাদি রহিত সুখী
কৃষ্ণ দাঙ্ঘ্রি শারণঃ সাধুসহিষ্ণু সমদর্শন।

আসরের আর একজন বললোঃ আরও বলুন।

মীরাবাঈ একবার তার দিকে তাকাল! আজ বিপক্ষ দলই বেশী। সে আবার শুরু করলোঃ যে ব্যক্তি একান্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় করে লোভ, মোহ, মদ, ক্রোধ, কাম এবং মাৎসর্য্য ত্যাগ করে, সর্বদা আনন্দ-হৃদয়, সর্বত্র সমদর্শী ও ক্লেশাদি সহিষ্ণু, তিনিই বৈষ্ণব।

যথাল দোহপি সন্তুষ্টঃ সমচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ
হরি পদাশ্রয়ো লোকে শান্ত সাধুর নিন্দকঃ
নি বৈঃ মদয়ঃ শুদ্ধো দম্ভাস্থংকার বর্জিতঃ
নিরপেক্ষ মুনিবীত রাগঃ মাধুরিহোচ্যতে॥

যে ব্যক্তি যথা লাভে সন্তুষ্ট, সমাচিত্ত জিতেন্দ্রিয়, শ্রীহরি পাদপদ্ম সেবা পরায়ণ, শান্ত প্রকৃতি ও পরনিন্দা বর্জিত। যিনি দম্ভ, অহঙ্কারাদি দোষ রহিত, শুদ্ধাচারী, সকলের প্রতি দয়াবান, যিনি কাহারও সহিত শত্রুতা করেন না। যিনি আশক্তি ও অভিমান শূন্য এবং ধীর প্রকৃতির, তিনিই বৈষ্ণব।

আসরের সকলেই চুপ। কেউ কোন কথা বলছে না। মীরাবাঈ দু'একজনের মুখের দিকে তাকাল। যদি কেউ কোন প্রশ্ন করে। কেউ কিছু জানতে চায়। কিন্তু না। যে দু'জন প্রথমে প্রশ্ন তুলেছিল তারাও এখন মাথা নীচু করে। মীরাবাঈ ভাবলো : আপাততঃ এদের শান্ত করা গেল। হঠাৎ ভক্ত সনাতন বলে উঠলো : বৈষ্ণব-ব্যাখায় আরও যদি কিছু থাকে, আপনি এদের শুনিয়ে দিন। বিষয়টা এদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাক।

মীরাবাঈ বললো : না। আর দরকার হবে না।

আসরের একজন বললো : বলুন না। যদি কিছু থাকে। আমরা শুনি। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। মীরাবাঈ হাত ইশারায় তাকে বসতে বলে একটু চিন্তা করলো। এই বৈষ্ণব-ব্যাখ্যা আরও কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু মনে আসছে না। তারপর মনে আসতেই শুরু করলো :

পাষণ্ড সঙ্গ রহিতা বিষ্ণু ভক্তি পরয়ানা :
পর নিন্দাং ন কুবর্ন্তি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবজনা : ॥

যিনি পাষণ্ড সঙ্গ রহিত, বিষ্ণু-ভক্তি পরায়ণ এবং যে ব্যক্তি পরনিন্দা না করেন, তিনিই বৈষ্ণব।

ভগবান শ্রীমুখে ব্রহ্মাকে বলেছেন :

দেবস্বং ব্রাহ্মণ স্বণ্ড পরস্বণ্ড চতুর্ম্মুখঃ
পশ্যতিঃ বিষবৎ যে চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণব জনাঃ ॥

হে চতুরানন! যে ব্যক্তি দেবতার দ্রব্য, ব্রাহ্মণের দ্রব্য এবং পরের দ্রব্য বিষতুল্য জ্ঞান কোরে অপহরণ না করে তিনিই বৈষ্ণব।

একাদশীব্রতং যে চ ভক্তি ভাবেন কুর্ব্বন্তে।
গায়ন্তি সমনামানি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবজনাঃ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্বক আমার নাম কীর্তন করে এবং যথাবিধি একাদশী করেন তিনিই বৈষ্ণব।

মীরাবাঈ-এর ব্যাখ্যা শুনে সকলেই স্তব্ধ। সকলেই মীরাবাঈ-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। বৈষ্ণব-ভাবনায় অন্ততঃ কিছুক্ষণ সকলের মনকে আচ্ছন্ন করে রইলো।

মীরাবাঈ বিপক্ষ দলের দু'জনকে লক্ষ্য করে বললো : আপনাদের বলি শুনুন। আমার আশ্রমের দরজা সকলের জন্যেই খোলা। গিরিধারীলালের পূজা, সাধনা ও আমার সংগীত যাদের ভাল লাগবে, তারাই আমার আসরের সভ্য। তাঁরা অনায়াসেই আমার সভায় আসতে পারেন। সাধনায় যোগ দিতে পারেন ও গান গাহিতে পারেন। অনেকের হয়তো এই ধরনের আলোচনা সভা ভাল না লাগতে পারে। রসহীন মনে হতে পারে। তবে স্থান-মাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে। সাধু-সঙ্গ মাহাত্ম্য বলে একটা জিনিস আছে। আপনারা যদি এ কথা বিশ্বাস করেন, তাহলে জানবেন, এই বিশ্বাসের জোরেই আপনারা আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করবেন। সাধু-সঙ্গের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে একটা

সুন্দর গল্প আছে। গল্পটা অনেকেই জানেন। তবুও আজকে এই আসরে আমরা সকলেই সেই গল্পটা আবার স্মরণ করি।

একজন চোর, চুরি করবার বাসনায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো। রাজপ্রাসাদে রাজা ও রানী জেগে থাকায় চোর গুপ্তস্থানে লুকিয়ে থেকে তাঁদের নিদ্রার প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে রাণী রাজাকে বললো ঃ

'ঘরে, আইবুড়ো মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে,
নাহি ভাব বিবাহের উপায়।'

রাণী বলছেন ঃ আমি প্রতি রাত্রেই আপনাকে এ বিষয়ে অনুযোগ করেছি। কিন্তু আপনার তাতে মনোযোগ হয় না। আপনি মনে রাখবেন ঘরে যুবতী কন্যা থাকলে কুলে কলঙ্ক রটতে পারে। আপনার যেমন অভিরুচি তেমনই করুন। আমি কন্যার বিবাহ সম্পর্কে আপনার কাছে আর কোন কথা বলবো না।

রাণীর এই ধরনের কথা শুনে রাজা বললেন ঃ তুমি আমাকে আর তিরস্কার কোরো না। আজ রাত প্রভাত হলেই আমি তপোবনে যাব। এবং যাকেই সামনে দেখতে পাব তার হাতেই কন্যা দান করবো।

রাজার এই কথা শুনে চোর ভাবলো ধন দৌলত চুরি করে কী হবে। যদি রাজ-কন্যা লাভ করা যায়, তাহলে গোটা রাজ্যটাই আমার হবে। আমি সমস্তই পেয়ে যাব। মনে মনে এই ধরনের একটা পরিকল্পনা করে চোর পরদিন সকালে গৈরিক বসন পরে, গলায় তুলসীর মালা ঝুলিয়ে এবং শ্রীহরি নামাবলী গায়ে দিয়ে, দু'চোখ বন্ধ করে তপোবনের সামনে বসে রইল। এদিকে মহারাজ অতি প্রত্যুষে উঠে কন্যাকে নিয়ে ঐ তপোবনে এলেন। কিছুদূর যেতে না যেতেই পথের পাশেই ধ্যানমগ্ন একজন মহাপুরুষকে দেখে রাজা সাধুর চরণে প্রণাম করে বললেন ঃ প্রভু! আপনি ক্ষণকালের জন্যে এ মিনতি শ্রবণ করুন। এটি আমার কন্যা। আমি আমার কন্যাকে আপনার শ্রীহরি সাধনায় অংশ নেবার জন্যে আপনাকে দান করছি। আপনি আমার কন্যাকে দাসীরূপে গ্রহণ করুন। আমি আমার কন্যার সঙ্গে আমার রাজ্যের এক চতুর্থাংশ দান করবো। এ কথা শুনে চোরের মনেও জ্ঞানের উদয় হল। সে তখন কাঁদতে কাঁদতে বললো ঃ আপনি আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি চোর, ভণ্ড, দুরাচার। কামিনী-কাঞ্চণ প্রয়াসী। আপনার সঙ্গ লাভের পর, আমার আর কন্যা, ধন-দৌলতের কোন কামনা নেই। আপনি আমার গুরু। এই কথা বলে সেই চোর দু'হাত তুলে শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্তন করতে করতে বনে প্রবেশ করলো।

সাধু সঙ্গই ভগবানকে লাভ করবার একমাত্র উপায়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে পরম ভক্ত উদ্ধবকে বলেছেন ঃ

"ন রোধয়তি মাং যোগোন সাংখ্যং ধর্ম এব চ।
ন সাধ্যায়স্ত পস্ত্যা গো নেষ্টা পূর্ত্তংন দক্ষিণা
ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাং সি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎ সঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হিমাম্‌॥

সৎ সঙ্গেন হি দৈতেরা যাতু ধানাঃ খগা মৃগা ঃ
গন্ধর্বাপ্ সরলো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চরণ গুহ্যকা ঃ।
বিদ্যাধরা মনুষ্যযু বৈশ্যা শূদ্রা ঃ স্ত্রিয়োহন্তাজা ঃ
রজস্তম ঃ প্রকৃতয় স্তাস্মিং স্তাস্মিন্ যুগযুগে॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্যাষ্ট্র কায়া ধবাদয় ঃ।
বৃষসর্বা বলির্বানো ময়শ্চান বিভীষণ ঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিকপথ ঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা এজে গোপ্যা যাজ্ঞ পত্ন্যস্তথাবধায়ে।"
[শ্রীমদ্ভগ্যাবত ১১। ১২। ১-৬ শ্লোক]

হে উদ্ধব, অষ্টাঙ্গযোগ, তত্ত্ববিবেকরূপ, সাংখ্য, পরোপকারাদি, ধর্ম, বেদাধ্যায়ণ, তপস্যা, সন্ন্যাস, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, কূপ ও তড়াগাদি নির্মান, দক্ষিনা দান, একাদশ্যাদি ব্রত, দেবতাপূজা, মন্ত্রজপ, তীর্থ যাত্রা, শৌচাদি নিয়ম, ও অহিংসাদি যম প্রভৃতি কিছুতেই আমাকে তাদৃশ বশীভূত করতে পারে না। কেবল অসৎ-সঙ্গ জনিত পাপ নাশক সাধু-সঙ্গই আমাকে বশীভূত বরে থাকে। সাধু-সঙ্গ দ্বারা দৈত্য, রাক্ষস, খাগ, মৃগ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধাচারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধা, বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃধর্ব্বা, বলি, বানরাজা, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার, ধর্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজ গোপীগণ, যজ্ঞপত্নীগণ, এবং পূর্বযুগের মনুষ্যগণের মধ্যে বহুতর রজস্তম স্বভাব বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজ, সকলেই সাধু-সঙ্গের ফলে আমার শ্রীচরণ লাভ করেছে।

সভায় সকলে আজ মীরাবাঈ কে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। মীরাবাঈ আজ সর্বজয়া। সেদিন সভায় সকলেই আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেল। বিপক্ষ দলের কয়েকজন মাথা নীচু করে সভা ত্যাগ করলো। তারা বোধ হয় এতটা আশা করেনি। আজ তারা মনে মনে অনুতপ্ত। সাধু-সঙ্গ ও স্থান মাহাত্ম্যকে তারা স্বীকার করে নিল।

এরপর মীরাবাঈ-এর সব আসরেই তাদের দেখা যেতে লাগলো। ভবিষ্যতে তারা মীরাবাঈ-এর শিষ্যত্ব লাভ করেছিল।

বিপক্ষ দল ধীরে ধীরে মাথা নোয়াতে লাগলো। মীরাবাঈ-এর আন্তরিকতা, মীরাবাঈ-এর সাধনা এবং সংগীত, মীরাবাঈ এর প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হল। মীরাবাঈ-এর ভক্ত-শিষ্য বাড়তে লাগলো। মীরা এখন বেশীর ভাগ সময়ই গিরিধারীলালের মন্দিরের চত্বরে আত্মস্থ ও ভাব-সমাধিস্থ অবস্থায় থাকে। সমস্ত ভক্তবৃন্দ, সাধু-সন্ন্যাসী ও শিষ্য-শিষ্যা তাকে নিয়তই ঘিরে থাকে। মীরা কখনও পূজোয় আত্মমগ্ন, কখনও ধ্যানস্থ। আবার কখনও গানে আত্মভোলা।

মীরার কঠোর সাধনা ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা দেখে সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে লাগলো।

॥ তিন ॥

মীরাবাঈ একদিন অতি-প্রত্যুষে স্নান সেরে গোকুলে বেড়াতে গেল। সেখানে গোকুল নাগের সামনে আত্মসমাধিস্থ হয়ে গান গাইতে লাগলো :

"সখি মোহি লাজ বৈরিণ ভঈ।
চলত লাল গোপাল পিয়া কে সঙ্গ ক্যোঁ না গঈ॥
চলন চাহত গোকুলহি তেরথ সজায়ো নঈ॥
রুকজিনি সঙ্গ জাইবে কো হাথ মীজত রঈ।
কঠিন ছাতি স্যাম বিচ্ছুরত বিরহ ক্যোঁ না গঈ॥
তুরত লিখী সন্দেস্ পিয় কো কাহি পঠউঁ দঈ॥
কুবরী সঙ্গ প্রীতি কীনী মোহি মালা দঈ।
দালি মীরা লাল গিরিধর প্রাণ দক্ষিণা দঈ॥

আত্মস্থ মীরাবাঈ চোখ খুলে তাকাল। সামনে অগণিত জনতায় ভীড়। সকলেই মীরাকে প্রণাম করতে ব্যস্ত। মীরা হাত তুলে সবাইকে থামালো। তারপর বৃন্দাবন লীলার ব্যাখ্যা শুরু করলো। সে ব্যাখ্যা শেষ হতে অনেক রাত।

মীরাবাঈ এখন বেশীর ভাগ সময়ই গানে আত্মভোলা। ভাব-সমাধিতে ভরপুর। মীরাবাঈকে এখন বেশী সময় বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণরত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। সাধন-ভজন আর করে না বললেই চলে। গত রাতে মীরাবাঈ স্বপ্ন দেখেছে সহস্র গোপীনী সহ বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ণের লীলা চলছে। মীরাবাঈও তাদের মধ্যে একজন। সেইজন্যে আজ সকালে মীরাবাঈ বৃন্দাবনের কুঞ্জে চলে এসেছে বংশীধারী কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণ দর্শনের জন্যে। মীরাবাঈ অনেকক্ষণ বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরে বেড়াল। তার সমস্ত অনুভূতি এখন কৃষ্ণময়। কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণ তার সমস্ত দেহমন আচ্ছন্ন করে আছে। মীরা এখন কৃষ্ণময়ী। অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াবার পর মীরা একটি কদম্ববৃক্ষের নীচে ভাব-সমাধিস্থ অবস্থায় রইল। দু'চোখ ধ্যানস্থ। কুঞ্জ তখন জনমানব শূন্য। মীরাবাঈ-এর মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এল :

"আজ হোঁ-দেখ্যো গিরিধারী
সুন্দর বদন মদন কী শোভা, চিতবন অনিয়ারী।
বাজাবে বংশী কুঞ্জল মেঁ
গাবত তাল-তরঙ্গ রঙ্গধুনি, নাচত গ্বালন মেঁ
মাধুরী মুরতি হৈ প্যারি
বসো রহে নিস দিন হিরদৈ মেঁ, টারে, নহী টারী
তা পর তনধন মনবারী।
বহ মুরতি মোহনী নিহারত লোকলজ্জা হারী
তুলসী বন কুঞ্জন মঞ্চারী

গিরিধরলাল নবল নট নাগর মীরা বলিহারী।"

সেদিন মীরাবাঈ দীর্ঘ সময় ঐ গোকুল নাগের সামনে সমাধিস্থ রইল।

॥ চার ॥

এর পরের দৃশ্য দ্বারিকায়। দ্বারিকায় রণছোড়জীর মন্দিরের সামনে মীরাবাঈকে ধ্যানময়ী অবস্থায় দেখা গেল। সকলেই মন্দিরে পূজো দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছু মহিলা মীরাবাঈ-কে চেয়ে দেখেও দেখলো না। মীরাবাঈ-এর কোন হুঁস নেই। সে ভাব-সমাধিতে ভরপুর।

[এখানে বলা প্রয়োজন যে রণছোড়জী মন্দিরের নামটি সম্বন্ধে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে।

[শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিহত করে মথুরা অধিকার করলে, কংসের স্ত্রী নিজের পিতা জরাসন্ধের কাছে গিয়ে তার দুর্দশার কাহিনী ব্যক্ত করেন। জরাসন্ধও শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আর কাল বিলম্ব না করে মথুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে (রণ ছোড়কে) স্ব-পরিবারে দ্বারিকায় গমন করেন। এই জন্যে ভগবানের এক নাম হল "রণছোড়" বা রণছোড়। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা এই রণছোড়-জী নামেই দ্বারিকায় ভগবানের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দ্বারিকায় এই রণছোড়জীর বিগ্রহ এখন আমেদাবাদের কাছে খেড়া জেলার অন্তর্গত ডাকোরে বিদ্যমান। গুজরাট অঞ্চলে রণছোড়জীর উদ্দেশে যে সমস্ত ভজন সংগীত প্রচলিত আছে, তার অর্থ থেকে ভগবানের দ্বারিকা পরিত্যাগ করে ডাকোরে আসবার একটা বিবরণ পাওয়া যায়।

ভগবান তাঁর এক পরম ভক্তকে অনুগৃহীত করবার জন্যে তাঁকে স্বপ্নে আদেশ করেন : তুমি আমাকে ডাকোরে নিয়ে গিয়ে সেবা কর। দ্বারিকার পূজারীগণ তোমাকে আমার বিগ্রহ প্রদান করতে অস্বীকার করলে, তুমি তাদের আমার সমান ওজনে সোনা দিতে স্বীকার কোরো। তখন আমি ওজনে অর্ধরতিরও কম হব। তুমি সেই পরিমাণ সোনা নিয়ে দ্বারকায় যাবে।

স্বপ্নাদেশ অনুসারে ভক্ত অর্ধরতি মাত্র সোনা নিয়ে দ্বারিকায় উপস্থিত হয়ে পূজারীদের কাছে রণছোড়জীর মূর্তিটি প্রার্থনা করলো। কিন্তু তাঁরা বিগ্রহ প্রদানে অস্বীকার করেন। তখন ভক্ত তাঁদের বিগ্রহের সমান ওজনের সোনা দিতে অঙ্গীকার করলে, পূজারীরা লোভে পড়ে ঐ বিগ্রহটি ভক্তকে দান করতে স্বীকার করে, মূর্তিটিকে তুলাদণ্ডের একদিকে স্থাপন করে ভক্তকে অপরদিকে সোনা দিয়ে ওজন করতে বলেন। ভক্ত সোনা রাখলে পূজারীগণ ঐ বিগ্রহের ওজন দেখে অবাক হয়ে যান ও পরে তাকে বিগ্রহটি দান করেন। ভক্ত বিগ্রহটি নিয়ে গিয়ে ডাকোরে প্রতিষ্ঠা করেন।]

এ-হেন মন্দিরের সামনে মীরাবাঈ দীর্ঘ সময় ভাব-সমাধিস্থ থাকার পর গান শুরু করলো :

"দ্বারিকা কো বাস হো মোহি, দ্বারিকা কো বাস।
সংখ চক্র হঁ, গদা, পদ্ম হঁ, তে মিটে জম ত্রাস্‌॥
সকল তীরথ গোমতী মেঁ, করত সদা নিবাস।
সংখ ঝালরি, ঝাঁঝা বাজে, সদা মুখকী রাস
তজ্যো দেলোই বেস পতিগৃহ, তজ্যো সম্পত্তি রাজি
দাসী মীরা মরণ আঈ, তুম হৈঁ অয় সব লাজি।"

দীর্ঘ সময় গানের পর মীরাবাঈ চোখ খুলে তাকালো। মন্দিরের ভীড় তখন অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে। লোকজন বাড়ী ফিরে যেতেই ব্যস্ত। মীরাবাঈ ধীরে ধীরে উঠে আশ্রমের দিকে পা বাড়ালো। কিছু পথ আসতেই ভক্ত সনাতনের সঙ্গে দেখা। মীরাবাঈ ভক্ত সনাতনকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললো ঃ কী সংবাদ সনাতন?

ভক্ত সনাতন বললো ঃ চিতোর থেকে অনন্ত মিশ্র এসেছে।

ঃ কোথায়? এখানে?

ঃ না। শ্রীবৃন্দাবনে। অসুবিধা না থাকলে আপনাকে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরে যেতে বলেছেন।

ঃ চিতোরের সংবাদ কী?

ঃ সে কথা তিনি আমায় কিছু বলেন নি।

ঃ তাহলে আজই শ্রীবৃন্দাবনে ফেরা যাক। কি বলো?

ঃ সেটাই উচিত কাজ হবে। আমার মনে হয় অনন্ত মিশ্র চিতোর থেকে যে খবর এনেছে, সেটা জরুরী।

—মীরাবাঈ আপন মনেই বলে উঠলো ঃ জরুরী। তাহলে চলো।

শ্রীবৃন্দাবনে ফিরে আসতে আসতে মীরাবাঈ ভাবলো অনন্ত মিশ্র চিতোর থেকে কী খবর আনতে পারে? আজ চিতোরের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই। চিতোর আজ তার মন থেকে প্রায় মুছে গেছে। একদিন চিতোর ছিল তার যৌবনের লীলাভূমি। শ্বশুর, স্বামী আর তার ভ্রাতৃবৃন্দ। যুদ্ধ আর যুদ্ধ। শ্বশুর মহারাণা সংগ্রাম সিংহ সারা জীবনে আঠারো বার লড়াই করেছেন এই চিতোর দুর্গ ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। স্বামী ভোজরাজের যুদ্ধে আকস্মিক মৃত্যু! চিতোরের রাণা-পদ পাবার জন্যে ভাইদের মধ্যে ঘরোয়া রাজনীতি। কুটিল ষড়যন্ত্র। আর মহিলা-মহলে রাজ-মহীষীদের কোন্দল। স্বার্থপরতার চূড়ান্ত। সবই দেখেছে মীরাবাঈ। চিতোরের রাণা পরিবারের শেষ সন্তান উদয় সিংহ তার কোলেই মানুষ। মীরাবাঈ-এর সন্তান হীন জীবনে উদয় সিংহ মাতৃত্বের স্বাদ এনে দিয়েছিল। পরিণত বয়সে উদয় সিংহ হয়ে উঠেছিল বীর যোদ্ধা। কিন্তু আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারে নি। আকবর উদয়কে তাড়িয়ে আরাবল্লীর গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে চিতোর গড় দখল নিয়েছিল। উদয় সিংহ সারা জীবনে আর চিতোর দখল নিতে পারে নি। আরাবল্লীর আশেপাশে উপত্যকার সমভূমিতে নিজের প্রাসাদ তৈরী করে রাজত্ব করতে শুরু করেছিল। নাম দিয়েছিল উদয়পুর। এখনও সে সেখানেই আছে।

শ্রীবৃন্দাবনে ফিরে আসতে আসতে মীরাবাঈ-এর অনেক কথাই মনে পড়ল। সবই

চিতোর গড়কে কেন্দ্র করে। চিতোর গড় তাকে কিছুই দেয় নি। শুধু দিয়েছে অবিচার, অত্যাচার আর হিংসার হলাহল। রাণা পরিবারের দুই ভাই রতন সিংহ ও বিক্রমাজিৎ সিংহ তার প্রতি অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। নিষ্ঠুর নির্মমতার পরিচয় দিয়েছিল। অথচ ওদের কাছে মীরাবাঈ কিছুই চায় নি। শুধু চেয়েছিল দু'মুঠো অন্ন। তবুও নিজের জায়গীদারের অর্থাগমের পরিবর্তে। আর চেয়েছিল গিরিধারী-লালের নিত্য সেবা। কিন্তু একলিঙ্গেশ্বরের পূজারীরা তা' মেনে নিতে পারে নি। তারই বিরূপ বন্দোবস্ত হিসাবে শুরু হয়েছিল মীরাবাঈ-এর প্রতি অত্যাচার। ফলে মীরাবাঈ-এর শ্রীবৃন্দাবনে আগমন এবং বসতি। এখন মীরাবাঈ-এর মন বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করেই বৃত্ত অঙ্কিত করে চলেছে। গিরিধারীলালের নিত্য সেবা, আর মাঝে মাঝে দ্বারিকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ। এর মধ্যে চিতোর অথবা সেইসব মানুষের কোন পদশব্দ নেই। কোলাহল-হলাহল নেই। আছে সুন্দরের প্রশান্তি। ব্যংময় ব্যাপ্তি।

এই প্রগাঢ় শান্তিময় জীবনের মধ্যে অনন্ত মিশ্র চিতোর থেকে কী খবর নিয়ে এল? কোন দুঃসংবাদ? কোন দুর্নীতি? কোন দুর্দশার খবর?

বৃন্দাবনে পা রেখেই মীরাবাঈ অনন্ত মিশ্রকে ডেকে পাঠালো। আশ্রমে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই অনন্ত মিশ্র এসে হাজির। সে এসে যে সংবাদ দিল, তাতে নিজেকে আর সামলাতে পারলো না মীরাবাঈ। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এমন একটা দুঃসংবাদের জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। মীরাবাঈ-এর কান্না শুনে ভক্ত সনাতন পাশে এসে দাঁড়ালো। মীরাবাঈ বললো ঃ জানো, উদয় সিংহ মারা গেছে।

ঃ কোথায় মারা গেলেন?

ঃ গোগুণ্ডায়। উদয়পুরের কাছেই।

মীরাবাঈ জানালার কাছে এসে সামনের নদীর দিকে তাকালো। নদীতে কত জল বয়ে গেছে। জীবনের ইতিহাসের কত পাতা লেখা হয়ে গেছে। পুরোনো দিনগুলো মনে পড়লে মীরার মন কেমন যেন বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে। চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মেলে না। কেমন যেন এলোমেলো। উদয় সিংহ মৃত—এই সংবাদটা মীরাবাঈকে আমূলে নাড়া দিয়ে গেল। পুরোনো দিনের ছবি গুলোকে হঠাৎ-ই যেন সামনে নিয়ে এল।

মীরাবাঈ সন্তানহীনা। কিন্তু সে দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল উদয়। উদয় সিংহ মীরার কোলেই মানুষ। মীরা উদয় সিংহকে নিজের পুত্রের মতই ভালবাসতো। চিতোরের মন্দিরে তাকে বসিয়ে রেখে গান গাইতো। পুজো করতো। তারপর তাকে ভোগের প্রসাদ দিত। অবশ্য মীরা জানে যে, উদয় সিংহকে তার কাছে পাঠাবার পেছনে তার মায়ের একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তার মা কারমেতনবাঈ। মীরাবাঈ-এর শ্বশুর মহারাণা সংগ্রাম সিংহের তৃতীয়া স্ত্রী। তিনি মীরাকে হাতে রাখবার জন্যে তাঁর পুত্র উদয়কে মীরার কাছে পাঠাতেন। কারণ তখনকার চিতোরের রাজনীতিতে উদয় সিংহকে রাণা করতে গেলে মীরাবাঈ-এর সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। কারণ মীরাবাঈ-এর সমর্থন থাকার অর্থই মীরাবাঈ-এর জন্মভূমি মেড়তার সমর্থন।

টুকরো টুকরো ঘটনা। ছোট ছোট ছবি। কিন্তু সব মিলিয়ে মীরার জীবনে জড়িয়ে থাকা চিতোরের দীর্ঘ ইতিহাস। যে ইতিহাসে জড়িয়ে আছে সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না আর কুটিল রাজনীতি।

পড়ন্ত সূর্য্যের শেষ মরা-আলোয়, মীরাবাঈ-এর মরা-মনটাও কেমন যেন হাতড়ে হাতড়ে পুরোনো স্মৃতিতে ফিরে আসতে চাইছিল। উদয় সিংহের মৃত্যু সংবাদ মীরাবাঈকে সেই পুরোনো স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

ভক্ত সনাতন সামনে এসে দাঁড়াতে মীরাবাঈ বললো ; আজ আমার মন ভাল নেই। আমার কৃষ্ণ-নাম শুনতে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের অন্য দিন আসতে বলো।

ভক্ত সনাতন মাথা নেড়ে চলে গেল। মীরাবাঈ সামনের, নদীটার দিকে আবার তাকালো। নদীতে কলকলিয়ে বয়ে যাওয়া জল, যেন জীবনের ইতিহাস। যেন সমানে পাতা উল্টিয়ে চলে যাচ্ছে।

শেষ সূর্যের মরা-আলোও শেষ হয়ে এলো। এখন নদীর বুকে চাপ চাপ অন্ধকার জমা হচ্ছে। ভয়াবহ রাতের সংকেত। এই ভয়াবহ রাতের কথা মনে হলেই মীরাবাঈ-এর সমস্ত শরীরটা কেমন যেন কেঁপে ওঠে। আজ উদয় মৃত। স্বাভাবিক ভাবেই মৃত। কিন্তু চিতোরের রাজনীতিতে উদয়ের মৃত্যু হতো অনেক আগে। যদি মীরাবাঈ তাকে না বাঁচাতো, তাহলে বনবীর অনেক আগেই তাকে হত্যা করতো। এ কথা সূর্যের মতে সত্য। দিনের আলোয় মত সত্য। সেই দুর্যোগ ভরা অভিশপ্ত রাতে মীরাবাঈ যদি নিজে এগিয়ে না আসতো, সেই ভয়াল কুটিল রাতে মীরাবাঈ যদি চিতোরের রাজনীতিতে মাথা না দিত, তবে উদয় সেই রাতেই বনবীরের হাতে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হত। উদয়ের মা কারমেতনবাঈ-এর সাধ্য ছিল না উদয়কে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর। চিতোরের কথা মনে হলেই তার মনে হয় যেন ঘটনাগুলো তার সামনে পর পর ছবির মত ঘটে যাচ্ছে।

॥ পাঁচ ॥

মহারানা সংগ্রাম সিংহ মীরাবাঈ এর শ্বশুর। অমন বীর, যোদ্ধা, দেশনেতা দুর্লভ। চিতোর গড়ের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আর সেই সঙ্গে লেখা আছে, বীর হাম্বীর, চুণ্ডা, মহারাণা কুম্ভ ও ভামা শা-র মত বীর পুরুষদের নাম। এরা ইতিহাসে অমর। চিতোরের প্রতিটি ইট, পাথর এঁদের বীরত্বে ও বীর্য্যে উজ্জ্বল।

চিতোর। স্বামী ও শ্বশুরের স্নেহধন্যা মুক্তিপ্রাণা মীরাবাঈ-এর যৌবনের লীলাভূমি। কৃষ্ণ প্রেমিকা মীরাবাঈ-এর সাধনার পীঠস্থল। চিতোরের কথা মনে হলেই মীরা কেমন যেন আপন ভোলা হয়ে যায়। অন্য মনস্ক হয়ে পড়ে।

আজকের এই দুঃসংবাদের দিকে সামনের ঐ গোমুখী নদীর তরতরিয়ে বয়ে

যাওয়া জলের দিকে তাকিয়ে মীরাবাঈ-এর চোখে কেমন যেন জল এল। মনে পড়ে গেল উদয় সিংহকে লক্ষ্য করেই গড়ে ওঠা এক পঙ্কিল রাজনীতির কথা।

মহারানা সংগ্রাম সিংহ তখন গুজরাট সীমান্তে লড়াইয়ে ব্যস্ত। সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে গুজরাট ঘিরে ফেলেছেন। যুদ্ধ অনিবার্য। এদিকে চিতোরে বসে সে যুদ্ধের সুযোগ নিচ্ছে মহারানারই মধ্যম পুত্র রতন সিংহ। সঙ্গে রয়েছে বনবীর আর মালদেব। বনবীর আর মালদেব রতন সিংহকে নিয়ে রাতের পর রাত গোপনে পরিকল্পনা করছে মহারানা সংগ্রাম সিংহের অনুপস্থিতিতে রতন সিংহকে চিতোরের রানা করবার। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের তৃতীয় স্ত্রী কারমেতনবাঈ-এর দুই পুত্র ও এক কন্যা। বিক্রমাজিৎ সিংহ ও উদয় সিংহ। আর কন্যা উদাবাঈ। বিক্রমাজিৎ সিংহ পিতার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত। চিতোরে রয়েছে কারমেতন বাঈ-এর ছোট ছেলে উদয় সিংহ ও কন্যা উদাবাঈ। গভীর রাতে ঘরের দরজা এঁটে পরিকল্পনা চলছে। বনবীর আর মালদেব চাইছে মহারাণা সংগ্রাম সিংহের অনুপস্থিতিতে, রতন সিংহকে রাণা বলে ঘোষণা কোরে, তার মা ধনবতীবাঈকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করা হোক।

মীরাবাঈ জানে এ প্রস্তাবে রতন সিংহ প্রচণ্ড ভাবে আপত্তি জানিয়েছিল। সে বলেছিল ঃ না। না। সেটা হতে পারে না। পিতা এখনও বেঁচে। তিনি গুজরাট সীমান্তে যুদ্ধে ব্যস্ত। পিতার বিরুদ্ধে সে যেতে পারবে না। এটা নীতি বিরুদ্ধ কাজ হবে। সমস্ত চিতোর হয়তো তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও যেতে পারে। অথবা তার কলঙ্ক রটনায় মুখর হতে পারে। এ কাজ সে কিছুতেই করতে পারবে না।

মীরাবাঈ জানে রতন সিংহ এ কথা বলে চলে যাচ্ছিল! কিন্তু বনবীর নিজের তলোয়ারে হাত রেখে রতন সিংহকে ভয় দেখিয়েছিল। মৃত্যু ভয়। থমকে দাঁড়িয়েছিল রতন সিংহ। সে তার মামা মালদেবের দিকে তাকিয়েছিল। মালদেব তখন রাজী হয়ে যেতে অনুরোধ করেছিল। রতন সিংহ পরিষ্কার বুঝেছিল যে, এটা সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। সে বুঝেছিল, সেই মুহূর্তে রাজী না হলে জীবন বিপন্ন হতে পারে। সে ভয়ে ভয়ে রাজী হয়ে গিয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, এই সভার পরের দিন অতি প্রত্যুষে রতন সিংহকে চিতোরের রাণা বলে ঘোষণা করা হবে। কারণ তারা জানতো যে, এ খবর মহারাণা সংগ্রাম সিংহের কাছে পৌঁছুতে, এবং তার যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে ফিরে আসতে, বেশ কিছু সময় চলে যাবে। সুতরাং তার মধ্যেই শাসন যন্ত্র পাকা করে নেওয়া যাবে। অন্যান্য রাজ্যের রাজাকেও অনায়াসেই জানিয়ে দেওয়া যাবে যে, মহারাণা সংগ্রাম সিংহ চিতোরের কেউ নয়। চিতোরের বর্তমান রাণা রতন সিংহ। যদিও বনবীর ও মালদেব জানতো যে রতন সিংহ রাণা হবার অর্থ রাজ্যের শাসন যন্ত্র তাদেরই হাতে থাকা। রতন সিংহের মা ধনবতীবাঈ যদিও প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু রাজ্য চালাবে তারাই। তাদের কথাতেই প্রজারা শাসিত হবে। তাদের ধারণা ছিল, বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা তাদের সম্মান জানিয়ে উপঢৌকন পাঠাবে। সবই পরিকল্পনা। মীরাবাঈ পরে

জেনেছিল। সেই ভয়াবহ কুটিল কালো রাতে আরও একটি পরিকল্পনা ওরা পাকা করেছিল, সেটা হচ্ছে উদয় সিংহকে হত্যা। উদয় সিংহের মা ও ছোট বোন উদাবাঈ কে বন্দী করে রেখে উদয় সিংহকে হত্যা। গভীর ষড়যন্ত্র। সেই কুটিল রাতে ওরা গভীর ষড়যন্ত্রে নেমেছিল।

উদয় সিংহ আজ মৃত। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তার মৃত্যু হয়েছে। অনেকদিন সে চিতোরে রাজত্ব করেছে। পরে চিতোর থেকে বিতাড়িত হয়ে আরাবল্লীর গভীর গুহায় দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থেকেছে। উদয় সিংহের সংগ্রামী জীবন। আজকে চিতোরের সঙ্গে মীরাবাঈ এর কোন সম্পর্ক নেই। আজ মীরাবাঈ বৃন্দাবন বাসিনী। কৃষ্ণ সাধিকা। কৃষ্ণের গভীর প্রেমে, কৃষ্ণের গভীর উপাসনায় সে আজ নিজেকে নিয়োজিত করেছে। কিন্তু তবুও উদয় সিংহ তার কোলেই মানুষ। তার সন্তানহীনা জীবনে উদয় সিংহ-ই তাকে মাতৃত্বের আস্বাদন দিয়েছিল। সেইজন্যেই উদয় সিংহের মৃত্যুর সংবাদে আজ মীরাবাঈ-এর দু'চোখ ভরা জল। কান্নার বন্যা।

সামনের নদীতে কত জল। চিতোরের জীবনে কত ঘটনা। আজ চিতোর ইতিহাস হতে চলেছে। বীরত্বের, বীর্যের আর বিষাদের ইতিহাস।

উদয় সিংহের হত্যার সেই কুটিল ষড়যন্ত্রের রাতে ওরা ভেবেছিল, যদি উদয় সিংহকে হত্যা করা যায়, তবে রতন সিংহের এই মহারাণার পদ নিষ্কণ্টক হবে। বাধা দেবার আর কেউ থাকবে না। কারণ বিক্রমাজিৎ সিংহ মহারাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে গুজরাট সীমান্তে যুদ্ধে ব্যস্ত। তাদের ফিরে আসতে অনেক দেরী। তারপরেও যদি মহারাণা সংগ্রাম সিংহকে চিতোরে ঢুকতে না দেওয়া হয়, তবে বিক্রমাজিৎ সিংহ ও চিতোরে আসতে পারছে না। সুতরাং নিরাপদ রতন সিংহ।

কিন্তু তবুও, এ ব্যাপারে রতন সিংহকে সম্পূর্ণ ভাবে দোষী করা যাবে না। কারণ মীরাবাঈ জানে যে, উদয় সিংহের হত্যার পরিকল্পনায় রতন সিংহ অংশ নেয় নি। রতন সিংহ জানতো না যে, উদয়কে সেই রাতেই হত্যা করা হবে।

মীরাবাঈ জানতো এ পরিকল্পনা মুখ্যতঃ বনবীরের। পৃথ্বীরাজের জারজ পুত্র বনবীর। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ দয়া করে এই জারজ পুত্রকে তাঁর সেনা বিভাগের উচ্চ পদে স্থান দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন বিশ্বস্ত। স্নেহ পরায়ণ ও নির্লোভ। সেই বনবীর সেইদিন মহারানা সংগ্রাম সিংহের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মহারাণারই ছোট ছেলে উদয়কে হত্যা করে নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টা করেছিল। ইতিহাসের এই কলঙ্কিত অধ্যায় মানুষ কোনদিন ভুলবে না। মানুষ কোনদিন বনবীরকে ক্ষমা করবে না।

উদয় সিংহের হত্যার পরিকল্পনা পাকা। এখন শুধু কাজে নেমে পড়া। ঠিক হয়েছিল রতন সিংহ নিজে হাতে কিছুই করবে না। কাজ যা করবার, করবে বনবীর আর রতন সিংহের মামা মালদেব। তবে মুখ্য কাজ বনবীরের।

সেইদিন সেই ভয়াবহ রাতে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের পরিকল্পনা শুনে শিউরে উঠেছিল মীরাবাঈ। কী জঘন্য আর নিদারুণ পরিকল্পনা। ভাবতেও

অবাক লাগে মীরাবাঈ-এর। রাণা হবার জন্যে পিতার বিরুদ্ধে পুত্র যুদ্ধে নামছে। নিজের ভাইকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। চিতোরে সেদিন ছিল দারুণ দুর্দিন। অথচ ভাগ্যের কি করুণ পরিহাস যে সেই চিতোর রক্ষার জন্যেই সেদিন মহারাণা সংগ্রাম সিংহ গুজরাট সীমান্তে দিনের পর দিন যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধে যাবার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন যে যুদ্ধ জয় না করে তিনি চিতোরে ফিরবেন না। সেই যুদ্ধে তাঁর জয় ছিল অনিবার্য। তিনি সেদিন চিতোরের মান, সম্মান এবং আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখতে জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। সেই স্বদেশ প্রেমিক, দেশভক্ত, প্রধান যোদ্ধাকে তাঁরই পুত্র ষড়যন্ত্র করে মহারাণার পদ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। মহারাণাকে চিতোরে ঢুকতে না দেবার ফন্দী এঁটেছিল। তাঁকে চিতোরের বাইরে যুদ্ধে পরাস্থ করবার জন্যে চিতোরের অভ্যন্তরে দল গড়া হয়েছিল। সমস্ত সর্দারদের নির্দেশ মত একত্রিত করা হয়েছিল। সব চেয়ে দুর্ভাগ্য এবং বিচিত্র এই যে মহারাণার দ্বিতীয় স্ত্রী ধনবতীবাঈ নিজেই এর পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী। হাসলো মীরাবাঈ। ধনবতীবাঈ এর দীর্ঘদিনের আশা তার পুত্র রতন সিংহ রাণা হবে। এ আশা তিনি মনে মনে পোষণ করতেন মহারাণা সংগ্রাম সিংহের বড় ছেলে ভোজরাজের মৃত্যুর পর থেকেই। ভোজরাজের মৃত্যুর কথাটা মনে হতেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো মীরাবাঈ-এর। তাঁর স্বামী। অমন মানুষ বিরল। বেশীদিন বাঁচেন নি। চিতোরের কোন এক যুদ্ধে আহত ও পরে চিতোরে মারা যান। মীরাবাঈ-এর মাঝে মাঝেই মনে হয় যে ভোজরাজ বেঁচে থাকলে আজ চিতোরের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। কিন্তু সবই ভাগ্যের পরিণতি। নিয়তির লিখন।

গুজরাটের যুদ্ধে মহারাণা সংগ্রাম সিংহ যখন রতন সিংহকে বাদ দিয়ে বিক্রমাজিৎ সিংহ কে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তখনই ধনবতীবাঈ-এর মনে এক গোপনে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, মহারাণা সংগ্রাম সিংহ হয়তো রতন সিংহ কে বাদ দিয়ে বিক্রমাজিৎ সিংহকেই ভবিষ্যতে রাণা করবার কথা ভাবছেন। এবং তিনি হয়তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেই এ কথা ঘোষণা করে বসবেন। অথচ ভোজরাজের মৃত্যুর পর এ পদ রতন সিংহের-ই স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্য। এই চিন্তাই ধনবতীবাঈকে অবিরাম তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল। এবং এই চিন্তার বশবর্তী হয়েই ধনবতীবাঈ এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি জানিয়েছিল। যদিও এ ষড়যন্ত্র ছিল তাঁরই স্বামীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তবুও—তবুও তাঁর পুত্রকে রাণা করতে গেলে অন্য কোন পথ আর খোলা ছিল না।

সিদ্ধান্ত পাকা। ষড়যন্ত্র পাকা। পরিকল্পনা পাকা। এখন শুধু কাজে নেমে পড়া। সেই দিন সেই মুহূর্তে মীরাবাঈ-এর কানে যখন এই ষড়যন্ত্রের খবর এসেছিল, মীরাবাঈ উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিল। উদয় সিংহকে হত্যার ষড়যন্ত্র। এত বড় সাহস। উদয় সিংহ তারই কোলে মানুষ। সন্তানহীনার জীবনে সন্তানের স্বাদ উদয় সিংহ। সুতরাং এ হতে পারে না। এ হতে দেবে না মীরাবাঈ। সেদিন উত্তেজনায় বশে মীরাবাঈ উদয় সিংহকে বাঁচাবার জন্যে অনেক কিছু করেছিল। আরেকটা বিপরীত পরিকল্পনায় নেমেছিল। একদিকে উদয় সিংহকে হত্যার ষড়যন্ত্র।

অপর দিকে তাকে বাঁচাবার পরিকল্পনা। যার মুখ্য ভূমিকায় সেদিন মীরাবাঈ নিজেই দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু আজ আর মীরাবাঈ-এর কোন উত্তেজনা নেই। নিথর পাথর একটা মন নিয়ে ভক্ত সনাতনের আশ্রমে পরিপূর্ণ কৃষ্ণসাধিকা।

অনন্ত মিশ্র চিতোর থেকে উদয়সিংহের মৃত্যুর সংবাদ এনেছে। সেইজন্যে মীরাবাঈ-এর মনে আজ এক রাশ উদ্বেলিত কান্না। সন্তানহীনা মায়ের কান্না। নদীর কত জল চিতোর গড়ের কত রক্তাক্ত ইতিহাস ধুয়ে দিয়েছে। কত উত্তেজনা হীম-শীতল করে দিয়েছে। মহাকাল বিস্মৃত করে দিয়েছে।

কিন্তু উদয় সিংহের মৃত্যুর ষড়যন্ত্র মীরাবাঈ আজও বিস্মৃত হয়নি। ভাবলে আজও উত্তেজনা আসে।

সেদিনও উত্তেজনার বশেই মীবাবাঈ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে এ অন্যায়, এ অবিচার, এ কুটিল ষড়যন্ত্র, যে ভাবেই হোক রুখতেই হবে। সে তাড়াতাড়ি নিজের মন্দিরে চলে এসে অত্যন্ত গোপনীয় ও জরুরী এক পত্র লিখেছিল। তারপর নিজের এক ভক্ত শিষ্য কে ডেকে বলেছিল ঃ পত্রখানা অত্যন্ত গোপনীয় এবং জরুরী। তুমি এই পত্র খানা নিয়ে চিতোরের সুরঙ্গ পথ ধরে গাম্ভরী নদীতে চলে যাবে। সেখানে নৌকায় নদী পার হবে। লক্ষ্য রাখবে কেউ যেন তোমার পিছু না নেয়। তারপর ঘোড়ায় চড়ে সোজা চলে যাবে গুজরাট সীমান্তে। সেখানে মহারাণা সংগ্রাম সিংহ যুদ্ধে ব্যস্ত আছেন। তুমি তাঁকে এই পত্রখানা দেবে। আর এই নাও আমার অঙ্গুরীয়। এই অঙ্গুরীয় দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে, আমি তোমায় পাঠিয়েছি। পত্রের জবাব আনবার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু তাঁর হাতে দিলেই চলবে। যাও বেরিয়ে পড়। দেরী কোরো না। চিতোরে আজ ভয়ানক দুর্দিন। এই কুটিল ষড়যন্ত্র যে ভাবেই হোক ঠেকাতেই হবে।

সেদিন লোকটি মীরাবাঈকে কুর্নিশ জানিয়ে চলে গিয়েছিল। মীরাবাঈ সেখানে দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা করেছিল, তারপর চলে এসেছিল কারমেতনবাঈ-এর মহলে। সেখানে প্রহরী দাঁড়িয়ে। সে মীরাবাঈকে দেখে সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়েছিল। মীরাবাঈ কারমেতনবাঈয়ের মহলে ঢুকে সোজা তার কাছে চলে গিয়ে সমস্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিল।

সব শুনে কারমেতনবাঈ অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। বলেছিল ঃ এখন কী হবে মীরা? তুমি বলো এখন কী হবে? মহারানা বিক্রমাজিৎ অনুপস্থিত। আমার মাথায় কিছু আসছে না। তুমি যা' হয় কিছু একটা কর। দেখো উদয়কে বাঁচাতে পার কিনা। উদাবাঈকে সরিয়ে দিতে পার কিনা। উদয় তোমার কোলেই মানুষ।

মীরাবাঈ বলেছিল ঃ আপনি অধীর হবেন না। আমি দেখছি। বিপদে অধীর হলে কাজ হবে না। আপনি স্থির হয়ে বসুন। মীরাবাঈ আর দেরী না করে সে-মহল ছেড়ে সোজা চলে এসেছিল পান্নাবাঈয়ের কাছে। গভীর রাত। নিস্তব্ধ চিতোর। শুধু সতর্ক প্রহরীদের আনাগোনা ছাড়া, সমস্ত রাজমহিষীদের মহল

অন্ধকারে ঢাকা। সকলেই ঘুমে আচ্ছন্ন। অথচ সেই রাতেই চিতোরের ইতিহাস পাল্টিয়ে যাবে। আগামীকাল ভোরেই ঘোষণা করা হবে, মহারানা সংগ্রাম সিংহ আর চিতোরের অধিপতি নন। চিতোরের অধিপতি মহারানারই মধ্যম পুত্র রতন সিংহ। বনবীরের মহলে সে ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরী হচ্ছে। আর এ ষড়যন্ত্রের নায়ক তিনজন। বনবীর, রতন সিংহ ও মালদেব। রতন সিংহের মা ধনবতীবাঈ এ ষড়যন্ত্রের নেপথ্য-নায়িকা। কিন্তু মীরাবাঈ ঠিক করে নিয়েছিল যে সব জেনেশুনে এ অন্যায় মাথা পেতে নেবে না। তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সে করবে। সে মাথা তুলে প্রতিবাদ জানাবে। গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেবে। পান্নাবাঈ-এর ঘরের সামনে আসতেই প্রহরী সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

মীরাবাঈ বলেছিল ঃ আমি মীরাবাঈ।

প্রহরী কুর্নিশ করে সরে দাঁড়িয়েছিল। আজ মনে পড়ছে, মীরাবাঈ পান্নাবাঈ-এর ঘরে ঢুকে পড়েছিল। সেদিন সেই মুহূর্তে কী উত্তেজনা। এখনও ভাবলে সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। এখন মীরাবাঈ ভাবে, সেদিন কীভাবে, সে একাজে এগিয়ে গিয়েছিল। কোথা থেকে সেদিন সে এত সাহস পেয়েছিল। হয়তো গিরীধারী-লালের ইচ্ছা। গিরীধারীলালই তাকে সাহস জুগিয়েছিল। হয়তো এ তার সাধনারই ফল।

পান্নাবাঈ এর ঘরে ঢুকে মীরাবাঈ অবাক হয়ে গিয়েছিল। চিতোরের ইতিহাস পাল্টে যাচ্ছে, অথচ পান্নাবাঈ অঘোরে ঘুমিয়ে। সে জানে না চিতোর আজ কী হতে চলেছে। পাশের পালঙ্কে শুয়ে উদয়। নীচে পান্নাবাঈ-এর একমাত্র পুত্র।

মীরাবাঈ তাড়াতাড়ি পান্নাবাঈকে জাগিয়ে তুলে সব ঘটনা খুলে বলেছিল। মীরাবাঈ-এর কথা শুনে পান্নাবাঈ প্রথমে বিশ্বাস করে নি। অবাক-বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকিয়েছিল। মীরাবাঈ তাকে আবার বোঝালো। তখন পান্নাবাঈ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। মীরাবাঈ ধমকে উঠে বলেছিল ঃ এখন কান্নার সময় নয় পান্না। উদয় চিতোরের ভাবী রাণা। ভাবী বংশধরও। উদয়কে তুমি মানুষ করেছ। তাকে বাঁচানো তোমার কর্তব্য। এ কাজ তোমাকে করতেই হবে! তুমি তোমার ছেলেকে রাজপুত্রের পোষাক পরিয়ে উদয়ের বিছানায় শুইয়ে দাও। বনবীর জানুক এই উদয়।

সেদিন মীরাবাঈ এর কথা শুনে পান্নাবাঈ পাহাড় ভাঙ্গা ঝর্ণার মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। বলেছিল ঃ না, না। এ আমি পারবো না। পারবো না। আমি মা হয়ে এ কাজ করতে পারি না।

মীরাবাঈ পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল ঃ মনকে শক্ত করো পান্না। আমরা রাজপুত রমণী। আমাদের ভেঙ্গে পড়লে চলে না। দেরী কোরো না পান্না। তোমার বিশ্বস্ত নাপিতকে ডাকো। ওকে বলো একটা বড় ফলের ঝুড়িতে উদয়কে শুইয়ে ভাল করে পাতা চাপা দিয়ে, রাতের গভীর অন্ধকারে চিতোরের পশ্চিম প্রান্তে বেরীশ নদীর তীরে নিয়ে চলে যাক। সেখানে আমার বিশ্বস্ত লোক তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তুমি একটু পরে বেরীশ নদীর তীরে ঐ নাপিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

তারপর উদয়কে নিয়ে দেবলনগরে পালিয়ে যাবে। সেখানে বীর বাঘজীর ছেলে সিংহরাও আছেন। তুমি আমার নাম করে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। দেরী করবার আর একটুও সময় নেই। উদাবাঈ কোথায়?

পান্নাবাঈ কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল; পাশের ঘরে।

মীরাবাঈ বলেছিলঃ ওকে ডেকে আনো। আমি আমার মন্দিরে নিয়ে যাবো। আর একটু পরেই ওর মায়ের মহল আক্রান্ত হবে। উদয়ের মা কারমেতনবাঈকে বন্দী করে তাঁর লোকজন, অনুচর ও প্রহরীদের হত্যার হুকুম আসবে।

সেদিন পান্নাবাঈ উদাবাঈকে মীরার কাছে নিয়ে এসেছিল। উদাবাঈ বলেছিলঃ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো।

মীরাবাঈ বলেছিলঃ চুপ। কোন কথা বোলো না। আমার মন্দিরে চলে এস।

মীরাবাঈ সেদিন উদাবাঈকে নিজের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছিল।

আজকে উদয়ের মৃত্যু সংবাদকে কেন্দ্র করে, অতীতের সেই দিনগুলো যেন ছবির মত মীরাবাঈ-এর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সেদিনও ছিল উদয়ের মৃত্যুর দিন। আজ মীরাবাঈ অতীতের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়িয়ে। চিতোরের অতীত ইতিহাসের প্রামান্য দলিল। কিন্তু বর্তমানে সে বৃন্দাবনবাসিনী কৃষ্ণ সাধিকা। আজ সে তার অতীত ইতিহাসকে ভুলে যেতে চায়। আজ তার মন বৃন্দাবন। বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণ বিলাসে নিবেদিতা।

॥ ছয় ॥

সেদিন উদাবাঈ-কে নিজের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেই মীরাবাঈ-এর সমস্যা মেটেনি। তখন সে কিছু সময় ঐ মন্দিরের চত্বরে নিঃসঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। নিশ্চুপ কিছু মুহূর্ত। তারপর মন্দিরের ভেতর থেকে নিজের বহুদিনের তলোয়ার খানা হাতে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। রাতের অন্ধকারে চাদের আলোয় সে তলোয়ার চিক্ চিক্ করতে লাগলো। এত চাঁদের আলো সত্ত্বেও পূবের আকাশে পুঞ্জিভূত মেঘ। মারাবাঈ এর সেদিন মনে হয়েছিল, চিতোরের বুকে আজ কী ইতিহাস লেখা হবে কে জানে!

হঠাৎ কারমেতনবাঈ-এর মহলের দিক থেকে একটা চিৎকার, একটা গোলমাল, একটা আর্তনাদ আর অস্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল মীরাবাঈ। মনে হয়েছিল, কিছু লোককে হত্যা করা হল। কিছু বন্দী। পান্নাবাঈ এর কান্নার আওয়াজ কানে এল। মীরাবাঈ সেদিন দেখেছিল পান্নাবাঈ-এর ঘর থেকে খোলা তলোয়ার হাতে বেরিয়ে গিয়েছিল বনবীর। সে দৃশ্য যে কী ভয়াবহ, আজ মনে পড়লে মীরাবাঈ নিজের অজান্তেই কাঁপতে থাকে। আজ এ দৃশ্য সহ্য করবার মত ক্ষমতা তার নেই।

কিন্তু সেদিন মীরাবাঈ তার খোলা তলোয়ারখানা শক্ত হাতে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

বনবীর টানা পায়ে মীরাবাঈ-এর সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে রক্তাক্ত তলোয়ার। বনবীর সেদিন মীরাবাঈ-এর হাতে খোলা তলোয়ার দেকে চমকে উঠে বলেছিল : সাধিকার হাতে খোলা তলোয়ার। এটা নিতান্তই বেমানান।

মীরাবাঈ সেদিন কঠোর গলায় বলেছিল : খুব সত্যি কথা। তবে প্রয়োজনেই আমাকে এটা হাতে নিতে হয়েছে। তুমি হয়তো জানো বনবীর, আমার দাদু আমাকে আর আমার ভাই জয়মলকে ভাল করে অসি চালনা শিখিয়েছিলেন। তীরন্দাজ করে গড়ে তুলেছিলেন। সেই সময় জয়মল ও আমার মত ঘোড়ায় চড়তে কেউ পারতো না। আমি সাধিকা, গিরিধারীলালের নিত্য সেবাই আমার কাজ। তবে প্রয়োজনে এসব হাতে নিতে আমার অসুবিধা হয় না।

বনবীর সেদিন প্রসঙ্গ পালটে বলেছিল : যাক সে কথা। উদয় শেষ হয়ে গেল। আমি খুবই দুঃখিত যে উদয়কে হত্যা করতে হল। রাণা বংশের শেষ বংশধর। কিন্তু কোন উপায় ছিল না।

মীরাবাঈ বলেছিল : উদয়ের মা কারমেতনবাঈ ?

বনবীর জবাব দিয়েছিল : বন্দী।

: তাঁর লোকজন ?

: হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু উদাবাঈ কোথায় ?

এ প্রশ্নে মীরাবাঈ একটু থমকে দাঁড়িয়ে, নিজের তলোয়ারে হাত রেখে বলেছিল : আমার কাছে।

বনবীর অত্যন্ত চতুর এবং বুদ্ধিমান। সে সেটা লক্ষ্য করে বলেছিল : আপনি তলোয়ারে হাত রাখছেন। আপনি তো জানেন, রাজপুতেরা কোন রমণীর গায়ে হাত দেয় না। অথবা যুদ্ধে আহ্বান করে না। এটা মর্যাদার প্রশ্ন।

মীরাবাঈ বলেছিল : আমার জানা আছে। তবুও মানুষের সাবধানী মন মানুষকে সাবধান করে।

বনবীর বলেছিল : উদাবাঈ-কে আমার প্রয়োজন নেই। এখন আপনি কী করবেন ঠিক করুন। রতন সিংহের পথ আমরা পরিষ্কার রাখতে চাই।

: 'আমরা'—এ কথার অর্থ ?

: আমি আর মালদেব।

মীরাবাঈ একটু থেমে বলেছিল : কিন্তু মহারাণা এখনও বেঁচে। তিনি খবর পেলে ?

মীরাবাঈ-এর কথা শুনে সেদিন বনবীর একটু হেসে জবাব দিয়েছিল : তাঁর খবর পেতে দেরী আছে। তাঁর কাছে যখন এ খবর পেঁছুবে, তখন রতন সিংহ রাণা বলে ঘোষিত। মালদেব আমাদের সঙ্গে আছে। ফলে রাজপুত রাঠোর-রা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। চিতোরের সর্দারেরাও একে একে আমাদের দলে যোগ দিচ্ছে। সুতরাং মহারাণা আর বিক্রমজিৎকে আমরা চিতোরের বাইরেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবো। তাঁদের

সঙ্গে আমাদের সৈন্যদের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হবে চিতোর দুর্গের খোলা মাঠে। আপনাকে আগেই বলেছি, রতন সিংহের রাণাপদ আমরা পরিস্কার রাখতে চাই। ধনবতীবাঈ অর্থাৎ রতন সিংহের মা আমাদের প্রধান উপদেষ্টা।

মীরাবাঈ সব শুনে বলেছিল : কিন্তু এত করে তোমাদের লাভ কি ?

বনবীর বিস্মিত হয়ে বলেছিল : আমাদের লাভ ? আপনি অবাক করলেন। রতন সিংহ শিখণ্ডী মাত্র। রাণা আমরাই। আমরাই রাজত্ব চালাবো। এখন আপনি কি করবেন ভেবে দেখুন। আপনাকে পেলে আমাদের একটু সুবিধা হয়।

: কেমন ?

: যেমন ধরুন, আপনাকে পেলে আমরা মেড়তীয়া রাঠোরদের হাতে পাব বলে আশা করছি। অর্থাৎ আপনি আমাদের দলে এলে আপনার জ্যেঠামশাই বীরমদেবজী আর আপনার বাবা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। ফলে আমরা আরও শক্তিশালী হতে পারবো। আর তা' ছাড়া—তা' ছাড়া এর ফলে আপনারও কিছু লাভ হতে পারে।

মীরাবাঈ অবাক হয়ে বলেছিল : আমার লাভ ?

বনবীর বলেছিল : হ্যাঁ! বিস্মিত হবেন না। আপনারই লাভ।

: কী রকম ?

: কারমেতনবাঈ-এর জায়গীরের বেশ মোটা অংশ আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস-বৈভবের সুযোগও আপনি পাবেন।

মীরাবাঈ সে কথা শুনে একটু চিন্তা করে জবাব দিয়েছিল ; আর যদি তারা যোগ না দেন ?

: তাহলে আপনার যা জায়গীর আছে তা' কেড়ে নেওয়া হবে। আর—আর—।

: বুঝেছি। আমাকে বন্দী করা হবে।

: হ্যাঁ! তবে আমি আশা করি বীরমদেবজী এবং আপনার পিতা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আপনাকে সহায়তা করবেন। এখন ভেবে দেখুন, আপনি কোন পথ বেছে নেবেন।

: দেখবো।

সেদিন বনবীর চলে গিয়েছিল। কিন্তু মীরাবাঈ-এর মাথায় চাপিয়ে গিয়েছিল একরাশ দুশ্চিন্তা আর দুঃখ। সেদিন বনবীর ভেবেছিল উদয় সিংহ শেষ হয়ে গেছে। উদয় সিংহকে হত্যা করা হল। রাণা বংশের শেষ সন্তান আজ শেষ নিশ্বাস ফেললো। কিন্তু সে ঘটনা যে কত বড় মিথ্যা আজকের উদয় সিংহের মৃত্যু সংবাদই তার প্রমাণ। আজ উদয় সিংহের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। এবং সেই ঘটনার দীর্ঘ দিন পরে। সেদিন বনবীর চলে যেতে মীরাবাঈ খোলা তলোয়ার হাতে উদাবাঈ-এর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। অঘোরে ঘুমোচ্ছিল উদাবাঈ। উদাবাঈ সেদিন জানেনি যে, সেদিন চিতোরে কি নাটক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল।

সেই মুহূর্তে মীরবাঈ-এর মনে হয়েছিল, তার এখন অনেক কাজ। সে তাড়াতাড়ি

একটা চিঠি লিখে একজন পরিচারিকার হাত দিয়ে মেড়তায় পাঠিয়েছিল। বীরম-দেবজীকে জানিয়েছিল, তাঁরা যেন কোন প্রকারেই বনবীরের সঙ্গে হাত না মেলান। তার ব্যবস্থা সে নিজেই করবে। তার পরেই চলে গিয়েছিল পান্নাবাঈ-এর ঘরের দিকে। না, পান্নাবাঈ নেই। সকলেই সেদিন জেনেছিল যে উদয়কে হত্যা করা হয়েছে। সেদিন চিতোরে কান্নার রোল উঠেছিল। কিন্তু আজ উদয়ের মৃত্যুতে সত্যিই কান্নার আর বিশেষ কেউ নেই। সেদিন মিথ্যা-মৃত্যু সংবাদ রটনায় মানুষ কেঁদেছিল। কিন্তু আজ হয়তো এ মৃত্যু-সংবাদ অনেকের কাছে গিয়ে পৌছুবে না। উদয় সিংহ মীরাবাঈ এর কোলে মানুষ, সেই কারণে একটা নৈতিক কর্তব্য হিসাবেই উদয় সিংহের মন্ত্রী পরিষদ অনন্ত মিশ্রকে দিয়ে মীরাবাঈকে একটা সাধারণ সংবাদ পাঠিয়েছে। এ কাজ না করলে চক্ষু লজ্জার জবাব দেওয়া অসুবিধা হয়ে পড়ে। যাইহোক আজ মীরাবাঈ-এর মনে হয় বনবীর যদি সত্যিই সেদিন উদয়কে হত্যা করতে পারতো, তবে আজ চিতোরে রাণা হবার কেউ থাকতো না। রাণা বংশের কেউ আজ আর বেঁচে থাকতো না। সেদিন মীরাবাঈ উদয় সিংহকে বাঁচিয়েছিল। তারপর দীর্ঘ জীবন পরে চিতোরে উদয়ের অভিষেকও হয়েছিল।

এরপর কত দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। বনবীর চলে গেছে। উদয় সিংহের দাদা বিক্রমাজিৎ সিংহ বিদায় নিয়েছে। তারপর এসেছে উদয়ের রাজত্বকাল। উদয়ের রাজত্বকালে চিতোরে প্রবীণা বলতে কেউ ছিলেন না। একমাত্র মীরাবাঈ। রাজমহিষীদের মধ্যে প্রবীণা বলতে এখনও মীরাবাঈ একাই বেঁচে।

উদয় সিংহের অভিষেক সংবাদে মীরাবাঈ এর সেদিন মনে হয়েছিল, বিক্রমাজিৎ-এর মত উদয় সিংহও হয়তো তাকে ডেকে পাঠাতে পারে। কারণ উদয়ের ওপর তার অনেক দাবী। কিন্তু সেদিন মীরাবাঈ মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলে যে উদয় সিংহ ডেকে পাঠালে সে চিতোরে যাবে না। বিক্রমাজিৎ এর আমলে সে ফিরে গিয়ে যে ভুল করেছিল, সে ভুল সে আবার করবে না। অনেক শোক-দুঃখ পেয়ে বিক্রমাজিৎ পালটে গেছে এই আশা নিয়েই মীরাবাঈ সেদিন চিতোর গিয়েছিল। কিন্তু ফিরে এসেছিল একরাশ অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে। সুতরাং মীরাবাঈ সুরুতেই ঠিক করে নিয়েছিল যে উদয়ের অভিষেকে তার ডাক এলে সে খুব সহজেই প্রত্যাখান করবে। মীরাবাঈ সেদিন ভেবেছিল চিতোরের রাজনীতি আর যুদ্ধ নিয়েই উদয়ের জীবন অতিবাহিত হোক। মীরাবাঈ-এর শ্রীবৃন্দাবনই ভাল। উৎসব, সেবা, গান আর সকলের ভালবাসায় এখানে মীরাবাঈ-এর জীবন কেটে যাক। এটাই আজ মীরাবাঈ-এর কাম্য। অবশ্য তার মাঝে মাঝে কিছু দুর্নামও তাকে শুনতে হবে। তা' হোক। তবু এই ভাল। এই আনন্দ পীঠেই সে তার শেষ শয্যা রচনা করবে। গিরিধারীলালকে শেষ নৈবেদ্য দিয়ে যাবে।

উদয়ের অভিষেকের খবর আসতে সেদিন মীরাবাঈ বড় বেশী আনমনা হয়ে পড়েছিল। অতীতের নানা ঘটনা, বিশেষতঃ সেই বিশেষ রাতের কথা মীরাবাঈকে বার বার স্পর্শ করে গিয়েছিল। যেখানে মীরাবাঈ-এর ভূমিকাই ছিল প্রধান। চিতোরের সেই একটি রাতের জন্যে মীরাবাঈকে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে

পড়তে হয়েছিল। শুধু মাত্র উদয়কে বাঁচানো আর চিতোর রক্ষার জন্যে মহারাণাকে খবর পাঠানো। অবশ্য উদয়কে বাঁচাবার মূলে পান্নাবাঈ। এ ব্যাপারে পান্নাবাঈ-এর দান অপরিসীম। নিজের পুত্রকে বনবীরের মত একজন ঘাতকের হাতে তুলে দিয়ে উদয়কে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, এ এক অভিনব কাহিনী। সে সব ঘটনা আজ এতদিন পরে মীরাবাঈ-এর মনে পড়লে অবাক লাগে। কী করে সে সব ঘটনা সেই রাতে অনায়াসেই ঘটতে পেরেছিল, কী করে মীরা নিজে মুখ্য-ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়েছিল, কী করে পান্নাবাঈ নিজের পুত্রকে ঘাতকের হাতে তুলে দিয়ে, সারা চিতোর-ঘেরা সতর্ক প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে, উদয়কে চিতোরের বাইরে নিয়ে যেতে পেরেছিল, সে সব আজ ইতিহাস। কিন্তু একদিন চোখের সামনেই তা ঘটেছিল। পান্নাবাঈ-এর কথা মনে হতেই মীরার মন কেমন যেন উদাস হয়ে এল। চিতোর ছেড়ে আসবার পর, মীরা পান্নাবাঈ এর আর কোন খবর পায় নি। আজ পান্নাবাঈ সম্পর্কে মীরা কিছুই জানে না। কিন্তু মীরা এটুকু জানে যে পান্নাবাঈ মীরার কথা রেখেছিল। সে উদয়কে নিয়ে গোপনে দেবল নগরে গিয়ে বীর বাঘজীর ছেলে সিংহ রাওয়ের সঙ্গে মীরার নাম করে দেখা করেছিল। তার কাছে উদয়ের আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু সিংহ রাও বনবীরের ভয়ে রাজী হন নি। সেখানে মীরার কথা থাকে নি। অগত্যা তারা দেবল ছেড়ে জনগারপুরে এসে সেখানকার শাসনকর্তা দুরাওল ঐক্য কর্ণের কাছে রাজকুমারকে রাখতে চেয়েছিল। তিনিও বনবীরের ভয়ে রাজী হতে পারেন নি। নাপিত ও পান্নাবাঈ তখন উপায়হীন। দিশেহারা। কোথায় যাবে? কার কাছে সাহায্য চাইবে। অবশেষে তারা আবাবল্লী অতিক্রম করে কমলমীর দুর্গে এসেছিল। তখন সেখানে শাসনকর্তা ছিলেন একজন বীর রাজপুত। নাম আশা শাহ। সেখানে এসে পান্নাবাঈ এক বুদ্ধি অবলম্বন করেছিল। এ সব কথা মীরাবাঈ পরে জেনেছে। সে আশা শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিল: আপনার রাজার প্রাণ রক্ষা করুন। কিন্তু আশা শাহ-ও সাহস করে রাজী হতে পারেন নি। কারণ একই। তবে আনন্দের কথা, সেখানে আশা শাহের মা দাঁড়িয়েছিলেন। আশা শাহ মাকে খুব ভক্তি করতেন। সেদিন আশা শাহের মা বলেছিলেন: প্রভু নারায়ণ ব্যক্তি। প্রভুর হিতসাধনের জন্যে কখনও বিপদ অথবা বিঘ্নের কথা ভাবা উচিত নয়। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র তোমায় প্রভু। বিপদে পড়ে তোমার কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছে। তাকে আশ্রয় দেওয়া তোমার কর্তব্য। মায়ের কথা শুনে আশা শাহ রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন আশা শাহ রাজী না হলে উদয় সিংহের ভাগ্য আবার কোন দিকে ঘুরে যেত তা কে জানে। তবে আশা শাহ রাজী হলেও সেই মুহূর্তে উদয়ের পরিচয় গোপন রাখা ছাড়া কোন পথ ছিল না। তিনি উদয়ের পরিচয় গোপন রেখে, নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র বলে পরিচয় দিতে শুরু করেছিলেন। সেদিন উদয়ের জায়গা হয়েছিল। পান্নাবাঈ নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে ছিল। কিন্তু মীরাবাঈ জানে সে রাতের ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। সে দুর্যোগ রাত এত সহজেই ভোর হয় নি।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহ মীরাবাঈ-র পত্র পেয়েই গুজরাট সীমান্ত থেকে তড়িতে চিতোরে ফিরে এসেছিলেন। মীরাবাঈ-এর আজ মনে হয়, এ সব যেন সেদিনের ঘটনা।

অথচ যুগ পার হয়ে গেছে। এত বড় বিপর্যয় তিনি কল্পনাও করেননি। অবশ্য রতন সিংহ রাণা হবার জন্যে গোপনে চিতোরে একটা দল তৈরী করেছে, এটা তিনি জানতেন। তিনি জানতেন, এ-দলে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ধনবতীবাঈ, মালদেব ও বনবীর আছে। ধনবতীবাঈ-এর গোপন ইচ্ছা, মহারাণা সংগ্রামসিংহের পরে রতন সিংহই রাণা হোক। এটাই স্বাভাবিক। কারণ মহারাণার বড় ছেলে ভোজরাজ আজ বেঁচে নেই। ভোজরাজের কথা মনে হতেই মীরাবাঈ-এর অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সবই অদৃষ্ট। নিজের স্বামী বলে নয়, মীরাবাঈ মনে করে অমন মানুষ দুর্লভ। কিন্তু ওদের গোপন পরিকল্পনা যে এতদূর এগিয়ে এসেছে এটা মহারাণা কল্পনাও করতে পারেননি। তাঁর জীবিত কালেই তাঁর মত মহারাণাকে সরিয়ে রতন সিংহ সোজাসুজি ভাবে রাণার পদে অভিষিক্ত হবে, রাণা বলে ঘোষিত হবে, এ-চিন্তা কল্পনাতীত। কিন্তু সেদিন তাই ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তিনি তড়িতে চিতোরে ফিরে এসেছিলেন। কেউ বাধা দিতে সাহস পায় নি। তিনি জানতেন, এত সাহস কারো নেই। সেদিন বনবীর নেপথ্যে সরে দাঁড়িয়েছিল। রতন সিংহ মুখ লুকিয়েছিল। আর ধনবতীবাঈ লজ্জায় নিজের মহলে গিয়ে দরজা এঁটেছিলেন। তবে সেদিন চিতোরের আবহাওয়া ছিল থমথমে। সর্দারেরা অতিমাত্রায় সতর্কিত। প্রহরীরা অতি মাত্রায় ভীত। সেদিন সকলেই আশা করেছিল; মহারাণা সংগ্রাম সিংহ সকলকেই শাস্তি দেবেন। সকলের কাছেই কৈফিয়ৎ দাবী করবেন। এত বড় অন্যায় তিনি সহ্য করবেন না। কিন্তু সেদিন তিনি কিছুই করেননি। শুধুমাত্র মীরার সঙ্গে কয়েকটা গোপন বৈঠক করেছিলেন মাত্র। মীরার মন্দিরে বেশ কয়েকবার গান শুনতে এসেছিলেন। মহারাণার কারো কাছে যাবার রেওয়াজ নেই। সকলে তাঁর কাছে আসবে। কুর্নিশ জানাবে। এইটাই নিয়ম। কিন্তু সেদিন তিনি মীরাকে ডেকে পাঠাননি। তিনি নিজেই মীরার মন্দিরে এসেছিলেন। গান শুনতে চেয়েছিলেন। মীরাবাঈ-এর আজও মনে আছে, সেদিন সে গেয়েছিল ঃ

"মেরে তো গিরিধারী গোপাল, দুসরো ন কোঈ।
জাকে সির মোর মুকুট, মেরে পতি সোঈ॥"

সেদিন মীরাবাঈ গানে আত্মভোলা হয়ে পড়েছিল। অমন গান সে দীর্ঘদিন গাইতে পারেনি। আর সবচেয়ে বিচিত্র কথা এই যে, সেদিন মহারাণা সংগ্রাম সিংহের চোখেও জল দেখতে পেয়েছিল। অমন বীর, যোদ্ধা, মীরাবাঈ এর মন্দিরে এসে যেন সরল শিশু। সংগ্রাম সিংহের এমন অবস্থা মীরাবাঈ আগে কখনও দেখেনি। এসব ঘটনা আজকের নয়। দীর্ঘদিনের। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই মীরাবাঈ-এর মনে যেন ছবির মত ভেসে ওঠে। আজকে উদয় সিংহের মৃত্যুর খবর এসেছে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মীরাবাঈ-এর মনে আজ অতীতের আবর্তন।

॥ সাত ॥

সেদিন চিতোরে ফিরে এসে মহারাণা সংগ্রাম সিংহ শাস্তি মূলক কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি। তিনি বুঝেছিলেন যে, এ নিয়ে কোন লাভ হবে না। তিনি জানতেন, তাঁর মৃত্যুর পর এ-চিতোর কেউ রাখতে পারবে না। নিজেদের আত্মকলহে এরা নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনবে। চিতোর অপরের হাতে চলে যাবে। তিনি মাঝে মাঝেই তাঁর জ্যেষ্ঠ্য পুত্র ভোজরাজের কথা বলতেন। তিনি বলতেন: জানো মীরা আজ ভোজরাজ বেঁচে থাকলে আমার সাধের চিতোরের এই অবস্থা হতো না। ভোজরাজ মহারাণা হলে, তুমি স্বাভাবিক ভাবেই মহারানীর পদ পেতে। তুমি আর ভোজরাজ থাকলে আমি চিতোর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতাম। কিন্তু সবই অদৃষ্ট। সবই কপালের লিখন। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের দুঃখপ্রকাশ মীরাবাঈ-এর আজও মনে পড়ে। যখনই চিতোর সম্পর্কে কোন খবর আসে, যখনই চিতোরের ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে, তখনই সংগ্রাম সিংহের এই কথাগুলো মীরাবাঈ-এর মনকে ছুঁয়ে যায়।

আজ উদয় নেই। সেদিন কিন্তু তিনি ফিরে এসেই উদয়ের খোঁজ করেছিলেন। আশা শাহের খবর নিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে একটি গোপন চুক্তিতে এসেছিলেন। ঠিক হয়েছিল, তিনি যে ক'বছর বেঁচে থাকবেন, উদয় এখানে ফিরে আসবে না। কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হলে উদয়ের অবস্থা আবার ঐ একরকমই দাঁড়াবে। সুতরাং না আসাই ভাল। উদয় আশা শাহের কাছেই থাকবে। এবং বড় হবে। ভবিষ্যতে উদয়ের যদি কখনও রাণা হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে আশা শাহ সর্বোতভাবে সাহায্য করবে। এটা গোপন চুক্তি। কেউ জানবে না। জানবে শুধু মীরাবাঈ। মীরাবাঈ তাকে মাতৃস্নেহে মানুষ করেছে। একথা জেনেই মহারাণা মীরাকে এই গোপন চুক্তির কথা জানিয়ে রেখেছিলেন। মীরাবাঈ-ও সেদিন বলেছিল যে সে উদয়ের ওপর নজর রাখবে। মীরাবাঈ সে শপথ ভুলে যায়নি। অথবা সে শপথের অমর্যাদাও করেনি। সে দীর্ঘদিন উদয়ের খবর রেখেই চলেছিল। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সে কোথায় বাস করছে সে খবর মীরাবাঈ-এর অজানা কিছু ছিল না।

মহারাণা উদয়ের ব্যবস্থা করেই সভা ডেকে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর অবর্তমানে রতন সিংহই রাণা হবে। এর মধ্যে অন্য কোন পরিকল্পনা নেই। সেদিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে স্বস্তি ফিরে এসেছিল। যারা চক্রান্তের পুরোধা তারা গোপনে মুখ লুকিয়েছিল। চিতোরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছিল।

এরপরেও মহারাণাকে আরও একটি যুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। যুদ্ধটা ছিল বাবরের সঙ্গে। পাণিপথের যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে চিতোরের দিকে এগিয়ে আসছিল। মহারাণা সংগ্রাম সিংহকে খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল

সে যুদ্ধের জন্যে। যাবার আগে তিনি তাঁর তৃতীয় স্ত্রী কারমেতনবাঈ আর বিক্রমাজিৎকে থম্বোর দুর্গে অবস্থানের জন্যে পাঠিয়ে ছিলেন। যাতে তাঁর অনুপস্থিতে ওদের কোন প্রকার বিপদ না ঘটে। গতবারের অভিজ্ঞতা তিনি সেদিন ভুলতে পারেন নি। সেবারে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। উদয়ের ব্যবস্থা আগেই করা ছিল। কিন্তু খুবই দুঃখের কথা, সেই যুদ্ধে তাঁরই আত্মপক্ষ বিশেষ করে বনবীরের দল তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল। বনবীর ছিল পৃথিবরাজের জারজ পুত্র। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ দয়া করে এই বনবীরকে নিজের সেনাদলে উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন। বনবীর এইভাবেই তার দাতার মহানুভবতার মূল্য দিয়েছিল। মীরাবাঈ-এর আজও মনে হয়, মানুষ যে কত জঘন্য কাজ করতে পারে এবং কত নীচে নেমে যেতে পারে, বনবীর তার পূর্ণ পরিচয়।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর খবর সেদিন চিতোরে আসতে চিতোরের অবস্থা যে কী ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল, আজ একথা মনে পড়লেই মীরাবাঈ কেমন যেন শিউরে ওঠে। কেমন যেন নিজের মধ্যেই গুটিয়ে যায়। সেই সব ভয়াবহ দিন কল্পনা করা যায় না। সেদিন চিতোরের ক্ষমতালিপ্সুর দল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছিল। রাজ-মহিষীরা নিজেদের পুত্রদের রাণা করবার জন্যে জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন। মীরাবাঈ এর এ সব কিছুই অজানা নয়। তবুও চিতোরে মহারাণার মৃত্যু সংবাদ আসতে রাজমহিষীর দল নিয়ম-মাফিক শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সে শোকের মধ্যেও পরবর্তী রাণা হিসাবে রতন সিংহ অভিষিক্ত হয়েছিল। মীরাবাঈ-এর আজও মনে আছে, সে আনন্দধ্বনি, সে শোকবার্তাকে মুহূর্তে ম্লান করে দিয়েছিল।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, রতন সিংহ বেশীদিন রাজত্ব করবার সুযোগ পায় নি। অকালেই তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। সেদিন বিক্রমাজিৎ সিংহ ও কারমেতনবাঈ থম্বোর দুর্গেই বেশী সময় কাটাতেন। মাঝে-মধ্যে চিতোরে এলেও ভয়ে ভয়ে থাকতেন। কারণ, বিপদ এবং জীবনহানির আশঙ্কা ছিল সব সময়ই। আর পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে উদয় থাকতো আশা শাহের কাছে। এই ভাবেই চলে আসছিল। উদয় তখন কিছুটা বড়। আশা শাহ গোড়া থেকেই উদয়কে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এবং সেই পরিচয়েই চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু উদয়ের একটু বয়স হতেই সেদিন সকলেই উদয়কে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল। উদয়ের চলা-ফেরা আদপ-কায়দা ও কথা-বার্তা অনেকটা চিতোরের রাণা পরিবারের মত। গায়ের রংও যথেষ্ট মিল ছিল। আশা শাহের বংশের কারো সঙ্গেই উদয়ের কোন মিল ছিল না। সন্দেহের সূত্রপাত সেখান থেকেই। তারপর ক্রমে ক্রমে সেটা বাড়তে শুরু করেছিল। মীরাবাঈ সরাসরি এ কথা উদয়ের মুখে না শুনলেও চিতোরে বসে এ কথা শুনেছিল। শুনেছিল উদয়কে নিয়ে আশা শাহ অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছে।

মীরাবাঈ-এর মনে পড়ছে, একবার আশা শাহ তাঁর পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে মহা ভোজ দিয়েছিলেন। সমস্ত রাজপুত নিমন্ত্রিত। উদয়ও বসে। সে একজন মহারাণার হাত থেকে দইয়ের ভাঁড় কেড়ে নিয়েছিল। সকলেই অবাক। বালকের

কী তেজ। তখন সকলের সন্দেহ হয়েছিল যে আশা শাহের ভ্রাতুষ্পুত্রের কি এত তেজ হতে পারে? সেদিন সকলেই তাকে ভয় দেখিয়েছিল। বিনয় প্রকাশ করেছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। উদয়ের অটল প্রতিজ্ঞা। এই ভাবে আশা শাহের প্রাসাদে উদয়ের বেশ কিছু বছর পার হয়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরে ঝালোরের শনিগুরু সর্দার কোন কাজে আশা শাহের কাছে এসেছিলেন। আশা শাহ তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রম দেখাবার জন্যে উদয়কে নিযুক্ত করেছিলেন। রাজকুমার উদয় সেদিন এমন ভাবে সে কাজ পালন করেছিল যে সর্দারের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল এই উদয় কখনোই আশা শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র হতে পারে না। ক্রমে ক্রমে সে খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। চিতোরেও সে খবর এসেছিল। এদিকে বনবীরের অত্যাচারে চিতোরের সাধারণ মানুষ, প্রজাবর্গ ও সর্দারেরা অতিমাত্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরাও উদয়ের খোঁজ করছিলেন। তাঁরা জানতেন যে মহারাণা সংগ্রাম সিংহের আমল থেকেই উদয় কোন এক রানার রাজ্যে বাস করছে। চিতোরে তার জীবনহানির আশঙ্কা থাকায় মহারাণা নিজেই উদয়ের অবস্থান গোপন রেখেছিলেন। এ কথা চিতোরের সর্দারদের জানা ছিল। কিন্তু উদয়ের অবস্থান তাঁদের জানা ছিল না। তারপর মহারাণার মৃত্যু হয়েছিল। এসেছিল রতন সিংহের রাজত্ব কাল। রতন সিংহ চিতোরে খুব বেশীদিন রাজত্ব করতে পারে নি। তারপর বিক্রমাজিৎ এবং শেষে বনবীর। এতগুলো বছর অজ্ঞাতবাসের পর যখন উদয়ের অবস্থান জানা গিয়েছিল, তখন চিতোরের সর্দার ও সেনাপতিগণ বনবীরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে সভা ডেকেছিল এবং সেই সভার প্রস্তাব অনুসারে উদয়কে চিতোরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে সকলে আশা শাহের রাজ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিলে। তখন সকলেই জেনে গিয়েছিলো যে এবারে চিতোরের রাণা পদে অভিষিক্ত হবে ছোট যুবরাজ উদয়সিংহ। সেইজন্যে রাজপুত্রকে অভিবাদন জানাবার জন্যে সেদিন প্রতিটি রাজ্যই আশা শাহের কাছে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। চিতোরের সর্দারেরা রওনা হয়ে যাবার পর চণ্ডের প্রতিনিধি শালুম্ব্রাপতি সাঁইদাস, কৈলবাপতি জগ, বাগোরের অধীশ্বর সাঙ্গ ও অন্যান্য গোত্রের সামন্তগণ, কোতেরিয়া ও বৈদলার চৌহানগণ, বিজোল্লির অধিপতি, মক্কোরপতি পৃথ্বীরাজ ও জৈত্যবৎ লুনকর্ণ এইসব অধিপতি ও প্রতিনিধি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যুবরাজকে অভিবাদন জানাতে কমলমীরে এসে হাজির হয়েছিলেন। ধাত্রীপান্না ও সেই নাপিতটিকেও কমলমীরে ডেকে আনা হয়েছিল, রাজপুত্র উদয়ের জীবন রক্ষার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণণা করে সকলের সন্দেহ দূর করবার জন্যে।

সেইদিন সেই কমলমীরের বিশাল জনসভায় আশা শাহ যুবরাজের সমস্ত পরিচয় দিয়ে মেবারের বৃদ্ধ সামন্ত চৌহান কোতেরিয়ার হাতে উদয়কে তুলে দিয়েছিলেন। এবং মহারাণা সংগ্রাম সিংহের সাথে তাঁর যে চুক্তি ছিল, তা পালন করেছিলেন। তিনি সেই সভায় এই কথাও সকলকে জানিয়ে ছিলেন যে মহারাণার সঙ্গে তাঁর এই প্রকারের একটা চুক্তি ছিল। এবং তিনি মহারাণার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে উদয়ের রাণা

হবার সময় এবং সুযোগ এলে, তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। আজ সে সময় উপস্থিত জেনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। এখন তিনি চিতোরের বৃদ্ধ সামন্ত চৌহান কোতোরিয়ার হাতে উদয়কে তুলে দিয়ে নিজে দায়িত্ব মুক্ত হলেন। কোতোরিয়াও সেদিন জানিয়ে ছিলেন যে তিনি এ ঘটনা জানতেন। তবে যুবরাজের জীবন আশঙ্কার ভয়ে তিনি এত দীর্ঘদিন চুপ করে ছিলেন। যুবরাজের অবস্থানের কথা তাঁর জানা ছিল। তিনি সে সভায় আরও ঘোষণা করেছিলেন যে, উদয়ের অবস্থানের সংবাদ চিতোরের রাজমহিষীদের মধ্যে শুধু মাত্র একজনই জানে, সে মীরাবাঈ। কারণ মহারাণা সংগ্রাম সিংহ তাঁর গোপন চুক্তির কথা একমাত্র মীরাবাঈকেই জানিয়ে রেখেছিলেন।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহ যখন তার গোপন চুক্তির কথা মীরাবাঈ কে জানান, তখন মীরাবাঈ চিতোরে। এবং তার পরবর্তী ঘটনার সংবাদ মীরাবাঈ শ্রীবৃন্দাবনে এসে পেয়েছিল। তাকে লোক পাঠিয়ে জানানো হয়েছিল। মীরাবাঈ যখন এই সব কথা ভাবে, তখন মনে হয় এতো দুদিনের। এইতো সেদিনের ঘটনা। কিন্তু তারপর একটা যুগ পার হয়ে গেছে।

সেদিনের সেই সভায় মহারাণা সংগ্রাম সিংহের বংশধরকে পেয়ে সকলেই সেদিন আনন্দিত হয়েছিল। সেই সভাতেই সর্দার অখিলরাও উদয়ের হাতে তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করতে চেয়েছিলেন। চিতোরের সমস্ত সর্দারেরাও রাজী হয়েছিলেন। সেই সভায় ঠিক হয়েছিল, পরে এ বিবাহ সম্পন্ন হবে। তবে সেইদিন সেই উৎসবেই উদয়কে চিতোরের রাণা বলে স্বীকার করে নিয়ে, সকল সর্দার ও প্রতিনিধিরা উদয়কে থম্ভোর দুর্গে নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে অনেক সৈন্য আগেই জমা ছিল। সকল সর্দার ও সমস্ত প্রতিনিধিরা উদয়কে নিয়ে সভা করেছিলেন এবং তাকে চিতোরের রাণা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

বনবীর সব শুনে, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছিল বটে, তবে যখন তার নিজেরই মন্ত্রী চিতোরের দুর্গে উদয়ের বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল, তখন বনবীর আর কোন উপায় না দেখে তার আত্মীয় পরিজনকে নিয়ে গভীর রাতে চিতোর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

॥ আট ॥

মীরাবাঈ ব্যক্তিগত জীবনে উদয়ের খবর রেখেই চলছিল। শ্রীবৃন্দাবনে এসে সাধন-ভজন আর কৃষ্ণ-সেবার মধ্যেও সে গোপনে উদয়ের খবর নিয়েছে। বনবীরের অত্যাচারের খবরও তার কাছে যথা সময়ে এসেছে। শেষে বনবীরকে সরিয়ে উদয়কে রাণা করবার জন্যে চিতোরের যে সমস্ত সর্দার ও সামন্তরা কমলমীরে গেছেন, মীরার কাছে সে সংবাদও এসেছিল। মীরা জানতে পেরেছিল যে, সমস্ত রাজ্যের রাজারা উদয়কে অভিবাদন জানাবার জন্যে কমলমীরে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাচ্ছেন। শেষে

থম্ভোর দুর্গে উদয়কে নিয়ে সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিদের যে সভা, সে সংবাদও মীরাবাঈ-এর অজানা কিছু ছিল না।

তারপর চিতোরে উদয়ের অভিষেক। এ সংবাদ মীরাবাঈ-এর কাছে শুধুমাত্র আনন্দ সংবাদ-ই ছিল না। তার দায়িত্ব-মুক্তির সংবাদও ছিল। সেই দিনটাই ছিল মীরাবাঈ-এর সত্যিকারের মুক্তির দিন। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ যে দায়িত্ব মীরাবাঈ কে দিয়ে গিয়েছিলেন, চিতোরে উদয়ের অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে সে দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আজ উদয় নেই। উদয় মৃত। অনন্ত মিশ্র উদয়ের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছে। ঠিক এই মুহূর্তে চিতোরে উদয়ের সেই রাজকীয় অভিষেকের সংবাদের কথাটা মনে আসতেই, মীরা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল। আজকে উদয়ের স্মৃতিচারণের সংগে সংগে তার জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী এবং পান্নাবাঈ-এর নির্ভিক সাহসিকতা ও নিজের পুত্রের জীবনের বিনিময়ে রাজপুত্রের জীবন রক্ষা করবার প্রতিজ্ঞার কথা, নিজের অজান্তেই মনে পড়ে যাচ্ছে। উদয়ের জীবনের দীর্ঘ ঘটনাবলী এক পলকের জন্যে মীরাবাঈ-এর মনকে সিক্ত করে দিচ্ছে।

আজ উদয়ের মৃত্যুর সংবাদ এসেছে। আজ এই দুঃসংবাদের দিনে মীরার মন কেন যেন বার বার উদয়ের অভিষেকের মুখর দিন গুলোকে স্পর্শ করে যেতে লাগলো। আজ মীরার মনকে এমন ভাবে নাড়া দিতে লাগলো যে তার সম্বিৎ নেই বললেই চলে। সে দীর্ঘ সময় এক জায়গায় বসে অতীতের মুখর দিনগুলোর কথাই ভেবে চলেছে। শেষে ভক্ত সনাতনের ডাকে তার সম্বিৎ ফিরে এল। তার চমক ভাঙলো। সে প্রকৃতিস্থ হয়ে ভক্ত সনাতনের দিকে তাকালো।

ভক্ত সনাতন বললো ঃ সভায় আজ অনেক লোক জড়ো হয়েছে। আপনার নাম-গান শোনবার জন্যে। গিরিধারীলালের পুজোর সময়ও বয়ে যাচ্ছে। আপনি না এলে—।

মীরাবাঈ ভক্ত সনাতনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো ঃ আজ তোমরা আমাকে ছুটি দাও সনাতন। উদয়ের মৃত্যু সংবাদ আজ আমার মনকে খুবই ব্যথিত করে তুলেছে। অতীতের এত কথা আজ মনে পড়ে যাচ্ছে যে, আজ আর আমার পক্ষে সভা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তুমি ললিতাকে আজ সভা পরিচালনা করতে বলো। বলো আজ আমার শরীর ভাল নেই।

ভক্ত সনাতন সবিনয়ে জবাব দিল ; বেশ, তাই হবে। আমি ললিতা দি-'কে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।

ভক্ত সনাতন চলে গেল। মীরাবাঈ তার চলে যাবার পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাবলো ঃ চিতোরে থাকতে এমনিতর কত মানুষ মীরাবাঈ-এর হুকুম তামিলের জন্যে ব্যস্ত হতো। আজ তারা আর কেউ নেই। কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে তারও স-ঠিক সংবাদ মীরাবাঈ-এর জানা নেই।

মীরাবাঈ ভাবে তবুও দিন যায়। সামনের ঐ নদীটায় কলকলিয়ে বয়ে যাওয়া স্রোতের মত সময়ের স্রোতও বয়ে যাচ্ছে। আজকের বর্তমান আগামীকাল অতীত হয়ে

যাচ্ছে। শ্রুতি স্মৃতিতে চলে আসছে। এক সময় মীরাবাঈ এর জীবনে যা ছিল ঘটনা আজকে তা স্মৃতি। ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় লেখা হয়ে গেছে। এবং শুধু বেদনাই বহন করছে।

উদয় সিংহ মীরাবাঈ এর কোলে মানুষ। তাই বোধহয় তার অভিষেকের দিনে মীরাবাঈ কে ভুলে যেতে পারেনি। মীরাবাঈকে আনবার জন্যে দূত পাঠিয়েছিল।

সেদিন ছিল গানের বড় আসর। মীরাবাঈ আসর শেষ করে আশ্রমে ফিরতেই উদয়ের ব্যক্তিগত দূত মীরাবাঈকে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়েছিল। হাতে শীলমোহর চিঠি। মীরাবাঈ চিঠি নিয়ে তাকে পরের দিন হাজির হতে বলেছিল। দূত কুর্নিশ করে চলে গিয়েছিল। সেদিন উদয়ের চিঠির মূল বক্তব্য ছিল ঃ

> "আপনি আমার মায়ের মত। আমি আপনার কোলেই মানুষ। আজ আমার অভিষেক। চিতোরের প্রধানা মহিষীরা সকলেই পরলোকে। একমাত্র আপনিই জীবিত। আপনি জানেন যে চিতোরের কী দুর্দিনে আমার অভিষেক হচ্ছে। আমি চিতোর রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমার এই আনন্দ উৎসবে এবং চিতোর রক্ষার দায়িত্বের কাজে আপনার উপদেশ এবং মাতৃস্নেহ আমাকে শক্তি যোগাবে। দূতের কাছে আপনার আসবার সম্মতি পেলে আমি আমার প্রতিনিধি পাঠাবো।"

মীরাবাঈ-এর আজও মনে আছে যে, সেই রাত্রে তার ভাল ঘুম হয়নি। নানা চিন্তা, আর অতীত স্মৃতি তাকে সেদিন সারা রাত জাগিয়ে রেখেছিল। টেনে নিয়ে গিয়েছিল অতীতের নানা ঘটনাবলীতে। এইভাবে সেদিনের সেই রাত পার হয়েছিল। অতি-ভোরে মীরাবাঈ মন্দিরের চত্বরে পা দিতেই, দূত এসে হাজির হয়েছিল। মীরাবাঈ তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে নিজে চিঠি লিখতে বসেছিল। সেদিন মীরাবাঈ লিখেছিল ঃ

> "শ্রীবৃন্দাবনে এসে আমি আমার সাধনার পথ খুঁজে পেয়েছি। এই স্থানই আমার উত্তোরণের সহায়ক হবে বলে মনে করি। অমৃতের পাশে যেমন গরল থাকে, এখানেও তেমন আমি সকলের স্নেহ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কুৎসা রটনার কথাও শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি জানি যে, এইসব বাধা উত্তীর্ণ করেই আমাকে উত্তোরণের পথ খুঁজে নিতে হবে। সাধনায় এগিয়ে যেতে হবে। আজ এই বয়সে আমি আবার চিতোরে ফিরে গিয়ে কুটিল রাজনীতির জালে নিজেকে জড়াতে চাই না। চিতোরে দীর্ঘদিন বাস করে, আমি অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার অনেক সহ্য করেছি। এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বাভাবিকতাবেই মৃত্যু এবং মুক্তির পথযাত্রী। চিতোরে ফিরে গিয়ে আবার নতুন করে আমার আর করবার কিছু নেই। চিতোরে বিশেষ এক দুর্যোগের রাতে তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো

আমার নীতিগত কর্তব্য ছিল। আজ তোমার অভিষেকে আমার সে কর্তব্য শেষ হল। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ আমাকে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়ে গিয়েছিলেন, আজ তা' থেকে আমি মুক্তি পেলাম। তুমি আমার পুত্রের মত। আমার আশীর্বাদ তোমার সব কাজেই সহায় হোক এই কামনা করি।"

চিঠি লেখা শেষ করে দূতের হাতে তুলে দিতে দূত মীরাবাঈকে কুর্নিশ করে চলে গিয়েছিল।

॥ নয় ॥

উদয়ের ডাক এখানেই শেষ হয়নি। উদয় সিংহ তার অভিষেকের সময় মীরাবাঈকে চিতোরে ডেকে পাঠিয়েছিল। উদয় সিংহ মীরাবাঈকে ভুলে যায়নি। ভুলে যেতে পারেনি। প্রথমতঃ মাতৃঋণ। মীরাবাঈ মায়ের মত তাকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছে। দ্বিতীয়তঃ জীবনদান। মীরাবাঈ যে ভাবে তাকে বাঁচিয়েছে, সেকথা উদয় ভুলে যেতে পারে না। আর তা' ছাড়া ভুলে সে যায়ও নি। তার প্রমাণস্বরূপ দেখা গেছে তার অভিষেকের সময় সে মীরাবাঈকে চিতোরে আনবার জন্যে শ্রীবৃন্দাবনে লোক পাঠিয়েছে। মীরাবাঈ যায় নি, এ কথা ঠিক। কিন্তু উদয় সিংহ তার কর্ত্তব্য কর্ম করে নি, এ কথা ঠিক নয়। এ কথা কেউ বলবে না। উদয় সিংহ আশা করেছিল যে মীরাবাঈ আসবে। অভিষেকের সময় পাশে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু তার আশা ব্যর্থ হয়েছে। তবে ব্যর্থ হয়েছে বলেই উদয় সিংহ আশা ছেড়ে দেয় নি। ভেবেছে আবার একবার চেষ্টা করে দেখবে। চিতোরে যদি আবার কখনও দুর্দিন আসে, তবে সে আবার মীরাবাঈ কে চিতোরে আনার চেষ্টা করবে। এবং ফলতঃ তাই দাঁড়ালো। উদয়ের অভিষেকের বেশ কিছু বছর পরে আকবর চিতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। উদয়ের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লো। আকবরের মত একজন শক্তিশালী মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে চিতোরকে টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। তখন উদয় চিতোরের সেই দারুণ দুর্দিনে মীরাবাঈ-কে আবার স্মরণ করেছিল। মীরাবাঈ-কে আবার চিতোরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে অনন্ত মিশ্রকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠিয়েছিল।

তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। মীরার মন্দিরে গান চলছে। তার আগে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা পাঠ হয়েছে। তারপর মীরাবাঈ এর কণ্ঠ উৎসারিত কৃষ্ণ-নাম সকলে উৎসুকে শুনছে। দীর্ঘ সময় গানের পর মীরাবাঈ চোখ খুলে তাকিয়েছিল। মন্দিরের ভীড় তখন অনেকটা হালকা। লোকজন প্রায় বাড়ী মুখো। মীরাবাঈ ধীরে ধীরে উঠে আশ্রমের দিকে পা বাড়িয়েছিল।

কিছুপথ এসেই মীরাবাঈ থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিছুটা অবাকও হয়েছিল। সামনে অনন্ত মিশ্র দাঁড়িয়ে। মীরাবাঈ হাসি মুখে এগিয়ে এসে বলেছিল; আপনি?

অনন্ত মিশ্র জবাব দিয়েছিল ; উদয় সিংহ নিরুপায় হয়েই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

মীরাবাঈ সেদিন বিস্মিত হয়ে বলেছিল ; আমাকে ? কেন ? উদয় কি অসুস্থ ?

অনন্ত মিশ্র ঃ না। চিতোরে আজ দারুণ দুর্দিন।

ঃ আবার যুদ্ধ নাকি ?

ঃ হ্যাঁ, এবারে আকবরের সঙ্গে। রাণাজী আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

ঃ আমি গিয়ে কি করবো ? আমার তো করবার কিছুই নেই অনন্তজী।

ঃ রাণাজী বলছিলেন, আপনি তার মায়ের মত। এই দুঃসময়ে যদি আপনি তার পাশে থেকে কিছু উপদেশ দিতেন তাহলে হয়তো কাজে লাগতো। তা'ছাড়া আজকে তাঁকে সান্ত্বনা দেবারও বিশেষ কেউ নেই। এতবড় একটা যুদ্ধ পরিচালনা করা—।

ঃ সর্দার, সেনাপতি ও চিতোরের সমস্ত সৈন্য যদি এক জোট হয়ে নিজের মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে চিতোর, রক্ষা পেতে বাধ্য। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না অনন্তজী। চিতোরের প্রজাগণই চিতোর রক্ষা করবে।

ঃ আপনার শুভ ইচ্ছা ফলবতী হোক। এই কামনা করি। কিন্তু তবুও চিতোরের ইতিহাস আপনি জানেন। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের আমল থেকে যে কুটিল রাজনীতি আর দলীয় স্বার্থের সূচনা হয়েছে, তা' আজ মহীরুহ আকার ধারণ করেছে। এখন সকলেই রাণার সপক্ষে। কিন্তু যুদ্ধের সময় কে কোন দলে যোগ দেবে, কে কার স্বার্থ সিদ্ধির গোপন ফাঁদ পাতবে, সেটা বলা অসম্ভব। আকবর চিতোরের অনেক সর্দার ও সেনাপতিকে কিনে নেবার চেষ্টা করছে। অনেক টাকার লোভ দেখাচ্ছে। সুতরাং অবস্থা বুঝতেই পারছেন।

ঃ এসব এখনও আছে বুঝি ?

ঃ দলীয় স্বার্থ সব সময়েই থাকবে। আগেও ছিল।

অনন্ত মিশ্রের কথা শুনে সেদিন মীরাবাঈ একটু চিন্তা করে বলেছিল ; অনন্তজী, আপনার সব কথাই শুনলাম। আপনি উদয়কে একটু বুঝিয়ে বলবেন, চিতোরের এই দলীয় রাজনীতিতে আমি আর ফিরে যেতে চাই না। অতীতে যা করেছি, অথবা বলা যায়, যা করতে বাধ্য হয়েছি, আজ আর সে কাজ করতে আমার মন সরে না। অতীতে যাদের মধ্যে আমি বাস করেছি আজ তাঁরা কেউ বেঁচে নেই। তাঁরা সকলেই আমার নমস্য এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের অকুণ্ঠ স্নেহ আমি অনাবিল আনন্দে গ্রহণ করেছি। উদয় আমার পুত্রতুল্য। তাকে আমি যথেষ্ট স্নেহ করি। কিন্তু আজকে আমার আর চিতোরে ফিরে যাবার কোন বাসনা নেই। এখানে শান্তিতে এবং নিভৃতে কৃষ্ণলীলার এই কুঞ্জে কুঞ্জে আমি আমার সাধনার আসন পেতেছি। এখন আমার উত্তোরণের সময় এসেছে। এই অবস্থায় আমি আর কোলাহলে ফিরে যেতে চাই না। উদয়কে বলবেন, আমার আশীর্বাদ তার মাথায় চিরকাল বর্ষিত হবে। কিন্তু ফিরে আমি যাব না মিশ্রজী।

ঃ রাণাজী আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন।

ঃ এই সময়ে সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাতে আমার ইচ্ছা নেই মিশ্রজী।

ঃ আমার অনুরোধ, আপনি একটু ভাল করে ভেবে দেখুন। আমি আগামীকাল আবার আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

মীরাবাঈ-কে যথাযথ সম্মান জানিয়ে সেদিন অনন্ত মিশ্র চলে গিয়েছিল। মীরাবাঈ একটু সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে, আশ্রমের দিকে পা বাড়িয়েছিল। পথে যেতে যেতে মীরাবাঈ এর সেদিন মনে পড়েছিল, বিক্রমাজিৎ সিংহ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। উদয় তার অভিষেকের দিন যেমন অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, আজ চিতোরের দুর্দিনেও সে নিয়ে যেতে চাইছে। সেদিন বিক্রমাজিৎ-এর ডাকে মীরাবাঈ অনায়াসেই চিতোরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু উদয়ের অভিষেকের অভ্যর্থনা তেমন তার মনকে সায় দেয় নি। আজও দিচ্ছে না। আজ তার মন সাধনার গভীরে চলে যেতে চাইছে। সমস্ত কোলাহল আর কোন্দল, যুদ্ধ আর জিঘাংসার নেপথ্যে, তার মন সরে দাঁড়াতে চাইছে।

মীরাবাঈ পথে যেতে যেতেই সেদিন ঠিক করে ফেলেছিল যে, চিতোরে সে আর ফিরে যাবে না। শত অনুরোধ সত্ত্বেও না।

॥ দশ ॥

পরদিন সকালে মন্দিরের সামনে এসে মীরাবাঈ দেখেছিল, অনন্ত মিশ্র তার জন্যেই অপেক্ষা করছে। মীরাবাঈ সেদিন তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলঃ মন স্থির করে ফেলেছি মিশ্রজী। আমি আর ফিরে যাব না। আপনি আমার মন্দিরের অতিথিশালায় বিশ্রাম নিয়ে চিতোরে ফিরে যান। উদয়কে আমার আশীর্বাদ জানিয়ে সব কথা খুলে বলুন।

মীরাবাঈ আর অপেক্ষা করেনি। স্নান সেরে 'রণছোড়জীর' মন্দিরে বসে আপন মনে গেয়েছিলঃ

"হরি তুম হরো জনকী ভীর।
দ্রোপদী কো লাজ রাখো, তুম বঢ়া য়োঁ চীর॥
ভক্ত কারণ রূপনরহরি, ধর্‌য়ো আপ সরীর।
হিরণ কস্যপ মারি লীন হো, ধর্‌য়ো নাহিন ধীর।
বুড়তে গজরাজ রাখ্যো, কিয়ো বহার নীর।
দাসি মীরা লালা গিরিধর দুন জহাঁ তহ' পীর।"

অনেকক্ষণ ধরে গান গেয়েছিল মীরাবাঈ। গানে সেদিন সে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ সময় ভাব-সমাধি অবস্থায় বসে ছিল। তারপর চেতনা ফিরে আসতে 'রণছোড়জীর' প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেছিল।

অনন্ত মিশ্র দীর্ঘ সময় ঐ মন্দিরের চত্বরে বসে গান শুনেছিল। এমন গান সে দীর্ঘ-জীবন শোনেনি। মীরাবাঈ-এর ভাব-সমাধি হয় এ কথা তার জানা ছিল; কিন্তু মুখোমুখি সে কোনদিন দেখেনি। আজকে দেখে অবাক হলো। বুঝলো মীরাবাঈ সাধনার এমন এক স্তরে পৌঁছে গেছে যেখান থেকে তাকে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। মীরাবাঈকে আজ আর চিতোরের রাজনীতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া বৃথা। অনন্ত-মিশ্রের মনে হলো উদয় সিংহের হয়তো মীরাবাঈ-এর বর্তমান অবস্থার কথা জানা নেই। তাই তিনি মীরাবাঈ-কে আবার চিতোরে ফিরে পেতে চেয়েছেন। কিন্তু আজকে মীরাবাঈ-কে যে অবস্থায় এবং যে ভূমিকায় দেখা গেল, উদয় সিংহ যদি নিজে চোখে মীরাবাঈ-এর এই অবস্থা দেখতেন, তাহলে তিনি নিজেই আর মীরাবাঈ-কে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইতেন না। কারণ তিনি নিশ্চয়ই বুঝতেন যে, শ্রীবৃন্দাবনে মীরাবাঈ-এর মানসিকতার যে উত্তোরণ ঘটেছে তা' চিতোরে সম্ভব নয়। চিতোরের কুটিল রাজনীতিতে এই মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে মূলতঃ কোন লাভ হবে না।

চিতোরের যাত্রা পথে অনন্তমিশ্র উদয় সিংহকে কি বলবে তার একটা মোটামুটি খসড়া করে নিয়েছিল। কারণ উদয় সিংহের হুকুম ছিল যে মীরাবাঈ কে যে ভাবেই হোক ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু অনন্ত-মিশ্র সেটা পারেনি। অতএব অনন্ত-মিশ্রের জবাবটা যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া প্রয়োজন। না হলে বর্তমান রাণার অখুশি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তবে অনন্ত মিশ্রের মনে হলো, মীরাবাঈ-এর বর্তমান অবস্থার কথা সে উদয় সিংহকে ভালভাবেই বোঝাতে পারবে।

অনন্ত মিশ্র ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চিতোরে ফিরে গিয়ে, উদয় সিংহকে মীরাবাঈ-এর বর্তমান অবস্থার কথা জানিয়েছিল। উদয় সিংহ মীরাবাঈ-এর অবস্থার কথা জেনে বিস্মিত হয়েছিল।

কিছুদিন পরেই মীরাবাঈ-এর কাছে খবর এসেছিল যে, আকবরের যুদ্ধ ঘোষণায় চিতোরে সাজ সাজ রব উঠেছে। সমস্ত সর্দারেরা নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্যে সমস্ত সেনাপতি ও সৈন্যদের একত্রিত করে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা চালাচ্ছে। খবর পাঠানো হয়েছে চণ্ডের প্রতিনিধি শালুম্ব্রাপতি সহিদাসকে, কৈলবাপতিগণকে, বাগোরের অধীশ্বর সঙ্গ ও অন্যান্য গোত্রের সামন্তগণকে। তার মধ্যে রয়েছেন কোতেরিয়া ও বৈদলার চৌহানগণ, বিজল্লির প্রামারেরা, সঙ্কোরপতি পৃথিবরাজ ও জিতাবৎ লুনকর্ণ। তারা সকলেই এই যুদ্ধে উদয় সিংহকে সহযোগীতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কারণ এ যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ। চিতোর রক্ষার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে উদয় সিংহের পরাজয় হলে সমস্ত ভারতভূমি এক কঠোর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। হিন্দুজাতি শেষ হয়ে যাবে। দেশের জনগণকে বোঝানো হচ্ছে যে, যেখানে বাপ্পা, সমর সিংহ, হাম্বীরের মত রাজনীতিবিদ, শাস্ত্রবিদ, ও সমর নিপুণ ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করেছেন ও সাফল্যের সঙ্গে শাসন দণ্ড পরিচালনা করেছেন, সেখানে উদয় সিংহ-ই বা পারবে না কেন? উদয় সিংহ তো সেই একই বংশের সন্তান। সুতরাং এ যুদ্ধে চিতোরের হার হতে পারে না। চিতোরের জয় অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও শোনা যাচ্ছে যে, আকবর নাকি অনেক সর্দার ও রাজা, মহারাজাকে টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে। সুতরাং এরা যুদ্ধের সময় সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি দিলেও, সময়ে সরে দাঁড়াবে। উদয়ের বিপক্ষে চলে যাবে। তা'হলেও সকলেরই মত এই যে, যুদ্ধ যদি একবার লেগে যায়, তবে ভালমতই হবে। কারণ কেউ আগে ছেড়ে দেবে না। না উদয় না আকবর।

আকবর অবশ্য ক্ষণজন্মা পুরুষ। শিক্ষায়-দীক্ষায়, পাণ্ডিত্যে ও রণনীতিতে তৎকালে তার মত এমন সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। আকবরের সমস্ত শিক্ষাই তার পিতা হুমায়ুনের কাছে। হুমায়ুন নিজ হাতে আকবরকে রাজনীতিতে বিশারদ করে তোলেন। হুমায়ুনের মত এত কষ্টসহিষ্ণু ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ সে যুগে সত্যিই বিরল ছিল। অনেক কষ্ট, সাধনা ও যুদ্ধের পর হুমায়ুন তাঁর নিজের রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

আকবর সিংহাসন লাভ করবার কিছুদিন পরেই কল্পি, চন্দেরী, কলিঞ্জর, সমগ্র বুন্দেল খণ্ড ও মালব নিজের রাজ্যের সীমানার মধ্যে টেনে নিয়ে, রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে ফেলে। আকবরের বয়স তখন মোটামুটি ভাবে আঠারো থেকে বিশ। এবং বিশাল রাজ্যের একাধিপতি।

বিশাল ভারতের একাধিপতি হয়েই, সে রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলো এবং মারাবার রাজ্যে সৈন্য পাঠালো। রাঠোর রাজ মালদেব হুমায়ুনকে বিপদের মধ্যেও বন্দী করবার চেষ্টা করেছিল। সেই কারণে, তার প্রতিফলস্বরূপ আকবরের এই আক্রমণ। সে মেড়তা ও অম্বর নিয়ে নিল। পরে চিতোরে হাত বাড়ালো।

এবারে আকবর এবং উদয় সিংহ। বয়স মোটামুটি ভাবে এক। কিন্তু উদয় সিংহ চিতোরের বাপ্পা রাওল, সমর সিংহ, বীর হাম্বীর ও সংগ্রাম সিংহের বংশধর হলেও আকবরের মত এত কৌশলী, রণনিপুণ, রাজনীতিবিদ, কঠোর পরিশ্রমী ও দার্শনিক ছিল না। ফলে আকবর চিতোর আক্রমণ করলে, উদয় সিংহ আকবরের হাতে বন্দী হল। কিন্তু সে যুদ্ধে রাজপুত রমণীরা যে বীরত্ব ও সাহস দেখিয়েছিল, তাতে আকবর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছিল। সে যুদ্ধ বন্ধ করে রাজপুত রমণীদের সম্মান দেখাবার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। এই যুদ্ধ রাজপুত বীর রমণীদের ইতিহাসে এক জলন্ত উদাহরণ।

চিতোরের ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। চিতোর সম্পর্কে মীরাবাঈ-এর ভাবনা-চিন্তা এবং চেতনা এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত কুঞ্জে সাধনারত মীরাবাঈ-এর মনে চিতোরের ঘটনাবলী বার বারই আঘাত করেছে। শান্তিতে সাধনা করতে দেয়নি। আজকে উদয়ের মৃত্যু সংবাদ যেন চিতোরের সমস্ত ইতিহাসের জীর্ণ পাতা গুলোকে কে যেন চোখের সামনে তুলে ধরলো। শ্বশুর ও স্বামীর বিজয়গড় চিতোর তার সাধনার মূল কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে। সুতরাং মীরাবাঈ জানে যে চিতোরকে বাদ দিয়ে তার সাধনা সম্পূর্ণ নয়। তাই চিতোরকে তার স্মরণে রাখতেই হয়।

আকবরের হাতে উদয় বন্দী। চিতোর বিপর্যস্ত। চিতোর সম্পর্কে এই খবরই

শেষ খবর নয়। মীরাবাঈ-এর কাছে তারপরেও খবর এসেছে যে, উদয় সিংহকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু চিতোরের সর্দারেরা ও সামন্তগণ অন্তর্বিপ্লবে মত্ত। ফলে চিতোরে গৃহবিবাদ ও রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল। এবং শেষে সে অবস্থা এক চরম পর্যায়ে এল। তখন বাধ্য হয়ে চিতোরকে বিশৃংখলার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আকবর আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। আকবরের মনে তখন অসীম সাহস এবং উৎসাহ। বয়সও অল্প। এই সময়ের মধ্যেই সমস্ত ভারতবর্ষ তার পদতলে। অনেক দুর্জয় দুর্গ তখন তার বিক্রমে বিধ্বংস ও চূর্ণ। অনেক রাজ-নৃপতি তার আদেশ পালনের জন্যে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে। অতএব আবার মেবার।

আবার যুদ্ধ। রাজপুতেরা আবার অসীম সাহসে ও বিক্রমে যুদ্ধ করলো। বিক্রমশালী অসংখ্য সৈন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। সর্দার ও সামন্তেরা নিজেদের সেনাদল নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে নামলো। বীরবর শাহি দাস চক্রবৎ অনেক তেজস্বী ও সাহসী সৈন্য নিয়ে সূর্যাদ্বারে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হল। যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে এলো দেবপতি বাঘজীর বংশধরেরা। ঝালোর পতি শনি গরু রাও, ঈশ্বর দাস রাঠোর, করমচাঁদ কচ্ছবাহ, ও গোয়ালিয়রের তুষার রাজ। এরা সকলেই বীরত্বে প্রসিদ্ধ।

যুদ্ধ আরম্ভ হলো। রাজপুত বাহিনী বিকট সিংহনাদে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মোঘলেরা সাগর-সাদৃশ সৈন্য ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো। রাজপুতেরা বীর, সমর নিপুণ। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত নয়। তারা আধুনিক অস্ত্রের যুদ্ধকে বীরত্বের যুদ্ধ বলে মনে করে না। মনে করে কৌশলের যুদ্ধ। কিন্তু মোঘলদের সমর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ আধুনিক অস্ত্রে। ফলে রাজপুত সেনাপতিগণ একে একে ভূপাতিত হতে লাগলো। চিতোরের সমস্ত রানীরা, সর্দারেরা, সৈন্য, সামন্ত ও সমস্ত রাজপুত রমণীরা চিতোর রক্ষার জন্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েও চিতোর রক্ষা করতে পারলো না। চিতোর আকবরের হাতে চলে গেল। কিন্তু তখন চিতোর শ্বশানপুরী ছাড়া আর কিছু নয়।

চিতোর গেল। আরাবল্লী পর্বতের মধ্যে যে পাহাড়-পর্বতে এবং জঙ্গল অঞ্চলে হারীতের আশ্রমে বাপপা রাওল সাধনা করেছিলেন, উদয় সিংহ সেই অঞ্চলের দিকে চলে এলো। পাহাড়-পর্বতে ঘেরা সে অঞ্চলে কোন শত্রু সহজে প্রবেশ করতে পারে না। উদয় সিংহের কিছু অনুগামী সর্দার ও তাদের আত্মীয় বর্গেরাও আকবরের ভয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিল। উদয় সিংহ তাদের সাহায্যে সেখানে ছোট, উপত্যকার পাশে একটি দিঘী কাটিয়ে তার নাম দিল উদয় সাগর। এই উদয় সাগরের কাছেই একটা পাহাড়ের ওপর সে নিজের বাসভূমি গড়ে তুলে তার নাম রাখে 'ন চৌকী'। উদয় সিংহ আপাততঃ এখানে বাস করলেও তার নজর রইলো চিতোরের দিকে। চিতোর তার মাতৃভূমি। চিতোর তার স্বপ্ন।

এরপর চিতোর দুভাগ হয়ে যায়। চিতোরের সমস্ত সমতল ভূমি আকবরের দখলে আসে এবং পার্বত্য ভূমি থাকে উদয় সিংহের দখলে। চিতোর গড়ের যুদ্ধে যাঁরা মারা যাননি এবং আকবরের অধীনতা স্বীকার করতে রাজী নন, এমন বহু

সর্দার উদয় সিংহের সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে আসেন এবং উদয় সাগরের পাড়ে 'ন-চৌকীর' কাছে তাঁদের নিজেদের বাসস্থান নির্মাণ করেন। চিতোরের সমতল ভূমি থেকে অনেক সর্দার এবং প্রজা সেখানে চলে আসার ফলে ঐ উদয় সাগরের পাড়ে আবার এক নতুন সাগরের পত্তন হয়। নাম উদয় পুর। উদয় সিংহ আবার নতুন করে উদয় পুরেই নিজের রাজধানী স্থাপন করে। দুর্গম পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, গুহা ও জলস্রোত ভেদ করে উদয়পুরে আসা কোন শত্রুর পক্ষে সহজ সাধ্য ছিল না। আকবর আপাততঃ সে চেষ্টা থেকে বিরত ছিল। মেবার দু'ভাগ হয়ে গেল। চিতোরের ভাগ আকবরের দখলে রইলো। এবং উদয়পুর উদয়ের শাসনে। শেষের ভাগে পাহাড়-পর্বতই বেশী। কিন্তু তা' হলেও মেবারের কিছু অংশ রাণাদের আধিপত্য রইলো। রাণারা কোন প্রকার টিকে রইলো এবং পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে লুপ্ত গৌরব আবার ফিরে পাবার চেষ্টা করতে লাগলো। এই যুদ্ধের পর উদয় সিংহ বার বার চিতোর ফিরে পাবার চেষ্টা করেছে।

আকবর উদয় সিংহের রাজত্ব কালের মধ্যেই অন্যান্য রাজপুত রাণাদের হাত করে ফেলেছিল। সে চিতোর পেল। কিন্তু উদয় সিংহকে পেল না। উদয় সিংহ যে জায়গায় চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে তাকে ধরা অসম্ভব। আপাততঃ আকবর ওদিকে আর হাত বাড়ালোনা। চেষ্টাও করলো না।

অম্বর অথবা জয়পুরের রাজা বিহারীমল এবং তার পুত্র ভগবান দাস প্রথম থেকেই আকবরের পক্ষে যোগদান করে। বিহারীমলের এক কন্যাকেও আকবর বিবাহ করেছিল। মোগল হারেমে হিন্দু কন্যা নিয়ে আসবার প্রথা আকবরই প্রথম চালু করে। রাজনৈতিক কারণে আকবর রাজপুতদের আপন করবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে লাগলো। তার অনুগত রাজপুতদের বিশ্বাস করে দিল্লীর দরবারে ভাল ভাল পদও দিতে লাগলো। এবং সব শেষে আত্মীয়তা পাতাবার জন্যে বিবাহও করতে লাগলো। আকবরের ধারনা ছিল রাজপুতেরা জাতিতে আর্য। এরা প্রাচীন সূর্য ও চন্দ্রবংশ থেকে উদ্ভূত। মহাভারতের ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ, বলরাম এবং রামায়ণের রাম লক্ষ্মনের রক্ত এদের দেহে প্রবহমান। এদের ধর্ম, আচার, নিয়ম ভারতের গৌরব।

আকবর ছিল তুর্কী বংশীয়। জাতিতে ম্লেচ্ছ। সে জানতো যে, হিন্দুরা তাদের ম্লেচ্ছ ও অপবিত্র মনে করে। সুতরাং এই রাজপুত কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আসতে পারলে তার বংশের গ্লানি ও কিছুটা কমে যাবে। সেই কারণেই তার এই বৈবাহিক আত্মীয়তার প্রচেষ্টা এবং শেষে সফলতা লাভ। প্রথমে রাজপুত হিন্দুরা কন্যাদানে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু পরে যখন দেখলেন যে, এই আত্মীয়তায় তাঁদের রাজ্য সুরক্ষিত এবং গৌরব বাড়বে, তখন অনেকেই সাহস করে এগিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁরা মনে করতে লাগলেন যে, এতবড় একটা শক্তিকে পাশে পাওয়া গৌরবের বস্তু। শেষে এ আত্মীয়তা একটা সম্মানীয় কাজ হয়ে দাঁড়ালো।

চিতোর জয়ের কিছুকাল পরেই আকবর মারবার জয় করে এবং পরে অম্বর। ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা অবস্থা বুঝে নিজেরাই বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন।

উদয়সিংহ অনায়াসেই আকবরের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে পারতো। কিন্তু সে আজীবন নিজের মান, মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করেই চলতে চেয়েছিল। মোগলের পদে মাথা নত করবার চেয়ে মৃত্যুকেও সে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিল। উদয় সিংহ বলতো ঃ মেবার আমার মা। মা-কে কলঙ্কিত করবার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

উদয় সিংহের যেমন জেদ্ ছিল যে, সে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করবে না। তেমন আকবরও জেদ ধরেছিল যে, সে যে ভাবেই হোক উদয় সিংহ কে বশে আনবেই। রাজস্থানে মেবারই সকলের বড়। ও রাজ্যটাই যদি সে নিজের হাতে না পেল তবে কিসের সাম্রাজ্য। কিসের প্রভুত্ব, কিসের আধিপত্য। সুতরাং তার কাজ হল ছলে, বলে এবং কৌশলে উদয় সিংহ কে পরাজিত করা। এই মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আকবর নানা ভাবে উদয় সিংহ কে দমন করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

এদিকে সমস্ত আর্যাবর্তে হিন্দুদের কোন প্রভুত্ব নেই। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ আর্যাবর্তে হিন্দুর প্রভুত্ব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। সেই আর্যাবর্তের হিন্দু রাজপুত রাই এখন আকবরের হাতে। এই সব হিন্দুদের হাতে পেয়ে আকবর তার বাদশাহী শক্তি দৃঢ় করে নিয়েছিল। এখন এ-শক্তিকে ভাঙ্গন ধরানো অসম্ভব। অম্বর, মারবার, বুন্দি, সকলেই মোগলের পক্ষে এবং তাঁরাও চান যে তাঁদের মত উদয় সিংহও আকবরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করুক।

উদয় সিংহের শত্রু শুধু বাইরেই নয়। ঘরেও। চিতোরের অনেক সর্দার গোপনে গোপনে যুদ্ধের আগেই আকবরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। যে কারণে তার এই পরাজয়। বাইরের অনেক রাজ্য যুদ্ধের সময় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাখেনি। কারণ আকবরের অনুগ্রহ লাভের ইচ্ছা উদয় সিংহ তার দীর্ঘ জীবনে সবই দেখলো। কিন্তু তবুও ভেঙ্গে পড়েনি। সে বরাবরই আশাবাদী। তা না হলে কুম্ভল গড়ে আত্মগোপনকারী রাজকুমারের পক্ষে চিতোরের রাণা হওয়া সম্ভব হতো না। আবার চিতোর তার হাতে ফিরে আসবে উদয় সিংহ সে আশা এখনও পোষণ করে। মেবারের অর্দ্ধেক গিয়েছে। স্বয়ং আকবর শত্রু। প্রায় সমস্ত রাজপুত রাজারাই তার বিপক্ষে। কিন্তু তবুও উদয় সিংহ দমে গেল না। সে তার মনের দৃঢ়তা আর সঙ্কল্প আরও বাড়ালো। সে মনে মনে সঙ্কল্প করলো যে, এই পাহাড় জঙ্গল ভরা অর্দ্ধেক মেবারের বলেই সে আকবরের বিরুদ্ধে আবার লড়বে। নিজের মান, কুল রাখবে। তবুও তুর্কীদের কাছে মাথা নত করবে না। তুর্কীদের করুণায় সুখ, সম্পদ ও ভোগের আশা মনে স্থান দেবে না। সে নিজের রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করলো। প্রজাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের মন জয় করে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলো। দেশ প্রেম ও জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করবার প্রেরনা যোগাতে লাগলো। বর্তমানে তার রাজ্য ছোট। জনবল অল্প। তবুও এদের নিয়েই উদয় সিংহ আবার লড়বার জন্যে তৈরী হতে লাগলো। সে উদয়পুর, কমলমীর, গোগুন্ডা এবং আরও যে সব পাহাড়ী দুর্গ তার অধিকার

ছিল, সেইসব দুর্গকে সুরক্ষিত করলো এবং সাধারণ মানুষকে সেনাদলে ভর্তি করে যুদ্ধ বিদ্যা শেখাতে লাগলো। মেবারের সমতল ভূমি প্রায় সবই আকবরের হাতে। উদয় সিংহ আদেশ দিল, মেবারের যাঁরা খাঁটি প্রজা, রাণার শাসন যাঁরা চান, দেশের এই দুর্দিনে মঙ্গল যাঁরা চান, এবং স্বদেশের বিদ্রোহী যাঁরা নন, তাঁরা সমতল ভূমি ছেড়ে এই পাহাড়ী অঞ্চলে চলে আসবেন। আমার প্রশাসন যন্ত্র তাঁদের এই পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসের পূর্ণ সুযোগ দেবে।

রাণার এই আদেশ অনেকে যেমন পালন করলো, কিছু লোক আবার অমান্য করতেও কুণ্ঠা বোধ করলো না। উদয় সিংহ সুবিধামত তাদের রাজদ্রোহী বলে শাস্তি দিতে লাগলো। আকবর যাতে চিতোরের সমতল ভূমির শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে না পারে সেইজন্যে রাণা উদয় সিংহ মাঝে মাঝে সৈনাদল নিয়ে সমতল ভূমির গ্রামগুলোকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে লাগলো। অরাজকতা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে লাগলো। এই ভাবে রাণা উদয় সিংহ তার দলবল ও নিজের প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। যুদ্ধের এই ধরণের প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়েই বেশ কয়েক বছর কেটে গেল।

মানসিংহ তখন সবে জয়পুরের রাজপদ লাভ করেছে। বয়সে তরুণ। সাহসে, বীর্যে ও ব্যক্তিত্বে ভরপুর। বিহারীমল ও ভগবান দাসের মৃত্যু হয়েছে। ভগবান দাসের ভাইপো মানসিংহ সেই কারণেই জয়পুরের মসনদে। বিহারী লালের কন্যা ও ভগবান দাসের ভগ্নীকে আকবর বিবাহ করে। সুতরাং আকবর মানসিংহের পিসেমশাই। আকবরের যে যোধপুরী বেগম ছিল সেলিম তারই ছেলে। বাদশাহী পরিবারের সঙ্গে জয়পুরী পরিবারের বড় ঘন কুটুম্বি তার সম্পর্ক। মানসিংহের মান, আদর এবং পদমর্যাদাও মোগল দরবারে বেশী।

মানসিংহের শক্তিও যথেষ্ট। সে আকবরের সবচেয়ে বড় সেনাপতি। রাজ্য শাসনের বুদ্ধিতেও মানসিংহ কম ছিলো না। দূরের যে প্রদেশে বেশী গোলমাল হত, আকবর মানসিংহকে সেখানেই শাসন কর্তা করে পাঠাতো। মানসিংহও সহজেই সব গোলমাল দূর করে সেই প্রদেশ বশে এনে ফেলতো। মানসিংহের বলে আকবরের বল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। মানসিংহকে পেয়েছিল বলেই আকবর এত সহজে তার বাদশাহী মসনদ গড়তে পেরেছিল। মানসিংহের যোগ্যতা বুঝে, মন বুঝে আকবর তার হাতে বড় বড় কাজের, বড় বড় যুদ্ধের, সৈন্য পরিচালনার ভার দিত। অপরদিকে মান সিংহও সেই বিশ্বাস রেখে আজীবন সকল শক্তি দিয়ে আকবরের জন্যে লড়েছিল এবং তাকে বড় করে তুলেছিল।

আকবর মানুষ চিনতো। যোগ্য লোক পেলে, বিশ্বাসী লোক পেলে, সে জাতি ধর্মের বিচার করতো না। তার কাছে হিন্দু-মুসলমান বলে কিছু ছিল না। যোগ্যতাই বড় কথা। ভাল লোক দেখলে, তাকে যাচাই করে নিয়ে, তার যোগ্যতা অনুসারে পদ মর্যাদা দিত। মানসিংহ হিন্দু সেই হিন্দুকে দিয়েই তামাম হিন্দুস্থানে সে তার বাদশাহী মসনদ পাকা করে নিয়েছিল। মানসিংহ রাজপুত। সেই রাজপুতকে দিয়েই আর এক রাজপুত উদয় সিংহের কাঁটা তোলবার চেষ্টা করেছিলেন।

অনেক পরিকল্পনা করে মানসিংহকে শেষবারের মত উদয় সিংহের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উদয় সিংহের জীবদ্দশায় তা' সম্ভব হয়নি। যদিও তখন হিন্দুই হিন্দুর শত্রুতা করেছে বেশী। হিন্দু তেমন করে এদেশে হিন্দুর পাশে বুক বেঁধে দাঁড়ায়নি কখনও। সেই কারণে বুদ্ধিতে আর শক্তিতে এত বড় হয়েও এদেশের হিন্দুকে বিদেশী পাঠান এবং মোগলের অধীন হতে হয়েছে। সংখ্যায় অল্প হয়েও পাঠান মোগলরা হিন্দুকে অধীনে রাখতে পেরেছে।

উদয়সিংহ চিতোর ত্যাগের পর মীরাবাঈ-এর সঙ্গে তার আর কোন যোগাযোগ ছিল না। মীরাবাঈ জানতো যে উদয় সিংহ চিতোর ত্যাগ করে আরাবল্লীর গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে। এবং পরে তারই আশেপাশে প্রাসাদ তৈরী করে বাস করছে। সে দু'-একবার উদয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু সফল হয় নি। উদয়ের সঙ্গে মীরাবাঈ-এর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে মীরাবাঈ খুবই দুঃখিত হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মীরাবাঈ ছিল উপায়হীন। আজকে শ্রী বৃন্দাবনের আশ্রমে সে একজন সাধারণ সাধিকা মাত্র। চিতোরের মত এখানে তার কোন জনবল বা লোকবল নেই। যাদের দিয়ে উদয়কে খুঁজে বার করা সম্ভব। মীরাবাঈ ভেবেছিল, উদয় সিংহ সম্পর্কে তার কর্তব্য এখানেই শেষ হলো। এরপর উদয় যদি নিজে উৎসাহিত হয়ে মীরাবাঈ-এর খোঁজ-খবর শুরু করে, তবেই যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারে। নতুবা নয়। কিন্তু বেশ কয়েক বছরের মধ্যে উদয় সিংহ মীরাবাঈ-এর সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগ করে নি। সুতরাং মীরাবাঈ ধরেই নিয়েছিল যে, উদয় সিংহ তাকে ভুলে গেছে। উদয়ের জন্যে মীরাবাঈ-এর মন মাঝে মাঝে আনমনা হলেও, সে নিজেকে ঐ চিন্তা থেকে বিরত রেখেছে। কৃষ্ণ নামে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। তারপরেই আকস্মিক ভাবেই উদয় সিংহে মৃত্যুর খবর এলো। অনন্ত মিশ্র খবর নিয়ে এলো যে আরাবল্লীর গভীর অরণ্যের কাছাকাছি গোগুণ্ডা নামে এক জায়গায় উদয় সিংহ মানব লীলা সম্বরণ করেছে। মৃত্যুর সময় সে নিজের প্রাসাদেও ছিল না।

উদয় সিংহের মৃত্যু মীরাবাঈ-এর জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চিতোরের যুবরাজদের মধ্যে একমাত্র উদয়সিংহ-ই মীরাবাঈ-এর কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। মীরাবাঈ-এর পুত্রের মতো হয়ে গিয়েছিল। এর পেছনে অবশ্য উদয় সিংহের মায়ের হাত ছিল। উদয় সিংহের মা চেয়েছিলেন যে উদয় সিংহ মীরাবাঈ-এর কাছেই মানুষ হোক। তাঁর এ-ইচ্ছাটা ছিল পরিপূর্ণ ভাবে রাজনৈতিক। মীরাবাঈ ছিল মেড়তা-কন্যা উদয় সিংহের মা চেয়েছিলেন, মীরাবাঈ-এর কাছে নিজের পুত্রকে পাঠিয়ে মীরাবাঈকে হাতে রাখতে। তাহলে মেড়তার জনগণ তার হাতে থাকবে। উদয় সিংহ অথবা তার বড় ভাই বিক্রমাজিৎ সিংহ যদি কখনও চিতোরের রাণা হতে পারে, তাহলে মেড়তার সমর্থন লাগবে। মীরাবাঈ যদি হাতে থাকে তবে সে কাজটা সহজেই হয়ে যাবে। অবশ্য উদয় সিংহের মায়ের সে ইচ্ছা ফলবতী হয়নি। তবুও চিতোরের শেষ অধ্যায়ে উদয় সিংহ চিতোরের রাণা হয়েছিল। এবং মীরাবাঈ-এর ডাকও পড়েছিল।

উদয় সিংহের মৃত্যু সংবাদ মীরাবাঈকে যতটা ব্যথিত করেছে, চিতোরের আর কোন

যুবরাজের মৃত্যু মীরাবাঈকে এতোটা ব্যথিত করেনি। সেই কারণেই উদয়ের মৃত্যু সংবাদ মীরাবাঈ-কে মুহূর্তে আমূলে নাড়া দিয়ে গেল। জীর্ণ পাতাগুলো দুরন্ত ঝড়ে ঝরিয়ে দিয়ে গেল। বলে গেল; উদয় নেই-নেই-নেই। মীরাবাঈ এর এই বেদনাটা তার শরীরের সমস্ত তারে ধ্বনিত হয়ে, পরিমন্ডলে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

জানালায় গরাদ ধরে মীরাবাঈ এক দৃষ্টে সামনের নদীটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার দু'চোখে জল।

॥ এগার ॥

চিতোর জয়ের পর আকবরের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো সেখানে শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এবং এ কাজ আকবর খুবই সাফল্যের সঙ্গে সক্ষম হয়েছিল। তার মত রণবিদ, রাজনীতিবিদ এবং সুপ্রশাসক চিতোর জয়ের প্রারম্ভেই বুঝে নিয়েছিল যে হিন্দু সাম্রাজ্যের দুর্বলতার জন্যেই চিতোর গড় তার হাতে চলে এলো। চিতোর গড়ের অনন্ত রত্নভান্ডার বারবার বিদেশী লুণ্ঠনকারীরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। এবং বার বার আক্রান্ত হয়েছে। তার একমাত্র কারণ সামন্ততন্ত্র। এইসব সামন্তেরা কোনদিনও সংহত অথবা কেন্দ্রীভূত ছিল না। এদের শক্তি ছিল ছড়ানো। রাণা-মহারাণাকে সামন্তেরা সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে জায়গীর ভোগ করতো। কোন বিদেশী শক্তির আক্রমণের সময় যদি এইসব সামন্তেরা সৈন্য দিয়ে সাহায্য না করে তবে রাণা অথবা মহারাণারা উপায়হীন হয়ে পড়ে। এবং তার পরাজয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আকবর জানে যে কেন্দ্রীকরণ শাসনপ্রণালীর অভাবই চিতোরগড়ে বারবার বহিঃশত্রুর আক্রমণের পথকে সুগম করে দিয়েছে। যে সময়ে সেকেন্দর শাহ ভারত আক্রমণ করে সেই সময়েও ভারতের রাজশক্তির ঐ একই অবস্থা ছিল। তখন এক পঞ্চনদ প্রদেশই অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এবং প্রত্যেকটি রাজ্য এক একজন রাজার অধীনে ছিল। এ ছাড়াও সেখানে অনেক নাগরিক সমাজ ছোট ছোট সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের জাহির করবার একটা চেষ্টা চালাতো। কেন্দ্রীকরণ শাসনপ্রণালী না থাকার জন্যে সেখানে বহিঃশত্রু অনায়াসেই আক্রমণ করে বসতো। এবং লুণ্ঠন চালাতো। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাহিরের কত শত্রু যে ভারতের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তার হিসাব করা যাবে না।

এ সবই আকবরের জানা আছে। আকবর ভাল করেই জানে যে সেকেন্দার শাহের আগেও পারসীকরা ভারত আক্রমণ করেছিল। পারসীকদের পর আসে গ্রীকেরা। তারপর পার্থীয়ানেরা। পার্থীয়ানের পর গেটেস্। ইতিহাসও বিভিন্ন মুদ্রাই এই আক্রমণের প্রমাণ। কিন্তু বিচিত্র এই যে এরা কেউ ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়তে পারেনি। ঘোরী বংশীয় সাহাবুদ্দীনই ইন্দ্রপ্রস্থে সর্বপ্রথম স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। তার সময় থেকে চেঙ্গিস খাঁর বংশ-সম্ভূত বাবরের কাল পর্যন্ত এই তিনশো শতাব্দীর মধ্যে পাঁচবার ভারত আক্রমণ হয় এবং অপরের হাতে চলে

যায়। প্রতিবারই এক একজন মুসলমান নতুন নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরে তা' আবার লুপ্ত হয়ে যায়। আকবার জানে যে এইসব ব্যর্থতার মূলে অশক্ত কেন্দ্রীয় শাসন। যারা অপরের রাজ্য আক্রমণ করবে তাদের যেমন একটি সুশাসিত কেন্দ্রীয় শাসন থাকা দরকার; তেমনই সামন্ততন্ত্র রাজন্যবর্গেরও শাসন-শক্তির কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন। অপ্রয়োজন মনে করলেও সামন্তরাজারা অথবা রাণারা তা কার্যকরী করতে পারেনি। তার ফলেই চিতোরগড়কে বারবার পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। এবং আকবর নিজেও জানে যে সে সেই সুযোগই গ্রহণ করেছে। সুতরাং চিতোর জয়ের পর আকবরের কাজ হলো চিতোরে কেন্দ্রীকরণ শাসনপ্রণালী চালু করা এবং সর্দার ও সামন্তবর্গের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাখা। তাদের লোভী মনে অবিরাম খাদ্য জুগিয়ে যাওয়া। কারণ আকবর জানতো যে চিতোরে এরাই সবচেয়ে প্রতাপশালী ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী। আকবর তার সুচিন্তিত পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একদিন চিতোরে তার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

চিতোরের দুর্বলতা মীরাবাঈ-এর জানা ছিল। এবং কোন কেন্দ্রীভূত শাসন-প্রণালী রাজ্যকে শক্ত করে তা'ও মীরাবাঈ এর অজানা কিছু নয়। কিন্তু মীরাবাই এর প্রতিকূল পরিবেশের জন্যেই তা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে চিতোরে প্রবর্তিত শাসনপ্রণালী দেখে মীরাবাঈ মনে মনে আকবরকে তারিফ না করে পারেনি। মীরাবাঈ-এর আগে আগেই মনে হয়েছে যে আকবর শুধু সমরবিদ্‌ সুপণ্ডিত ও সুশাসকই নয় তার নিজের অতীত চিন্তার ফসলও বটে। মীরাবাঈ নিজে এবং মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ভোজরাজ চিতোরে যে শাসন প্রবর্তিত করবার চেষ্টা করেও সক্ষম হয়নি, আকবর তা বেশ সহজেই করতে পেরেছে। সেইদিক থেকে মীরাবাঈ এর মানসিকতার সঙ্গে আকবরের মানসিকতার অনেক মিল।

অপরদিকে মীরাবাঈ চিতোরে বসে যে সংগীত-সাধনা করেছিল, যে কৃষ্ণ-প্রেম ও-ভাগবত বোধ সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলে যে ঐক্যতা গড়ে তুলেছিল এবং 'সবার ওপরে মানুষ সত্য', তার এই উপলব্ধির যে বীজ বপন করেছিল, তা' আকবরের কানে এসেছিল এবং আকবর মীরাবাঈ-এর এই বোধকে মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছিল। আকবরের মধ্যে এ বোধ প্রথম জাগিয়েছিলেন হুমায়ুন। হুমায়ুন প্রথম বুঝেছিলেন যে, ভারতে রাজত্ব করতে গেলে এবং একছত্র সম্রাট হতে গেলে ও সব শেষে সে রাজ্য টিঁকিয়ে রাখতে গেলে, সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথ ধরে চলতে হবে। ভারতের সব ধর্মকেই সমান চোখে দেখতে হবে। সবাইকেই সমান অধিকার দিতে হবে। এবং শাসন ব্যবস্থা হবে কেন্দ্রীয়। হুমায়ুনের এই শিক্ষা আকবর পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেছিল। সেই কারণেই মীরাবাঈ-এর মানসিকতার সঙ্গে আকবরের এত মিল ছিল। আকবর মনে মনে মীরাবাঈকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও করতো। সেইজন্যে চিতোর জয়ের পর আকবর মীরাবাঈ-এর সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে গোপনে লোক পাঠিয়েছিল। কিন্তু মীরাবাঈ নানা অজুহাতে সে যোগাযোগ প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু পরে মীরাবাঈ আকবরের শাসন প্রণালী দেখে তার প্রতি আস্থাবান

হয়েছিল। পরবর্তী কালে চিতোরে যে শাসন ব্যবস্থা আকবর চালু করেছিল, তা সর্বধর্ম-সমন্বয় এবং কেন্দ্রীয় করণের ভিত্তিতে। তামাম হিন্দুস্থানে আকবর যে শান্তি ও শৃঙ্খলা গড়ে তুলেছিল, যে দেশপ্রেম ও সকল ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিবাদের পত্তন করেছিল, তা'তে মীরাবাঈ মুগ্ধ না হয়ে পারে নি। তখন মীরাবাঈ-এর বারবারই মনে হয়েছে যে, যে ধ্যান-ধারণা, যে আদর্শ এবং ভারতের মূল মর্মবাণীর যে ভিৎ চিতোরে সে গড়তে চেয়েছিল, সে মূলবাণীর সঙ্গে মীরাবাঈ-এর স্বামী ও শ্বশুর যুক্ত ছিলেন। তাঁরা যুক্ত থাকা সত্ত্বেও মীরাবাঈ চিতোরে সে কাজের ভিৎ গড়েও সম্পূর্ণ গড়তে পারেনি। কিন্তু আকবর খুব সহজেই সে মর্মবাণীর মূল উৎঘাটিত করেছে। এবং চিতোরে তা পত্তনের পর ধীরে ধীরে তা, তামাম হিন্দুস্থানের দিকে প্রসারিত। আকবরের শাসন প্রণালীর এই যে পদ্ধতি তা মীরাবাঈ-এর মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। মীরাবাঈ বুঝেছিল যে আজকে আকবর যা' করলো, তা' যদি আগে করা যেত, তা'হলে দেশটা এমন টুকরো টুকরো হয়ে যেতো না। কিন্তু চিতোরের রাজপরিবারের মতবিরোধ, মনমালিন্য, মহিলা-মহলের কোন্দল আর লোভ, রাজপরিবারকে শেষ করে দিল। একটা বিশেষ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওরা মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে এক পতাকা তলে এসে দাঁড়াতে পারলো না বলেই আজ চিতোর অপরের হাতে চলে গেল। তবুও মীরাবাঈ-এর শেষ সান্ত্বনা ছিল এই যে, আকবর তার মূল আদর্শ ও মর্মবাণী গ্রহণ করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে রাজ্য শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে আকবর যখন মীরাবাঈ-এর কাছে দ্বিতীয়বার দূত পাঠিয়ে তার সু-স্বাস্থ্য কামনা করলো এবং তার আদর্শ ও মর্মবাণীর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে জানালো যে সে নিজে ব্যক্তিগত ভাবে সর্বধর্ম-সমন্বয় এবং কেন্দ্রীয় করণ শাসনে বিশ্বাসী, তখন মীরাবাঈ সাড়া না দিয়ে পারে নি। মীরাবাঈ বহুদিন ধরে যে ধ্যান-ধারণা ধীরে ধীরে মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ও ভোজ রাজের মধ্যে আরোপ করেছিল এবং যে বিশ্বাসে ভর করে সে জীবনের এতো দীর্ঘ পথ পার হয়ে এলো, সেই বিশ্বাসের কথাই সেদিন সে আকবরের দূতকেও শুনিয়েছিল। সে বলেছিল: যুদ্ধ-বিগ্রহ অনেক হলো। অনেক রাজ্য জয় হলো। লোভ মানুষের জীবনকে আচছন্ন করে ফেলেছে। যে দিকেই তাকাই, দেখি মানুষ এখন লোভের দাসত্ব করছে। এ দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি নেই। মানুষের ক্রমবর্ধমান লোভই আজ দেশটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দিল। আপনি এখন তামাম হিন্দুস্থানের মালিক। দেশ জয় আপনি অনেক করলেন। এবারে দেশ গড়ার পালা। দেশটা সাধারণ মানুষের। সাধারণ মানুষ দেশ জয়, যুদ্ধ জয়, এ সব বোঝে না। তারা স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাতে চায়। বাস করতে চায়। আপনার এখন কাজ হওয়া উচিত সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি নজর দেওয়া। তাদের শান্তি ফিরিয়ে আনা। দেশে যদিও নানা ধর্মের মানুষ বাস করে, তবুও আমি মনে করি মানুষের একটাই ধর্ম। আর সে ধর্ম হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধ আর ভালবাসা দিয়ে দেশকে

আবার নতুন করে বাঁধতে হবে। যে দেশ কবীর, নানক, তুলসীদাস ভক্তিবাদের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যে দেশে সকলের সমান অধিকার। আপনি সেই দেশ গড়ে তুলুন। আমি জানি আপনি সেই পথ ধরেই চলেছেন। ভারতের সেই মূল মর্মবাণীর দ্বার উৎঘাটনে সক্ষম হয়েছেন। আপনার শুভ কর্ম পথ ও চেতনার সঙ্গে আমার শুভ ইচ্ছা ও চেতনাও যুক্ত রইলো।

আকবর সেদিন খুশি মনে মীরাবাঈ-এর আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি যথাযথ সম্মান ও আনুগত্য জানিয়েছিল।

॥ বার ॥

শ্রীবৃন্দাবনে এসে মীরাবাঈ যেমন মানসিক শান্তি পেয়েছে, তেমন দুঃখও কিছু কম পায় নি। এখানে সে দেখেছে মন্দিরের মোহান্তদের মধ্যে মালিন্য, কলুষতা আর দ্বন্দ্ব। গিরিধারীলালের সেবার চেয়ে, সেবার আয়োজনটাই বড়। ভক্তি, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার চেয়ে, প্রচার-প্রসারই বড়। নির্জন ধ্যানের চেয়ে, লোক জমানোটাই এর সাফল্যের মাপকাঠি বলে মনে করে। এইসব দেখে-শুনে মীরাবাঈ মনে মনে ব্যথিত হয়েছে। সে তার নিজের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে নির্জন ধ্যান, গিরিধারীলালের নিত্য সেবা ও সংগীত। সে বার বার বলেছে, তার মতে ও পথে যারা বিশ্বাসী, তার আশ্রমের দরজা তাদের জন্যে চিরকাল খোলা থাকবে। তারা এখানে আসবে, বসবে, গিরিধারীলালের পুজো দেবে। গান শুনবে এবং গাইবে। ভক্তিবাদে যারা বিশ্বাসী তারাই এই আশ্রমের আশ্রমিক ও আশ্রমিকা। অকারণ ঢাক পিটিয়ে লোক জমানোর তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। তার এই ডাকে একদিকে যেমন লোকে সাড়া দিয়েছে; অপর দিকে তেমন লোকে তার নামে কুৎসাতেও মুখর হয়েছে। মীরাবাঈ এ সবে দুঃখ পেয়েছে কিন্তু প্রতিবাদ করেনি। সে সব সময়ই চেষ্টা করেছে, স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে সবাইকে কাছে রাখতে। ভাগবত প্রেমে বিশ্বাসী করতে। এ ব্যাপারে কোথাও মীরাবাঈ-এর সাফল্য এসেছে। আবার কোথাও আসেনি। এ ছাড়াও মীরাবাঈ-এর বাড়তি বেদনার কারণ হয়ে আছে চিতোর গড়। অতীতের বেদনার স্মৃতি আর জীর্ণ ঝরাপাতার হাহুতাশ। মাঝে মাঝে চিতোর গড় থেকে এমন একটা খবর আসে যা' মীরাবাঈ-কে মুহূর্তে অতীতে টেনে নিয়ে গিয়ে, অন্তর্জগতে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করে। পুরোনো ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে রাশি রাশি ঘটনাপুঞ্জ তার সামনে হাজির করে দেয়। ফলে মীরাবাঈ এর মন থেকে 'শান্তং সুন্দরম্'—এ বাণী ব্যর্থ প্রমাণিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। যেমন এবারের উদয় সিংহের মৃত্যুর খবর।

নারীজাতির পূর্ণবিকাশ যে মাতৃত্ব, মীরাবাঈ-এর সেই মাতৃত্বের মধ্যমণিতে উদয় সিংহ দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার ভাবনা-চিন্তা কি উদয় সিংহকে কেন্দ্র করেই শুরু এবং শেষ? এর বাইরে কি তার ভাবনা চিন্তা অথবা চেতনা প্রসারিত হচ্ছে না? উদয়

সিংহের চিন্তার মধ্যে যেমন বেদনা আছে, তেমন মাধুরীও আছে। মাতৃত্বের মাধুরী। কিন্তু মীরাবাঈ-এর উদয় সিংহকে যেমন মনে পড়েছে, তেমন তারই জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা বিক্রমাজিৎ সিংহকেও কিছু কম মনে পড়ে নি। বিক্রমাজিৎ সিংহের ভাবনায়, শুধুই অবিচার, অত্যাচার, কুটিল চক্রান্ত আর চোখের জল। বিক্রমাজিৎ সিংহ মীরাবাঈ-কে যত অপমান করেছে, তার ওপরে যত অত্যাচার চালিয়েছে, রাণা পরিবারের আর কোন যুবরাজ এমন করেনি। করতে সাহস পায় নি। মীরাবাঈ রাণা পরিবারের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র ভোজরাজের স্ত্রী। ভোজরাজ অকালে যুদ্ধে মারা যাওয়ায়, মীরাবাঈ প্রথমে একটু অসহায় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে অসহায়তা ও নিঃসঙ্গতা পূর্ণ করেছিলেন তার শ্বশুর মহারাণা সংগ্রাম সিংহ। তিনি মীরাবাঈ-এর সাধনার জন্যে অনেক মন্দির তৈরী করে দিয়েছিলেন। এবং তিনি মীরাবাঈ-এর বাগ্মীতায় ও রাজনীতির জ্ঞানে মুগ্ধ ছিলেন। রাজ্যের অনেক সমস্যা তিনি মীরাবাঈ-এর সাথে আলোচনা করে মিটিয়েছেন। সুতরাং তখন মীরাবাঈ-এর দিন যাপনের কোন অসুবিধা ছিল না। অসুবিধা শুরু হলো মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর থেকে। ভোজরাজের আগেই মৃত্যু হওয়ায় মহারাণা সংগ্রাম সিংহের অবর্তমানে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রাণা হয়েছিলো। চিতোরে মীরাবাঈ-এর জীবনে অত্যাচার আর অবিচার শুরু হলো মহারাণার দ্বিতীয় পুত্রের আমল থেকে। অর্থাৎ রতন সিংহ-ই প্রথম মীরাবাঈ এর জীবনে অশান্তি ও ঘূর্ণিঝড়ের পত্তন করলো। তবে সে অত্যাচার মোটামুটি ভাবে সহ্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বিক্রমাজিৎ সিংহ রাণা হয়ে যে অত্যাচার শুরু করলো তা এক কথায় অকথ্য। ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বিক্রমাজিৎ সিংহের রাজত্ব কালে মীরাবাঈ এর চোখের জলে ভেজা পাতা আর শুকোলো না। শেষ পর্যন্ত তাকে শ্রীবৃন্দাবনে এসে আশ্রয় নিতে হলো।

রতন সিংহের মৃত্যুর পর বিক্রমাজিৎ সিংহ চিতোরের রাণা পদে প্রতিষ্ঠিত হলো। বিক্রমাজিৎ সিংহ মহারাণা সংগ্রাম সিংহের তৃতীয় স্ত্রী কারমেতনবাঈ-এর প্রথম পুত্র। উদয়সিংহ কারমেতনবাঈ-এর দ্বিতীয় সন্তান। বিক্রমাজিৎ সিংহ রাজ্যের হাল ধরলো বটে কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা রইলো বনবীরের হাতে। রতন সিংহের আমলেও রাজ্যের ক্ষমতা বনবীরের হাতেই ছিল। মীরাবাঈ-এর মাঝে মাঝে মনে হয়েছে চিতোরের রাজনীতিতে বনবীর না এলে হয়তো চিতোরের ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হতো। কারণ রতন সিংহ, বিক্রমাজিৎ সিংহ, এই দুই যুবরাজের মৃত্যুর জন্যে দায়ী বনবীর। বনবীর উদয় সিংহকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। ব্যবস্থাও পাকাপাকি ছিল। কিন্তু মীরাবাঈ-এর হস্তক্ষেপের জন্যে তা সম্ভব হয়নি। চিতোরের অমন বীর মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর জন্যে বনবীর সরাসরি দায়ী। রতন সিংহের আমলে বনবীর যেমন তার ডান হাত ছিল, বিক্রমাজিৎ সিংহের আমলেও সে বিক্রমাজিৎ-এর ডান হাত রূপে দেখা ছিল। অর্থাৎ ক্ষমতার চাবিকাঠিটি রইলো তার হাতে। এটা সম্ভব হয়েছিল মহারাণা সংগ্রাম সিংহের অপদার্থ পুত্রদের জন্যে। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মত অমন বীর, যোদ্ধা, আর সুনিপুণ রাজনীতিবিদ

তাঁর পুত্রেরা কেউ হতে পারে নি। সেইজন্যে তারই পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছে বনবীর।

রাজ্যের চূড়ান্ত দুঃসময়ে কাঁটার মুকুট মাথায় ধারণ করে হাজির হলো বিক্রমাজিৎ সিংহ। বিক্রমাজিৎ সিংহ রাণা হবার সঙ্গে সঙ্গেই খবর এলো বাবরের মৃত্যু হয়েছে। নতুন বাদশাহ এখন হুমায়ুন। এ সংবাদ গুজরাটে আসতেই সুলতান বাহাদুর চিতোর আক্রমণের জন্যে ফৌজ নিয়ে রওনা হয়ে পড়লো। বনবীর খবর শুনে একটু হাসলো। এ যুদ্ধে তার কোন প্রস্তুতি নেই। সে চায় বিক্রমাজিৎ সিংহ যুদ্ধে হেরে গিয়ে অপদার্থ প্রমাণিত হোক। দেশের লোক জানুক যে সে একটা অপদার্থ। একজন অপদার্থ রাণার রাজত্বে তারা বাস করছে। বিক্রমাজিৎ-এর মা কারমেতনবাঈ বনবীরের কৌশল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে সব কথা জানিয়ে ছিলেনও। কিন্তু বিক্রমাজিৎ-এর কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না। সব ক্ষমতা ছিল বনবীরের হাতে। সে ছিল নামে মাত্র রাণা। চিতোরের সমস্ত ফৌজ, সমস্ত সর্দারেরা, এবং সমস্ত সেনাপতিরা বনবীর কে ভয় করে চলতো। এবং মোটামুটি ভাবে তার হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল। চিতোরে সামনে যুদ্ধ। অথচ তার কোন প্রস্তুতি নেই দেখে সকলেই অবাক হলো। তারা মহারাণা সংগ্রাম সিংহের কথা ভাবলো। তিনি থাকতে এ সব যুদ্ধের প্রস্তুতি কি ভাবে চলতো। বিক্রমাজিৎ সিংহ সবই শুনছে। সবই বুঝছে। কিন্তু সে উপায়হীন। তাব হাত-পা বাঁধা।

এর পরেও নতুন খবর এলো যে মালদেব, রাও গঙ্গাকে হত্যা করে মারওয়াড়ের রাজা হয়ে বসেছে এবং সৈন্য নিয়ে মেড়তা রাজ্য আক্রমণ করেছে এবং সব শেষে দখল।

এ সংবাদে অবশ্য বিক্রমাজিৎ সিংহ খুশি। মীরাবাঈ মেড়তা কন্যা। তার পিতার রাজ্য হাত ছাড়া হয়ে গেছে, সুতরাং বিক্রমাজিৎ সিংহ খুশি না হযে পারে না। সে মীরাবাঈকে দেখতে পারে না। মীরাবাঈ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মীরাবাঈকে শাস্তি দেবার জন্যে নানা ভাবে ফন্দী-ফিকির খুঁজছে। তার ধারণা হলো মেড়তা যেহেতু মীরার পিতার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাহলে এবারে মীরাকে শাস্তি দিতে কোন প্রকার অসুবিধা হবে না। এমন কি চিতোর থেকে বিতাড়িত করাও সম্ভব হতে পারে। অবশ্য তার খুশি হবার পেছনে অন্য একটি কারণও ছিল। সে ভেবেছিল, এবারে মালদেব তার পেছনে এসে দাঁড়াবে। গুজরাটের বাহাদুর শাহের যুদ্ধে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। সুতরাং চিতোর নিরাপদে আনবার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু সময়ে সেটা হয়নি। বাহাদুর শাহ যখন চিতোর আক্রমণ করলো মালদেব সৈন্য পাঠালো দেরী করে। মালদেবের গোপন ইচ্ছার সঙ্গে বনবীরের ইচ্ছার অনেক মিল। বনবীরের মত মালদেব চায় যে চিতোর দুর্বল হয়ে যাক। অবশ্য সেই সময়ে বনবীরের ইচ্ছা থাকলেও সমস্ত রাজপুত রাণাদের একত্রিত করে কাজে লাগাতে পারতো না। সে ক্ষমতাও তার ছিল না। রাজপুত রাণাদের কিছু অংশ তাকে ভাল ভাবেই চিনতো। জানতো। কারণ বনবীরের কুশাসনের ফলে তখন মেবারের শাসন

ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার মতো। বনবীরের বিরুদ্ধে চারিদিক থেকে অভিযোগ। অভিযোগ অযোগ্যতার এবং অত্যাধিক দুর্নীতির। বনবীরও বুঝতে পেরেছিল যে তারও সময় ফুরিয়ে আছে। সে তখন বেপরোয়া। সে যুদ্ধ-প্রস্তুতির একটা ভান করতে লাগলো। আসলে কিছুই নয়। গুজরাটের বাহাদুর শাহ মেবার আক্রমণ করা সত্ত্বেও মেবার বেঁচে গেল। গোয়া এবং পর্তুগীজরা হঠাৎ গুজরাট আক্রমণ করে বসলো। বাহাদুর শাহ তখন উপায়হীন। সে তড়িতে সৈন্য নিয়ে নিজের রাজ্য ঠেকাতে গেল। মেবার সেবারের মত রক্ষা পেল।

আজকে মীরা তার নিজের মন্দিরের গবাক্ষে বসে এই সব কথা ভাবছে বটে কিন্তু সেইদিন মীরা রাজ্যের রাজনীতি থেকে অনেক দূরে ছিল। তবু রাজ্যের রাজনীতি আর যুদ্ধের সব খবরই তার কাছে আসতো। বিক্রমাজিৎ-এর রাজত্বকালে মীরাবাঈ-এর সমস্ত স্বপ্নই ভেঙ্গে গিয়েছিল। তামাম হিন্দুস্থান একটি রাজ্য করে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন ভোজরাজ, মহারাণা সংগ্রাম সিংহ এবং সে নিজে দেখেছিল, বিক্রমাজিৎ এর আমলে এসে তার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সেদিন চিতোরে স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা, পারস্পরিক আত্মকলহ ও কোন্দলে ভরে উঠেছিল। কে রাণা হবে, কে রাজত্ব করবে, কে প্রতাপ-প্রভাবশালী হবে, সেই নিয়েই সকলে ব্যস্ত ছিল। এবং সেই সময় এই দুর্বলতা ও আত্মকলহের সুযোগ নিয়েছিল বাইরের রাষ্ট্র। তারা চিতোরে বার বার আক্রমণ চালিয়ে রাজ্যটিকে শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন কে বুঝবে। মীরাবাঈ সেদিন কা'কে এ কথা বোঝাবে। কা'কে শোনাবে। কে কার কথা শুনবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কাজে নামবে, এমন লোক সেদিন চিতোরে ছিল না। মীরাবাঈ সব বুঝেও সেদিন উপায়হীন হয়ে পড়েছিল। সে জানে এবং এখনও বিশ্বাস করে যে তার স্বামী ভোজরাজ বেঁচে থাকলে চিতোরের এই অবস্থা হ'তো না। সে একদিকে যেমন ছিল বীর যোদ্ধা এবং অপর দিকে ছিল তেমনই স্বপণ্ডিত এবং সুচিন্তিত ব্যক্তি। ধর্মের গোঁড়ামি অথবা অহেতুক কোন সংস্কারে তার মন আবদ্ধ ছিল না। রাজ্যের রাজনীতি থেকে শুরু করে সংগীত, শিল্প, সাহিত্য এবং ধর্মকে সে সমান চোখে দেখতো। তা' না হলে চিতোরের রাণারা শক্তির উপাসক হওয়া সত্ত্বেও, কালিকা দেবীর পূজারী হওয়া সত্ত্বেও, তার পক্ষে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। আর তার সঙ্গে যুক্ত ছিল মহারাণা সংগ্রাম সিংহের পরিপূর্ণ সহযোগীতা। পিতা-পুত্রের মানসিক গড়নের মিল ছিল আশ্চর্য রকমের। কিন্তু সে সব পুরোনো ইতিহাস। মীরাবাঈ-এর মনে হয়েছিল যে আজ তার পাশে দাঁড়াবার মতো অথবা তার মন বোঝবার মতো একটা মানুষও চিতোরে আর নেই। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, মীরাবাঈ তার বড় ভাই-এর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, বিক্রমাজিৎ সিংহ শুধুমাত্র মীরাবাঈ-এর সঙ্গে বিরোধিতা করেই নিশ্চিন্ত হয়নি। তাকে চিতোর থেকে তাড়িয়ে দেবার পরিকল্পনাও তৈরী করেছিল। আর এ ব্যাপারে সহযোগীতা করেছিল বনবীর। বিক্রমাজিৎ সিংহ অনেক আগেই মীরাবাঈ-কে ভয়ানক ভাবে একটা শাস্তি দিয়ে বসতো। এবং বনবীরের ইচ্ছাও সেইরকমই ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ ও প্রজাদের প্রতি মীরাবাঈ-এর প্রভাবের কথা চিন্তা করে

সোজাসুজি এগুতে সাহস করেনি। গোপন ফন্দী আঁটতে হয়েছিল। গোপন কিছু করবার কথা ভাবতে হয়েছিল। যা'তে সাধারণ প্রজাদের চোখে এসে না পড়ে। সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করে না বসে। একেই তো আত্মদ্বন্দ্বে চিতোর তখন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার উপর যদি সাধারণ প্রজারা ক্ষেপে ওঠে, তবে রাজ্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। বিক্রমাজিৎ সিংহ এটা ভাল ভাবেই বুঝেছিল। সেইজন্যেই তাকে অন্যপথ ধরতে হয়েছিল। এবং সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে তার একটা সুযোগ এসেও গিয়েছিল।

মীরাবাঈ মেড়তা কন্যা। বিক্রমাজিৎ এর আমলে মালদেব মেড়তা রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিল। মীরাবাঈ-এর জ্যেঠামশাই ও তাঁর পুত্র জয়মালের কোন খোঁজ ছিল না। তবে মীরাবাঈ খবর পেয়েছিল যে তার জ্যেঠামশাই বীরম দেবজী ও তার পুত্র জয়মল গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করে নিজের বাজ্য ফিরে পাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। জয়মল মীরাবাঈ-এর সম্পর্কে ভাই হলেও আপন ভাইয়ের মতই। তাদের দাদু দাদা দু'জনকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং নিজে হাতে মানুষ করেছিলেন। মীরাবাঈ সে কথা কোনদিন ভুলে যাবে না। সেই কারণে সেই সময় মীরাবাঈ জয়মল ও বীরসম দেবজীকে খোঁজ করা শুরু করেছিল। বনবীর গোপনে সে সংবাদ এনে বিক্রমাজিৎ এর কাছে পেশ করেছিল। বলেছিল, মেড়তা উদ্ধারের গোপন ষড়যন্ত্রের মধ্যে মীরাবাঈ জড়িত। মীরাবাঈ গোপনে বীরমদেবজী ও জয়মলকে মেড়তা উদ্ধারে সাহায্য করছে। হয়তো চিতোরের সাধারণ প্রজাদের এ কাজে লাগিয়ে দিতে পারে। মীরাবাঈ চিতোরের রাজনীতি ভালই বোঝে, সুতরাং এখন থেকে সাবধান না হলে গৃহযুদ্ধ বাধবার আশঙ্কা আছে। কথাটা সেদিন বিক্রমাজিৎ-এর মনে ধরেছিল। তার মনে হয়েছিল, মীরবাঈ কে সাবধান করা দরকার। মীরাবাঈ কে এখনই রাজপ্রাসাদে নজরবন্দী করে না ফেলতে পারলে, এটা একটা দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকবে। সুতরাং বিক্রমাজিৎ সিংহ আর দেরী না করে মীরাবাঈ-কে নজরে রাখবার জন্যে চম্পা ও চামেলীকে নিয়োগ করলো। চম্পা ও চামেলীর কাজ হলো, মীরাবাঈ-সম্পর্কে গোপনে সংবাদ সরবরাহ করা। তার মন ফেরাবার চেষ্টা করা। এবং সম্ভব হলে তাকে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

সেদিন চম্পা ও চামেলী কাজে লেগে গিয়েছিল। তারা নানা ভাবে মীরাবাঈ-কে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। রাজপ্রাসাদে ফেরাতে চেয়েছিল। এবং গিরিধারীলালের পুজো ছেড়ে রাজমহিষীর মত রাজপ্রাসাদে বিলাস-ব্যাসনে ডুবে থাকবার প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু আজও মনে আছে, মীরাবাঈ সেদিন সেই একই কথা বলেছিল। মীরাবাঈ সেদিন বলেছিল : আমার অন্তরের কথা আমি বলছি। তোমরা মন দিয়ে শোন। বিশ্বাস করো। আমি কারো বারণ মানবো না। মানতে পারি না। আমি সাধু-সঙ্গে বাস করে গিরিধারীলালের সেবা করতে চাই। হরি-সুখ লাভ করতে চাই। আমি জগতের লোকজন থেকে দূরে থাকতে চাই। আমার ধন-সম্পত্তি ও শরীর সব যাক। আমার মাথা কেটে নিলেও আমি আমার সাধনা থেকে দূরে সরে যেতে পারবো না। আমার মন এখন গিরিধারীলালের ধ্যানে রত। আমি সকলের নিন্দা

হাসি মুখে সহ্য করবো এবং সদা সৎ-গুরুর আশ্রয়ে থাকবো। তোমরা আমার কাছে এসেছো। সুতরাং আমার একট গান শোনো। সেদিন মীরাবাঈ তাদের শুনিয়েছিল :

"রবজি মৈঁ কাহু কী নাহিঁ রহুঁ।
সুনোরী সখী তুম চেতন হোই কে, মনকী বাত কুহুঁ॥
সাধ-সংগতি করি, হরি সুখ লেউঁ, জগ সুঁ মৈঁ দূরি রহুঁ।
তন-ধন মেরো সবহী জাবো, ভল মেরো সীস লহুঁ।
মন মেরো লগো সুমিরণ সেতী, সবকো মেঁ বোল সহুঁ॥
মীরা কহে প্রভু গিরিধর নাগর, সতগুরু সরণ রহুঁ॥"

মীরাবাঈ-এর গান শুনে চম্পা-চামেলী সেদিন বলেছিল: কিন্তু রাণা এ কথা শুনলে রাগ করবেন।

মীরাবাঈ জবাব দিয়েছিল: রাণা রুষ্ট হয়ে আমাকে কি করবেন। কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু যদি হরি আমার ওপর রুষ্ট হন, তাহলে আমার গতি কী হবে? আমি শুকিয়ে যাব। আমার অন্তর শুকিয়ে যাবে।

"সিসোদ্যা রুঠ্যো তো ম্হাঁরো কাঁঈ করলেসী
হরি রুঠ্যাঁ কুমহলাস্যা হোমাহি।"

চম্পা ও চামেলী মীরাবাঈ-এর গান শুনে অবাক। তাদের ধারণা রাণাকে ভয় করে না, এমন মানুষ চিতোরে আছে নাকি। তবুও তারা মীরাবাঈ-কে ফেরাবার অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষে পরিপূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়ে, মীরাবাঈ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। এবং গিরিধারীলালের নিত্য সেবার কাজে লেগে গিয়েছিল। মীরাবাঈ এর কাছে ওরা দু'জনেই সেদিন সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয়েছিল।

ওরা পরাজিত, এ খবর বিক্রমাজিৎ-এর কাছে আসতেই, বিক্রমাজিৎ সিংহ সেদিন আরও ক্রুদ্ধ হয়েছিল। বলেছিল: ওরা অপদার্থ। আরও যোগ্য লোক দরকার। সে আবার নতুন করে পথ খুঁজতে শুরু করেছিল।

সেদিন আকস্মিক ভাবে খবর এসেছিল যে, বীরমদেবজী ও জয়মল মালদেবের কাছ থেকে মেড়তা কেড়ে নিয়েছে।

সেদিন বনবীর এই খবর নিয়ে আসতে বিক্রমাজিৎ সিংহের মনে হয়েছিল, মীরাবাঈ চিতোরে বসে ভয়ানক ভাবে রাজনীতি করছে। ওদের মেড়তা অধিকারে সাহায্য করেছে। অন্য রাজ্যের সহযোগীতার সুযোগ সে করে দিয়েছে। তা' না হলে ওরা মেড়তা আবার কেড়ে নিল কি করে? চম্পা ও চামেলীর সহযোগীতা হারিয়ে, সেদিন বিক্রমাজিৎ সিংহ বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। অবশেষে অনেক ভেবে, সে নিজের বোন উদাবাঈ-কে মীরাবাঈ-এর গোপন সংবাদে নিয়োগ করেছিল। কিন্তু কারমেতনবাঈ-এর এ কাজ পছন্দ ছিল না। তিনি জানতেন যে এ কাজ বনবীরের। এ পরিকল্পনা বনবীরের। বনবীর বিক্রমাজিৎ সিংহকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিয়ে, তাকে রাজ্যের সকল মানুষের সহানুভূতির বাইরে আনতে চায়। তাহলে অন্যান্য রাজপুত রাজারাও বিক্রমাজিৎ-এর বিপক্ষে চলে যাবে।

চিতোর দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু বিক্রমাজিৎ সিংহ সেদিন তার মায়ের কথা শোনেনি। তার ধারণা ছিল, মীরাবাঈ চিতোরে বসে রাজনীতি করছে। তাকে রাণার পদ থেকে সরাবার চেষ্টা করছে। তার মাথায় এ চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিল বনবীর। বিক্রমাজিৎ সিংহ সেদিন সেই চিন্তাতেই বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। এবং সেই কারণেই সে তার বোন উদাবাঈ-কে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল। সেই সঙ্গে বনবীর ও যোগ দিয়েছিল। বনবীর সেদিন উদাবাঈ-কে বলেছিল ঃ মীরাবাঈ-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। মীরাবাঈ এর কার্য-কলাপ, চলা-ফেরা আর যাদের সঙ্গে সে দেখা-সাক্ষাৎ করবে, তাদের ওপর নজর রাখবে। তাদের খবরা-খবর এনে আমাকে জানাবে। আর মীরাবাঈ যাতে আমার পরামর্শ মতো চলে সেটাও চেষ্টা করবে। আমার পরামর্শ মতো চললে, চিতোরে তার কোন বিপদ হবে না, এ কথাও তাকে জানাবে। মীরাবাঈ পরে অবশ্য এ সব কথা উদাবাঈ-এর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল।

উদাবাঈ কে মীরার মন্দিরে নিয়োগ করা হল। উদাবাঈ ও উৎসাহের সঙ্গে কাজে লাগলো। সে প্রতিদিন মীরাবাঈ-এর কাছে বসে গান শুনতে লাগলো। পুজো দেখতে লাগলো। যে সব সাধু-সন্ত-রা আসে, তাদের উদ্দেশ্য জানবার চেষ্টা করতে লাগলো। মীরাবাঈ-এর এ সব দিকে কোন মন নেই। সে উদাবাঈকে সহজ ভাবেই নিয়েছিল। উদাবাঈ বেশ কিছুদিন মীরার কাছে ঘোরাঘুরি করবার পর একদিন তাকে বলেছিল ঃ তোমার বর্তমান আচরণে শহরে নিন্দা রটছে। অনেকে রাজকুলের ওপর কলঙ্ক আরোপ করছে। তুমি রাজকুলবধূ। তুমি তোমার মর্যাদা অনুসারে আচার-ব্যবহার কর এবং সাধু সন্ত-দের ত্যাগ কর।

মীরাবাঈ সেদিন বলেছিল ঃ তুমি সত্যি কথাই বলেছ। সাধুরাই আমার পিতা-মাতা। সাধুরাই আমার কুল। আমার স্বজন। সাধ গণই আমাকে স্নেহ করেন। সাধুগণই জ্ঞানী। আমি দিনরাত সাধুদের চরণ স্মরণ করেই থাকবো। তুমি যাও, রাণাকে বুঝিয়ে বলো। আমি তার কথা শুনবো না। মানবো না। আমার প্রভু গিরিধারী। গিরিধারীর সেবার জন্যে আমি নিজেকে সাধুদের হাতেই সমর্পণ করেছি। তুমি বোসো। আমায় একটা গান শোনো। সেদিন মীরাবাঈ উদাবাঈ-কে শুনিয়েছিল ঃ

"সাধু মাতা-পিতা কুলে মোর, সজন সহেনী জ্ঞানী।
সন্ত্ চরণ কী সরণ রৈণ দিন, সত্ত কহত হূঁ বাণী॥
রাণাকো সমঝাবো জা বো, মৈঁতো বাত্ ন মানী।
মীরা কে প্রভু গিরধর নাগর, সান্তোঁ হাথ বিকালী॥"

মীরাবাঈ এর চোখে জল। এমন ভক্তি উদাবাঈ আগে কখনও দেখেনি। সে অসুবিধায় পড়ে যেতে লাগলো। ওদিকে রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ ও বনবীর মীরাবাঈ-এর খবরের জন্যে চাপ দিতে লাগলো। কিন্তু উদাবাঈ-এর কাছে কোন খবর নেই। উদাবাঈ নিজেও আগে মীরাবাঈ-কে পছন্দ করতো না। কিন্তু এখন যাতায়াতের ফলে তার মত পালটেছে। সে এখন মীরাবাঈ-কে অপছন্দ তো করেই

না, বরং পছন্দই করে। সে এখন ভালই বোঝে যে মীরাবাঈ, এ রাজ্যের রাজনীতিতে মাথা দিচ্ছে না। রাজ্যের ভাল-মন্দ সম্পর্কেও সে আজ উদাসীন। মীরাকে যে ভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে, তায় পেছনে কোন সত্য নেই। উদাবাঈ এখন সেটা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে যে মীরাবাঈ তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে নিয়োগ করেছে গিরিধারীলালের সেবায়। তাকে নিয়েই সে সারাদিন ব্যস্ত। কিন্তু এ কথা রাণা অথবা বনবীর কে বোঝানো যাবে না। তারা ভাববে উদাবাঈ মীরাবাঈ-এর কাছে পরাজিত। যেমন পরাজিত হয়েছিল চম্পা ও চামেলী। চম্পা আর চামেলী তখন পরিপূর্ণ ভাবে মীরাবাঈ-এর শিষ্যা এবং গিরিধারীলালের সেবায় নিয়োজিত। উদাবাঈ নিজেও সেদিন বুঝেছিল যে, সে ধীরে ধীরে মীরাবাঈ-এর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠছে। কারণ মীরাবাঈ নিরপরাধী। তার কোন দোষ নেই।

মীরাবাঈ পরে শুনেছিল যে রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ ও বনবীর উদাবাঈ-এর কাছ থেকে মীরাবাঈ সম্পর্কে উপযুক্ত জবাব না পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা সেদিন ভেবেছিল যে যাকেই মীরাবাঈ-এর কাছে পাঠানো হয়, তারাই মীরাবাঈ-এর ভক্ত হয়ে পড়ে। মীরা কী মায়াবিনী? না কুহকিনী? না তান্ত্রিক সাধিকা?

এ কথাগুলো মনে পড়লে, মীরাবাঈ-এর আজও অবাক লাগে। একজন শুদ্ধ-সাধিকার কত বিপদ। কত বাধা। যার ফলে মীরাবাঈ-কে শেষে শ্রীবৃন্দাবনে চলে আসতে হয়েছে। মীরাবাঈ উদাবাঈ-এর এই মানসিক দ্বন্দ্বের কথা বুঝতে পেরে একদিন বিকেলে তাকে ডেকে বলেছিল ঃ আমার পাশে এসে বোসো উদাবাঈ। আমি তোমাকে নিয়ে একটা গান লিখেছি। শোনো।

উদাবাঈ বিস্মিত হয়ে বলেছিল ঃ আমাকে নিয়ে গান?

ঃ হ্যাঁ, শোনো। মীরাবাঈ সেদিন উদাবাঈ-কে শুনিয়েছিল ঃ

"থানে বরজ বরজ মেঁহারী।
ভাভী, মানো বাত হমারী॥
রাণে রোস কিয়ো, থাঁ উপর
সাধোঁ মেঁ মতজারী॥

রতন জড়িত পাহিরো আভুষণ
ভোগো ভোগ অপারী॥
মীরাজী যে চলো মহল মেঁ
থাঁনে সোগন ক্ষারী॥

রাণা নে সমঝাও জাও
ম্যাঁয় তো বাতন মানী।
মীরা কে প্রভু গিরধর নাগর
সন্তাঁ হাথ বিকানী॥

উদাবাঈ মন সমঝ
যাও আপনে ধাম।
রাজপাট্ ভোগো তক্ষ্ণী
হমে ন তাঁসু কাম॥

গান শেষ করে মীরাবাঈ বলেছিল : তুমি আমার মনের কথা বুঝে নাও উদাবাঈ। তুমি মহলে ফিরে যাও। তুমি রাজপ্রাসাদের বিলাস-বৈভব ভোগ কর। আমার ও সবে কোন প্রয়োজন নেই।

উদাবাঈ সেদিন সে কথার কোন জবাব দিতে পারেনি। সে মাথা নীচু করে বসেছিল।

॥ তেরো ॥

বেশ কিছুদিন পরে রানা বিক্রমাজিৎ সিংহ ও বনবীর বুঝে নিয়েছিল যে উদাবাঈকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। তখন তারা আবার আলোচনায় বসেছিল। বনবীর বলেছিল : ওদের দিয়ে কোন কাজ হবে না। এবারে সোজাসুজি কাজে নামতে হবে।

রানা বিক্রমাজিৎ সিংহ বিস্ময়ে চোখ তুলে বলেছিল : কেমন ?

: বিষ। এবারে বিষ প্রয়োগে হত্যা।

একথা শুনে বিক্রমাজিৎ সিংহ অবাক হয়েছিল কিনা মীরাবাঈ জানে না। তবে পরে সে শুনেছিল যে, রানা বিক্রমাজিৎ সিংহ আপত্তি জানিয়েছিল। সে নাকি বলেছিল : না, না তা হয় না। হয়তো বড় ভাইয়ের স্ত্রী বলেই বিক্রমাজিৎ সিংহ এ-কাজে অমত করেছিল। কিন্তু বনবীর ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলেছিল : কেন হয় না। একজন মহিলার এত তেজ। প্রজারা কী ভাবছে ?

রানা বলেছিল : কিন্তু বিষ প্রয়োগে হত্যা করলে প্রজারা ক্ষেপে যাবে। তারা এ অবিচার সহ্য করবে না। আবার নতুন করে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে পারে।

: মীরা জয়মলের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করছে।

: কারণ ?

: কারণ অজানা। তবে কিছু একটা মতলব আছে। একথা আমি হলপ করে বলতে পারি। আমি শুনেছি সে নাকি কুম্ভল গড়ে লোক পাঠিয়ে উদয় সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছে।

: উদ্দেশ্য ?

: উদ্দেশ্য আমার জানা নেই। তবে মনে হয় সে বর্তমান রাণাকে সরিয়ে উদয় সিংহকে রাণা করবার চেষ্টা করছে। সাথে জয়মলকে চাইছে। এবং অন্য রাজ্যের রাণাদের। উদয় সিংহকে মীরাবাঈ কোলে করে মানুষ করেছে। তার ওপর মীরার একটা অপত্য স্নেহ থাকা স্বাভাবিক। অন্য রাজ্যের সহযোগিতায় উদয়কে ফিরিয়ে

আনার চেষ্টা অস্বাভাবিক কিছু নয়। উদয় সিংহ বর্তমান রাণার ভয়ে কুম্ভলগড়ে পালিয়ে থাকলেও, চিতোরের রাণা হবার আশা ত্যাগ করেনি। আমি যতদূর জানি উদয় নিজেও রাণা হবার চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্য রাজ্যের সহযোগিতা পাবার আশা করছে। বর্তমান রাণার মা কারমেতনবাঈ-এর ছোট ছেলে উদয়। তার ওপর মায়ের বেশী স্নেহ থাকা স্বাভাবিক। প্রয়োজনে, বর্তমান রাণার মা-ও মীরার সঙ্গে হাত মিলিয়ে উদয়ের পক্ষে চলে যেতে পারে। কারণ বর্তমান রাণার মা কারমেতনবাঈ এখন মীরাকে তেমন অপছন্দ করেন না। বরং নানাভাবে সাহায্যই করেন।

রাণা ঃ তাহলে ?

বনবীর ঃ তাহলে আমি আগেই বলেছি বিষ। বিষ প্রয়োগে হত্যা। কারণ আমার মনে হয়, এরা সকলে একজোট হলে রাণার রাজত্ব করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। সুতরাং কাঁটা আগেই সরিয়ে ফেলা দরকার।

রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ সেদিন অনেক চিন্তার পর বনবীরের কথায় সায় দিয়েছিল। মীরাবাঈ-কে বিষ প্রয়োগে রাজি হয়ে গিয়েছিল। সেদিন বনবীর একটু হেসে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল চালটা ভালই চালা হয়েছে। কারমেতনবাঈ বনবীরকে একেবারেই দেখতে পারেন না। এ-কথা সে জানে। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে রাণার কাছে লাগিয়ে তার মন ভেঙ্গে দেবার একটা চেষ্টা চালালো। উদয় সিংহ বিক্রমাজিৎ-এর ভয়ে কুম্ভলগড়ে পালিয়ে। তার পক্ষে ষড়যন্ত্র করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বনবীর সেটা জানে। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই সেদিন সে কথাটা রাণার কানে লাগিয়ে দিয়েছিল। আবার এদিকে মীরাবাঈ যে জয়মলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে, এটাও মিথ্যা নয়। মীরা তখন সত্যিই জয়মলের সঙ্গে একটা যোগাযোগের চেষ্টা করছিল, মেড়তায় ফিরে যাবার জন্যে। এখানে তার আর ভাল লাগছিল না। এখানে তার কি আছে ? কে আছে ? মহারাণা সংগ্রামসিংহ, ভোজরাজ কেউ নেই। রাজমাতা ঝালীও গত। সুতরাং এই বেড়াজাল থেকে সেদিন মীরাবাঈ নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। চিতোরের প্রতি তার টান তখন কমে গিয়েছিল। সে তখন নির্জনে, নিভৃতে, আপন মনে গিরিধারীলালের সেবায় দিন কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু তখন চিতোরে সেটা সম্ভব হচ্ছিলো না। সেখানে সাধনায় প্রতিপদে বাধা আসছিল। রাজমহলের প্রত্যেকে তাকে সন্দেহের চোখে দেখছিল। মীরা তখন চিতোরে পড়েছিল, একমাত্র সাধারণ মানুষ আর অনুগত প্রজাদের জন্যে। ওরা মীরাবাঈকে ভালবাসতো। আপনজন বলে মনে করতো। মীরাবাঈ জানতো যে সে চিতোর ছেড়ে চলে গেলে, তাদের দেখবার আর কেউ থাকবে না। আর এইসব সাধু-সন্ত। এদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছিল মীরার। এইসব নানা কারণে তখন মীরাবাঈ-এর চিতোর ত্যাগ সম্ভব হয়নি। কিন্তু মন তখন বারবার বলেছিল যে এবারে যেতে হবে। ডাক আসছে। এবং পরে সত্যিই তার ডাক এসেছিল। তাই তার শ্রীবৃন্দাবনে আসা সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য মেড়তা ঘুরে।

সেদিন মীরাবাঈ অনেক চিন্তা করে দেখেছিল যে বনবীর মিথ্যা কিছু বলেনি।

কারণ সে সত্যিই তখন জয়মলের সঙ্গে যোগাগের চেষ্টা করছিল। কিন্তু বনবীরের কড়া পাহারার জন্যে সেটা সম্ভব হচ্ছিলো না।

যাইহোক মোটামুটি সত্য মিথ্যা মিলিয়ে বণবীর রাণাকে ভালই বুঝিয়ে দিয়েছিল এবং মীরাবাঈ-কে বিষ প্রয়োগে হত্যার হুকুম আদায় করে নিয়েছিল। মীরাবাঈ যথাসময়ে জানতে পারলো যে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যার হুকুম হয়েছে।

আজকের এই বিষণ্ন-বিকেলে শ্রীবৃন্দাবনের আশ্রমের এক নির্জন জানালায় বসে মীরাবাঈ এর সে কথা মনে পড়তে, তার দু' চোখ দিয়ে জলের ধারা নামলো। বিক্রমাজিৎ সিংহ এবং বনবীর তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিল। পারেনি এ-কথা সত্য। কিন্তু সেদিন তার অপরাধ কী ছিল? সে চেয়েছিল গিরিধারীলালের সেবা করতে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে এবং চিতোরের জনগণকে সেবা করতে। কিন্তু স্বার্থ-সন্ধানি রাণারা তার এই মহৎ উদ্দেশ্যের পেছনে রাজনীতির গন্ধ পেয়েছিল। ভেবেছিল মীরাবাঈ-এর এই সমস্ত মহৎ কর্মের পেছনে স্বার্থ লুকানো আছে। সে চিতোরে বসে নিজের প্রচারের চেষ্টা চালাচ্ছে। এবং আরও অনেক কিছু। তাই তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা।

যেদিন মীরাবাঈ-এর কাছে এই খবরটা এসেছিল, সেদিন মীরাবাঈ কিছু মাত্র বিস্মিত হয়নি। তাকে সরাবার যে একটা চেষ্টা চলছে, সেটা সে আগে শুনেছিল। যাইহোক মীরাবাঈ নির্দিষ্ট দিনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। বিষ এলে সে কি করবে, তখনও সে কিছু ঠিক করতে পারে নি। তবে বনবীরের এই পরিকল্পনার খবর মীরাবাঈ-এর কাছে লোক মারফৎ চলে আসতো। এবং বনবীরের সমস্ত পরিকল্পনাই তার নজরে থাকতো। মীরাবাই জেনেছিল যে বনবীর তার পরিকল্পনাটাকে নানা ভাবে সাজিয়ে দেখছে, কোনটা লাগাসই হবে। কোন পথ ধরলে দুর্নামের ভাগীদার কম হতে হবে। বনবীর আগেই বুঝে নিয়েছিল যে চিতোরের প্রজারা এবং সাধারণ মানুষ যদি এ-কথা জানতে পারে, তবে তার বিপদ অনিবার্য। আবার সুন্দর ভাবে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করলে মীরাবাঈ-কে বিষ প্রয়োগে হত্যার পর বিক্রমাজিৎ সিংহ-কে সকল রাজ্যের রানাদের সামনে অপদস্ত করা যেতে পারে। এবং তাদের সহযোগিতা নষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং মাথা ঠান্ডা করে একটা সুন্দর পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। বণবীর চিন্তা করতে লাগলো। তার এই সমস্ত খবর লোক মারফৎ মীরাবাঈ-এর কাছে আসতে লাগলো। মীরাবাঈ পরিকল্পনা অনুসারে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলো।

সেদিন চিতোরে মীরাবাঈ-এর বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র, এত জাল-বিস্তার, অথচ মীরাবাঈ সব জেনেও নির্বিকার। তার নিজের সাধনায় সে মগ্ন। কারণ মীরাবাঈ জানতো যে তার সাধনাই তাকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করবে। তাকে একটা পরিচ্ছন্ন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়ে দেবে। তার গিরিধারীলালের সেবা ব্যর্থ হবে না। তিনিই রক্ষা কর্তা। সুতরাং মীরাবাঈ-কে তিনিই রক্ষা করবেন। এটা মীরাবাঈ-এর বিশ্বাস। মীরাবাঈ ইদানীং গভীর রাত পর্যন্ত গিরিধারীলালের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে এবং সংগীতের মাধ্যমে পুজো সমাপন করে। একদিন গভীর রাতে মীরাবাঈ

উদাবাঈকে এমন একখানা গান শোনালো যে উদাবাঈ সেই গান শুনেই মীরাবাঈ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো এবং গিরিধারীলালের নিত্য-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলো।

মীরাবাঈ এর আজও মনে আছে যে সেদিন সে উদাবাঈকে-শুনিয়েছিল ঃ

"জব সে মোঁহি নন্দ নন্দন দৃষ্টি পড়্যো মাঈ।
তব সে পরলোক লোক কছুনা সোহাঈ ॥
মোরণ কী চন্দ্র-কলা সীম মুকুট সোহৈ।
কেসর কো তিলক ভাল তীন লোক মোহৈ ॥
কুন্তলকী অলক ঝলক পোলন পর ছাঈ।
মণো মীন সরবর তজি মকর মিলন আঈ ॥
কুটিল ভ্রুকুটি তিলক ভাল চিতবণ মে' টৌনা।
খঞ্জন অরু মধুপ মীন ভুলে মৃগ ছৌনা ॥
সুন্দব অতি নাসিকা সুগ্রীব তীন রেখা।
নটবর প্রভু ভেষ ধরে রূপ অতি বিসেষা ॥
অধর বিম্ব অরুণ নেন মধুর মন্দ হাঁসী।
দসন দমক দাড়িমদুতি চমকে চপলা সী ॥
ছুদ্র ঘণ্ট কিংকিনী অনূপ ধুনি সোহাঈ।
গিরধর অঙ্গ অঙ্গ মীবা বলি জাঈ ॥"

মীরাবাঈ এর গান শুনে উদাবাঈ মুগ্ধ। সে মীরাবাঈ-কে প্রণাম করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। এবং সেই রাত থেকে নিজেকে গিরিধারীলালের সেবায় নিয়োজিত করেছিল। ফলে রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ ও বনবীর উদাবাঈকে চিরদিনের মত হারিয়েছিল। আগে তারা হারিয়েছে চম্পা ও চমেলীকে।

মীরাবাঈ খবর পেল যে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যার পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। পরিকল্পনা মুখ্যত বনবীরের। মীরার কাছে বিষ নিয়ে আসবে দয়ারাম পাণ্ডে। গিরিধারীর চরণামৃত বলে তার হাতে তুলে দেবে। বণবীর অনেক টাকা দিয়ে দয়ারামকে এ-কাজে নিযুক্ত করেছে। রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ নেপথ্যে সরে গিয়েছিল। সে দেখাতে চেয়েছিল যে, সে এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না। এদিকে বণবীর গোপনে এ কাজ করে বিক্রমাজিৎ সিংহের উপর দায়িত্ব চাপাবে বলে স্থির করে রেখেছিল। দেখাতে চেয়েছিল, বিক্রমাজিৎ সিংহ কত বড় অপদার্থ।

নির্দিষ্ট দিনে দয়ারাম পাণ্ডে বিষ নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল। মীরাবাঈ তার মন্দিরে অপেক্ষামান। বিষ আসবে। গিরিধারীলালের চরণামৃত বলে তাকে দেওয়া হবে।

আজকে শ্রীবৃন্দাবনের মন্দিরে বসে মীরাবাঈ-এর দুচোখ ভরে কান্না নামলো। চিতোরে কেউ তাকে চায় নি। এক তার স্বামী ভোজরাজ ও শ্বশুর মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ছাড়া। অথচ সে চিতোরে সবাইকে নিয়েই থাকতে চেয়েছিল। মহারাণী হবার তার কোন বাসনা ছিল না। সে চেয়েছিল খুবই সামান্য অধিকার। যা' অন্যান্য

রাজমহিষুদের তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু চিতোরের রাণা-মহারাণারা তা দিতে অস্বীকৃত। তারা একলিঙ্গেশ্বরের পূজারী। অতএব তাকেও ঐ পূজায় নিয়োজিত করবার অবিরাম চেষ্টা চালিয়েছিল। মীরাবাঈ অস্বীকার করায়, তাকে গোপনে এই হত্যার ষড়যন্ত্র। গিরিধারীলালের চরণামৃত বলে বিষ পাঠানো। তারা মীরাবাঈকে শেষবারের মত এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। পথের কাঁটা সরাতে চায়। আজকে শ্রীবৃন্দাবনে বসে মীরাবাঈ তার চিতোর-জীবনের এক টুকরো কালিমাখা ছেঁড়াপাতার কথা স্মরণ করে কান্নায় ভাসিয়ে দিতে লাগলো।

সেদিনও চিতোরের মন্দিরে বসে মীরাবাঈ-এর মনে হয়েছিল তাকে কেউ চায় না। কেউ চায় না। তার দু'চোখ বেয়ে শ্রাবণের বর্ষা নেমেছিল। সেদিন পাশে বসেছিল চম্পা, চামেলী আর উদাবাঈ! মীরাবাঈ গিরিধারীলালের পূজা শেষে চোখের জলে তাকে আবেদন জানিয়ে বলেছিল: যে বস্তু ভগবানের চরণামৃত বলে আমার কাছে আসছে, তাকে ত্যাগ করা ভক্তির বিরুদ্ধ রীতি। হে প্রিয়, তুমি আমার নয়নের সামনে এসে দাঁড়াও। আমি ভব-সাগরে ভেসে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি এসে খবর নাও। রাণা আমাকে বিষ পাঠাচ্ছেন। তুমি সেই বিষকে অমৃত করে দাও। হে মীরাপতি গিরি-ধারী নাগর, তুমি আমার সঙ্গে এমন ভাবে মিলিত হও, যেন ঐ বিষ আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে। ঐ বিষ যেন অমৃত হয়ে যায়। তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হলে আমার আর বিচ্ছেদ ঘটবে না। আমি তখন বিষ পানে অমৃতময়ী হয়ে উঠবো। আমি তোমাকে আন্তরিক স্মরণ করছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার ওপর অধিষ্ঠিত হও।

সেদিন মীরাবাঈ কান্নায় ভাসিয়ে দিয়েছিল। উদাবাঈ তার হাত ধরে বলেছিল: কান্না থামাও বৌদি। আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি বরং একটা গান শোনাও। আজকে এই বিষাদঘন দিনে গিরিধারীলাল নিশ্চয়ই রাণার পাঠানো বিষ অমৃত করে দেবেন। তুমি চিন্তা কোরো না বৌদি। মীরাবাঈ কান্নায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে গান ধরেছিল:

"পিরা মহাঁরে নৈনা আগে রহ জ্যো জী।
নৈনা আগে রহজ্যো, ম্হাঁনে ভূলমত জাজ্যো জী॥
ভৌসাগর মেঁ বহী জাতহুঁ, বেগ ম্হাঁরী সুধ নী জ্যো জী।
রাণাজী ভেজা বিষ কা প্যালা, সোঁ অমৃত কর দীজ্যো জী॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, মিল বিছুরণ মতকী জ্যো জী॥"

গান শেষ। দয়ারাম বিষ নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। উদাবাঈ, চম্পা আর চামেলী উৎকণ্ঠিত। কী হয় কী হয়। এই মুহূর্তে যা হোক কিছু ঘটে যেতে পারে। হয়তো বা মীরাবাঈ-এর মৃত্যু। তারা ভয়ে কেঁপে উঠলো। লোক ডাকবে বলে উঠে দাঁড়াতে গেল। মীরাবাঈ তাদের থামিয়ে দিয়ে দু'হাত পেতে সে বিষের পাত্র গ্রহণ করলো। দয়ারাম খুশি মনে চলে গেল। মীরাবাঈ সে বিষের পাত্র গিরিধারীলালের সামনে রেখে পূজায় বসলো। অনেকক্ষণ ধরে পূজা চললো। মীরাবাঈ-এর নিমিলীত চোখে জলের ধারা। অঝোর-কান্নায় ভাসিয়ে দিয়ে সে ঐ বিষের পাত্র হাতে নিয়ে বললো:

এ অমৃত পাত্র। এ পাত্রে অমৃত আছে। আমি আনন্দের সঙ্গে এ অমৃত পান করবো। গিরিধারীলালের প্রসাদ এই অমৃত।

মীরাবাঈ ধীরে ধীরে সেই বিষ পান করে আবার গান ধরলো ঃ

"বিষ রা প্যালা রাণোজী ভেজ্যা, দীজো মেড়তনী কে হাথ।
কর চরণামৃত পী গঈ, ম্হাঁরা সবলধনী কা সাথ॥
বিষ কো প্যালা পী গঈ, ভজন করে উস্ ঠৌর।
থাঁরী মীরা না মরূঁ, ম্হাঁরী রাখন হারো ঔর॥
জহর কা প্যালা রাণা ভেজা, অমৃতদীন্হ বনায়।'
ন্হায় ধোয় জব পীবন লাগী হো অমর অচাঁয়॥"

মীরাবাঈ গান গাইতে গাইতে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লো। পাশের ঘরে উদাবাঈ, চম্পা আর চামেলী সারা রাত জেগে কাটালো। তারা ভাবতে লাগলো মীরাবাঈ-এর এই ঘুম শেষ ঘুম না হয়। মৃত বলে ঘোষণা না করতে হয়। তারা বারবার এসে দেখতে লাগলো। পরীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু না। মীরাবাঈ সত্যের ঘুমিযে। যেন অনেক ক্লান্তির পর বিশ্রাম। তারা দেখলো যত রাত শেষ হয়ে আসছে, মীরাবাঈ-এর সমস্ত শরীর এক দিব্য জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে আসছে। সদ্য স্নাতা প্রস্ফুটিত পদ্মের মত নির্মল হয়ে আসছে! মীরাবাঈ-এর এই উৎকণ্ঠিত দিনটা তাদের কাছে পরম বিস্ময় হয়ে আছে। পরে তারা মীরাবাঈ-কে বার বার এ কথা জানিয়েছিল।

অতি ভোরে মীরাবাঈ-এর ঘুম ভাংলো। দেখা গেল সে পরিপূর্ণ সুস্থ। তবে খবর এলো দ্বারকায় রণছোড়জী বিগ্রহের মুখ থেকে বিষাক্ত ফেনা (গেঁজলা) নির্গত হচ্ছে। মীরাবাঈ ঐ কথা শুনেই আবার পূজায় বসলো। এবং দীর্ঘ সময় ধ্যানমগ্না রইলো।

মীরাবাঈ সুস্থ আছে এ খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশী সময় লাগলো না। দলে দলে সাধারণ মানুষ ছুটে আসতে লাগলো মীরাবাঈকে দেখবার জন্যে। মীরাবাঈ-এর মন্দিরে জমায়েত হতে লাগলো। মীরাবাঈ সেদিন হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা করেছিল। পূজার ফল-মিষ্টি বিতরণ করেছিল। হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিল। সাধারণ মানুষ সেদিন মীরাবাঈকে সুস্থ দেখে, দিব্য-জ্যোতিতে মীরাবাঈ-এর মুখ-মণ্ডল আলোকিত দেখে, পরম নিশ্চিন্তে বিদায় নিয়েছিল।

মীরাবাঈ বিষ পানের পরও যে সুস্থ আছে, সেদিন এ-কথা প্রচারিত হবার পর বনবীর এবং রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ দুজনেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল মীরাবাঈ কি মায়াবিনী, কুহকিনী, তান্ত্রিক সাধিকা, না এ যোগবল।

মীরাবাঈ-এর আজও মনে আছে যে, ঐ ঘটনার পর চম্পা, চামেলী ও উদাবাঈ মীরাবাঈ-এর প্রতি আরও বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের গিরিধারীলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবার জন্যে চাপ দিতে শুরু করেছিল। প্রথমে মীরাবাঈ রাজি হয়নি। পরে ওদের অত্যধিক চাপে রাজি হয় এবং পরদিন রাতে সাক্ষাতের সময় ঠিক হয়।

পরদিন গভীর রাতে মীরাবাঈ ওদের নিয়ে গিরিধারীলালের পূজোয় বসে গান

গাইতে শুরু করেছিল। এইভাবে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছিল। রাত বাড়তে বাড়তে শেষে ওরা অধৈর্য্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মীরাবাঈ তখন ভাবে বিভোর। আত্ম-সমাধিস্থ। অতিমানসীয় আলোতে তার মুখ-মণ্ডল আলোকিত। এমন সময় ঐ ঘরে পুরুষের গলার আওয়াজ পেয়ে বাইরে প্রহরারত প্রহরী অবাক। এত রাতে মীরাবাঈ-এর ঘরে পুরুষের গলার আওয়াজ। সে বিস্মিত হয়ে রাণাকে খবর পাঠিয়েছিল। রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ খবর শুনে অবাক। সে আর দেরী না করে রণবীরকে খবর পাঠিয়েছিল। রণবীর কোন কথা না বলে শুধুমাত্র হেসেছিল। রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহের সেদিন মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা তদন্ত করা প্রয়োজন। সে আর লোক না পাঠিয়ে, নিজেই মীরার মন্দিরে চলে এসে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দাবী করেছিল।

সে একটা বিশেষ দুর্যোগের রাত। মাঝে মাঝে এমন এক একটা রাত আসে, যা পার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মীরাবাঈ-এর সেই বিশেষ রাত পার করা যেন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এত ঘন আর মন্থর রাত মীরাবাঈ এর জীবনে বড় একটা আসেনি। বিক্রমাজিৎ সিংহ বরাবরই অত্যাচারী মানুষ। মীরাবাঈ এর জীবনে অনেক অত্যাচার ঐ রাণা নিয়ে এসেছে। অথচ সম্মানের দিক থেকে মীরাবাঈ তার আপন বৌদি। তারই বড় ভায়ের স্ত্রী। বিক্রমাজিৎ সিং-এর স্বাভাবিক ভাবেই উচিত তার বৌদিকে সম্মান করা। যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু তা না করে, সে মীরাবাঈ কে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর অকথ্য অত্যাচারের শেষ পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। যা' ভাবলে আজও মীরাবাঈ-এর সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। তবে এই সঙ্গে বিপরীত দিকটাও মীরাবাঈ-এর মাঝে মাঝে মনে পড়ে। বিপরীত দিকটা আর কিছুই নয়। সেদিন বিক্রমাজিৎ-এর অত্যাচার যদি অমান ষিক হয়ে না উঠতো, তবে তার শ্রীবৃন্দাবনে আসা সম্ভব হতো না। শ্রীবৃন্দাবনে এসে বসবাসের কথা তার মনে আসতো না। এখন মনে হয়, বিক্রমাজিৎ এর অত্যাচারই তাকে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিল। এটা গিরিধারীলালেরই কাজ। তিনি অত্যাচারের মধ্য দিয়েই মীরাবাঈকে অমৃতের পথ করে দিয়েছেন। সাধিকারূপী মীরাবাঈ-এর অন্তবিহীন পথ-পরিক্রমার পর উত্তোরণ ঘটিয়েছেন। যে মহিলা যৌবনে যোগিনী, তাকে দীর্ঘপথ অতিক্রান্তের পর তবে সাধনালব্ধ ফল হাতে তুলে দিয়েছেন। অবশ্য তাতে মীরাবাঈ-এর কোন দুঃখ নেই। কারণ সে জানে, যে সমুদ্রের স্বাদ পেতে হলে অনেক আবর্জনাময় খাল-বিল, নদ-নদী পার হয়ে আসতে হয়। সাধন-সিদ্ধি অত সোজা নয়।

সাধন সিদ্ধির শেষের দিকে সাধনায় বসলে যে অনেক দেব-দেবীর আবির্ভাব হয়। তারা অমৃতলোকের উর্দ্ধতন স্তর থেকে নেমে এসে যে সাধক-সাধিকার সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রয়োজনে আশীর্বাদ করে সাধনায় শক্তি যোগান, এ-কথা মীরাবাঈ জানতে পারে, কিন্তু বিক্রমাজিৎ সিংহ কি করে জানবে। যারা অমৃতলোকের উর্দ্ধতন স্তরের সঙ্গে যোগে যুক্ত নয়, তারা কি করে বুঝবে? সে-দিন গভীর রাতে মীরাবাঈ-এর ঘরে পুরুষের গলার আওয়াজ, সেই দেব-বিভূতিরই একটি অংশ, এ-কথা মীরাবাঈ জানে এবং বোঝে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে এ অলৌকিক ব্যাপারটা বোঝানো সম্ভব নয় বলেই

মীরাবাঈ ঐ পুরুষের গলার আওয়াজ কেন হয়েছিল, তা' কাউকে বোঝাতে যায়নি। চেষ্টাও করেনি। কারণ সে জানতো যে সাধন-সিদ্ধির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাদের এ-জিনিষ বোঝানো মূর্খতা। অপপ্রয়োগ। সেই কারণেই মীরাবাঈ এ চেষ্টা থেকে বিরত ছিল।

বিক্রমাজিৎ সিংহ আগেই মীরাবাঈ-কে খবর পাঠিয়েছিল যে সে সেইরাতেই মীরাবাঈ-এর কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করতে আসছে। তার ঘরে পুরুষের গলার আওয়াজ কেন হয়েছিল তার উপযুক্ত জবাব না দিতে পারলে উপযুক্ত ব্যবস্থা। মীরাবাঈ চম্পা, চামেলী আর উদাবাঈকে সরিয়ে দিয়ে নিজে বিক্রমাজিৎ-এর আগমনের প্রতীক্ষায় রইলো। প্রতি মুহূর্তেই তার মনে হতে লাগলো কি জানি কি হয়। হয়তো তার সমস্ত মান-সম্মান, সমস্ত ধ্যান-ধারণা এবং ঈশ্বরমুখী মন এক নিমেষেই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। আজকে শ্রীবৃন্দাবনের মন্দিরে বসেও সেই ভয়াবহ রাত ভাবনা জাগিয়ে তোলে। অথচ সে-দিন কিন্তু রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহের মুখোমুখি দাঁড়াতে মীরাবাঈ একটুও ভয় পায়নি। ভয়টা সে আগে পেয়েছিল। কিন্তু বিক্রমাজিৎ সিংহ জবাব চাইতে মীরাবাই সরাসরি জবাব দিয়ে বলেছিল ঃ আমি এখন শ্যামের প্রেমে মত্ত আছি। তাই এই গলার আওয়াজ। তুমি আমার কথা বুঝবে না বিক্রম। আমি এখন বেশভুষা করে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে লোকলজ্জা পরিত্যাগ করে, সকলের সামনে নাচতে পারি। সাধুসঙ্গে থাকতে থাকতে আমার সমস্ত কুমতি চলে গিয়েছে। আমি এখন প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত হতে পেরেছি। এবং দিনরাত হরিগুণগান করতে করতে সমস্ত ভয় থেকে রক্ষা পেয়েছি। সেই শ্যাম ভিন্ন সমুদয় জাগতিক ব্যাপারে এখন আর আমার ভাল লাগে না। অন্য কথাও মনে লাগে না। আমি গিরিধারীলালের কাছে এখন কেবল প্রেম ও ভক্তি ভিক্ষা করি। তুমি যদি বিশ্বাস নিয়ে এখানে বসতে পার, তবে আমি তোমাকে গিরিধারীলালের গান শোনাতে পারি। আমার মনে হয়, তুমি গান শুনলে তৃপ্তি পাবে। শান্তি পাবে। রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ অনেক আগেই অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। মীরাবাঈ-এর শেষ কথায় আর ধৈর্য রাখতে না পেরে স্বর সপ্তমে চড়িয়ে জবাব দিয়েছিল ঃ আপনি দ্বিচারিণী, কলঙ্কিণী, রাণা পরিবারের কলঙ্ক, অযোগ্য। আপনাকে ভ্রাতৃবধূ বলে সম্মান করতে আমার লজ্জা হয়। রাণা পরিবারের সম্মান সম্পর্কে আপনার সচেতন থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আমি দেখছি আপনি সে ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন।

আর দাঁড়ায়নি বিক্রমাজিৎ সিংহ। মীরার মন্দির ছেড়ে তড়িতে চলে গিয়েছিল। সে-দিনের সেই ঘটনায় মীরাবাঈ কিন্তু একটুও উত্তেজিত হয়নি। অথবা বিস্মিত হয়নি। বিক্রমাজিত সিংহ সেই প্রথম মীরাবাঈ এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গালিগালাজ করেছিল। কিন্তু মীরাবাঈ তার মুখ দেখেই বুঝেছিল যে বিক্রমাজিৎ-এর এ-কাজ করবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। সে এ-কাজ করেছে বনবীরের ইচ্ছায়। বনবীর তাকে বুঝিয়েছে যে মীরাবাঈ-এর এই ধরনের আচরণে রাণা পরিবারের কলঙ্ক রটবে। লোকের মুখে মুখে মহিষী-মহলে ছড়াবে এবং সমালোচনা হবে। মীরাবাঈ বুঝেছিল যে এ পরিকল্পনা বনবীরের। কারণ পরে মীরাবাঈ-এর কানে এসেছিল যে বনবীর

প্রত্যক্ষভাবে মীরবাঈ-এর বিরুদ্ধাচরণের কাজে নামবার চেষ্টা করছে। এবং আংশিকভাবে সফলও হয়েছে। শোনা যাচ্ছে বনবীরের প্ররোচনায় এবারে রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ নিজেই মীরাবাঈ-এর বিরুদ্ধে কাজে নামছে। তাকে নানা অজুহাতে চিতোর থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে। বনবীর রাণাকে বুঝিয়েছে যে মীরাবাই চিতোরের রাজনীতিতে জড়িত। সে চিতোরে বসে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করছে। কারণ অত রাতে মীরাবাঈ-এর মন্দিরে পুরুষের গলা পাবার অর্থ সে অপর কারো সঙ্গে গোপনে শলা-পরামর্শে লিপ্ত আছে। তার না থাকলেও মীরার কলঙ্ক চিতোরের রাণা বংশকে স্পর্শ করবে, এটাও সহ্য করা অসম্ভব। সুতরাং মীরাবাঈকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর নয় তো চিতোর ত্যাগ করে যেতে হবে। মীরা শুনলো এবারে রাণা নিজেই তার বিপক্ষে নামছে। শোনা যাচ্ছে বনবীর নাকি খুশি। সে এটাই চাইছিল।

॥ চৌদ্দ ॥

উদয় সিংহ-এর মৃত্যুর খবরকে কেন্দ্র করে আজ মীরাবাঈ-এর সামনে চিতোরের পূর্ণ ইতিহাসটা দাঁড়িয়ে গেল। শ্রীবৃন্দাবনে মীরাবাঈ সাধনার জন্যে এসেছে। সাধনার লোক থেকে লোকে তার উত্তোরণও ঘটছে। তার প্রমাণও সে পেয়েছে। কিন্তু তব ও চিতোর তার যৌবনের লীলা-নিকেতন। তাকে সে ভোলে কেমন করে? তাকে বিস্মৃত হওয়ার অর্থ জীবনের পরম রসঘন অংশটুকুই বাদ চলে যাওয়া। তাই মাঝে মাঝে নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মীরাবাঈ-এর মন চিতোরকে স্পর্শ করে। ঘটনাবলীর কিছু অংশ মনের আকাশে মেঘ হয়ে দেখা দেয়। কিছু বর্ষণও করে। আবার আকাশ পরিষ্কার হয়। মেঘ চলে যায়।

সে-দিন খবর এলো এবারে রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ মীরাবাঈ-ক হত্যার ফাঁদ পাতছে। খবর শুনে সকলেই শঙ্কিত, আতঙ্কিত। মীরাবাঈ-এর ভক্তবৃন্দ, প্রজাবৃন্দ ও সাধক-সাধিকারা মীরাবাঈকে কাছ ছাড়া করতে নারাজ। কারণ বিপদ কোন দিক দিয়ে আসবে বা কবে আসবে কেউ জানে না। সুতরাং মীরাবাঈকে সতর্কে রাখো। নজরবন্দী করে রাখো। রাণা বিক্রমাজিৎ-এর দেওয়া কোন কিছুই যেন মীরাবাঈ-এর হাতে এসে না পড়ে।

কিন্তু এত চেষ্টাতেও মীরাবাঈকে বিপদমুক্ত রাখা সম্ভব হয়নি।

একদিন গভীর রাতে মীরাবাঈ গভীর ধ্যানে মগ্ন। আকস্মিক ভাবে তার নজরে পড়লো যে তারই পালঙ্কের নীচে একটা বিরাট ঝাঁপী। মীরাবাঈ-এর ধ্যান ভঙ্গ হলো। পালঙ্কের নীচে ভাল করে তাকিয়ে দেখলো যে সত্যিই একটা বড় ঝাঁপী এবং সেটা নড়াচড়া করছে। মীরাবাঈ অত্যন্ত বিস্মিত হলো। কী ব্যাপার! তার বিক্রমাজিৎ সিংহের শত্রুতার কথা মনে পড়লো। এবং তার বেশী চিন্তা করবার

আগেই ঐ ঝাঁপী থেকে এক বিরাট কাল সাপ ফণা তুলে সামনে এসে দাঁড়ালো। মীরাবাঈ সঙ্গে সঙ্গে গভীর ধ্যানমগ্ন হলো। তার দিব্যদৃষ্টিতে ফুটে উঠলো বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। বৃন্দাবনলীলার নায়ক মোহন-মুরলীমুখী শ্রীকৃষ্ণ। তারই পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে আশীর্বাদ রত। মীরাবাঈ অমৃতসাগরে ডুবে গেল। একটা সুমধুর অমৃতময় আচ্ছন্নতায় বিভোর হয়ে গেল। তখন তার সমস্ত দেহ-মন সংজ্ঞাহীন এবং শঙ্কাহীন হয়ে উঠলো। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কাটলো। তারপর ধীরে ধীরে তার চেতনা ফিরে আসতে সে অপরিসীম বেদনাহত কণ্ঠে গান ধরলো ঃ

"ভাববা মেঁ সালি গরাস বোলত কাহে নাহিয়াঁ।
হম বোলত তুম বোলত নাহিঁ, কাহে কো মৌন ধরে রহিয়াঁ॥
য়হ ভব সাগর অগম বড়ী হৈ কাঢ়ি লেহু গাহিকে বহিয়াঁ। ১
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, তুমহী মোর সহৈয়া॥"

গান শেষ হতে মীরাবাঈ তন্দ্রাঘোরে বারবার বলতে লাগলো ঃ হে গিরিধারী, হে বংশীধারী কৃষ্ণ তুমি আমার হাত ধরে পার করে দাও। এই ভব-সাগরে তুমিই আমার একমাত্র সহায়।

মীরাবাঈ-এর পূর্ব চেতনা ফিরে এলো। সে ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলো কালো সাপ অন্তর্হিত। প্রাণ ফিরে পেলো মীরাবাঈ। পরে ঐ বৃহৎ ঝাঁপী তুলে দেখলো বিরাট এক শালগ্রাম শিলা বসানো আছে। তাতে সুগন্ধিমালা জড়ানো।

অতি ভোরে মন্দিরের দরজা খুলে দিল মীরাবাঈ। লোকজন এসে জমা হলো। এলো ভক্তবৃন্দ। প্রজাবৃন্দ। সাধক-সাধিকার দল। এসে সব শুনলো। বুঝলো কালসাপকে পাঠিয়েছে তাও কারো অজানা নয়। সকলেই ঐ বিশাল শালগ্রাম শিলা আর সুগন্ধি ফুলের মালা দেখে অবাক হতে লাগলো। মীরাবাঈ-কে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। তার অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস জন্মাতে লাগলো। জনসাধারণ বুঝতে লাগলো যে গিরিধারীলালের সেবা মিথ্যা নয়। কৃষ্ণ-ভজনা মিথ্যা নয়। সংগীত-সাধনা মিথ্যা নয়। প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস মানুষকে চেতনার এমন এক স্তরে নিয়ে আসতে পারে যা বস্তুজগতে অবিশ্বাস্য। সকলে বলতে লাগলো ঃ আজ মীরাবাঈ সে কথাই প্রমাণ করলো। মীরাবাঈ এর মৃত্যু নেই। মীরাবাঈ-এর বৃন্দাবনমুখী মন, কৃষ্ণমুখী মন অমর। অক্ষয় ও অজেয়। চিতোরের রাণা পরিবার তাকে কোনদিন কিছু করতে পারবে না।

সাধকবৃন্দের অভিনন্দনে অভিভূত হয়ে মীরাবাঈ সেদিন বারবার বলেছিল ঃ রাণা আমাকে কী করবেন? আমি কুল, মান-মর্যাদা ও লজ্জা ত্যাগ করেছি। রাণা আমাকে হত্যা করবার জন্যে বিষ পাঠিয়ে ছিলেন। আমি তা' অমৃতস্বরূপ পান করেছি। রাণা ঝাঁপীতে কালসাপ পাঠালেন। সেই সাপ ঘনশ্যামের কৃপায় শালগ্রাম শিলাতে পরিণত হলো। আমার জীবনে যত বাধাই আসুক না কেন আমি গিরিধারীলালের সেবা করে যাব। শ্রীকৃষ্ণের মধুর-মুরতি চিন্তা করবো। তাঁর বংশীধ্বনি শোনবার জন্যে কান পেতে থাকবো। আমার এই সাধনা থেকে কেউ

আমাকে বিরত করতে পারবে না। আমি বৈষ্ণব। সুতরাং বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করা আমার নৈতিক কর্তব্য। সাধুগণ আমার সহায়। আমিও সাধুদের জন্যে। সাধুরাই আমার প্রাণ। মাখনের সঙ্গে যেমন ঘৃত তেমন সাধুদের সঙ্গে আমি মিশে আছি। আপনারা আজ যাঁরা আমার মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা সুস্থচিত্তে বসে আমার গান শুনুন ; মীরাবাঈ সেদিন সকলকে মুগ্ধ করে গান ধরেছিল ঃ

বাণা মহাঁরো কাঁঈ করিছে, মীরা ছোড়দঈ কুল-লাজ।
বিষ প্যালো রাণাজী ভেজ্যা, মীরা মারণ কাজ ॥
হস্‌কে মীরা পী গঈ হৈ, প্রভু প্রসাদ পরবাগ।
ডাব্‌বা এক রাণাজী ভেজ্যো, উসমেঁ কারা নাগ ॥
ডাব্‌বা খোল্‌ মীরা জব দেখ্যো, হৈব গযে সালি গবাস।
জৈ জৈ ধ্বনি সন্ত মতাভই, কৃপা করি ঘনশ্যাম ॥
সজি সিংগার পগ বাঁধি ঘুঁঘরু দো কর দেতীতাল।
ঠাকুর আগে নৃত্য করত হী, গাজব শ্রীগোপাল ॥
সাধু হমারে হস্‌ সাধুন্‌ কে, সাধু হমারে জীব।
সাধন মীরা মিলি জো রহী হৈ জিমি মাখন মেঁ ঘীব ॥

মীরাবাঈ গানে বিভোর। তার সঙ্গে যত সাধু-সন্ত ও সাধিকা অমৃত পানে আচ্ছন্ন।

॥ পনের ॥

খবর শুনে রাণা বিক্রমাজিত সিংহ স্তম্ভিত। কালসাপে মৃত্যু নেই এ কেমন মেয়ে! একি মায়াবী ময়াল। না তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ। অবাক ব্যাপার। রাণা ভাবলো যারা তার এ প্রচেষ্টার কথা জানে, তারা হাসছে, তারা ভাবছে আমি রাণা হয়েও বার বার মীরার কাছে পরাজিত হচ্ছি। এ অপমান অসহ্য। এবারে যেভাবেই হোক মীরাকে শেষ করে দিতে হবে। অনেক ভেবেচিন্তে রাণা বিক্রমাজিত সিংহ সেবারে ঠিক করলো মীরাবাঈ-কে একটি লৌহকণ্টকযুক্ত খাট পাঠাবে। দেখা যাক কী হয়। মীরাবাঈ-এর দূতে যথাসময়ে মীরাবাঈকে সব কথা জানিয়ে গেল। মীরাবাঈ তার একান্ত অনুগত সাধক ও সাধিকাদের সেকথা জানালো। ফলে এবারে সকলেই মীরাবাঈকে সর্বসময়ের জন্যে ঘিরে থাকতে লাগলো। পাহারা দিতে লাগলো। মীরাবাঈ সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসার প্রতি ভরসা রেখে শান্তিতে সেবার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। মীরাবাঈ সেদিন ভেবেছিল এত মানুষের ভালবাসার ফল বিফলে যেতে পারে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস এসে গিয়েছিল যে রাণা তাকে যেভাবেই বিপদে ফেলবার চেষ্টা করুক না কেন, তার কিছুই হবে না। কারণ তার পেছনে রয়েছে

সাধারণ মানুষের গভীর ভালবাসা, গিরিধারী লালের নিত্যসেবার ফল ও দীর্ঘ জীবনের যোগসাধনার অনুভব।

আকস্মিকভাবে একদিন গভীর রাত্রে মীরাবাঈ এর মন্দিরে রাণা বিক্রমাজিৎ-এর লৌহকণ্টকযুক্ত পালঙ্ক এসে হাজির হলো। ওপরে মোটা গদি মোড়া এবং সুবাসিত পুষ্পমাল্য জড়ানো। বাহকেরা জানালো যে রাণা বিক্রমাজিত সিংহ পাঠিয়েছেন, মীরাবাঈ গিরিধারীলালের নিত্য সেবার পর বিশ্রাম নেবার জন্যে। রাত্রে গভীর ঘুমে নিজেকে সতেজ করবার জন্যে। বাহকেরা পালঙ্ক নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। মীরাবাঈ ঐ পালঙ্কটা ভাল করে দেখলো। তারপর মন্দিরের পাশেই বিশ্রামরত সাধক-সাধিকাদের ডেকে পাঠালো।

খবর পেয়ে মুহূর্তে সমস্ত সাধক-সাধিকারাই এসে হাজির। এমন কৌতূহল আর কৌতুকময় দৃশ্য দেখতে কে না চায়। তারা এসেই পালঙ্কের গদি ও সুবাসিত পুষ্পমাল্যের ঝাড় সরিয়ে ফেললো এবং মুহূর্তে বেরিয়ে এলো বড় বড় তীক্ষ্ন ধারালো কাঁটা। মীরাবাঈ যদি না জেনে ঐ পালঙ্কে সত্যি বিশ্রাম নিতে যেতো তবে তার সমস্ত শরীর নিঃসন্দেহে ঐ তীক্ষ্ন কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে অবিরাম রক্ত ঝড়তো। এমনকি মৃত্যু না হলেও, মীরাবাঈ-কে আর একবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হতো। কিন্তু সাধক সাধিকাদের আন্তরিক ইচ্ছায় তা সম্ভব হয় নি। মীরাবাঈ-এর মনে এই ধরনের একটা ধারনা ছিল যে চিতোরের সাধারণ প্রজা ও ভক্তবৃন্দের ভালবাসা তাকে প্রতিবারই বিপদ মুক্ত করছে এবং করবে। সাধারণ মানুষ তাকে ভালবাসে। একজন রাণা তার পদাধিকারের জোরেও এ ভালবাসা কল্পনা করতে পারে না। মীরাবাঈ এর বিশ্বাস যে, রাণারা পদের জোরে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করে। পায় না। মীরাবাঈ দীর্ঘ সাধনায় অন্ততঃ এটুকু বুঝেছিল যে এই ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধ্বতন স্তরে এমন একটি অতিমানবীয় শক্তি বিরাজ করছে যা জাগতিক জগতের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা বহির্ভূত। অতি-অনুভবে এবং দীর্ঘ সাধনায় সে শক্তি লাভ করা সম্ভব। মীরাবাঈ মনে করে যে এই বিশ্বাসই তাকে আজীবন শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছে এবং বিপদ মুক্ত করছে। পর পর কয়েকটি বিপদ মুক্তির পর অলৌকিক যোগবলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি মীরাবাঈ-এর আরও বৃদ্ধি পেল। সাধুতা, সত্যতা, এবং সাধনার একনিষ্ঠতা ও মমত্ব বোধ যে মূল্যহীন নয় তার প্রমাণ মীরাবাঈ চিতোরে বার বার পেয়েছে। মীরাবাঈ তার ভক্তবৃন্দদের কণ্টক শয্যায় কথা উল্লেখ করে বলেছিল ঃ

শূল সেজ রাণা নে ভেজী, দীজ্যো মীরা সুলায়।
সাজ ভঈ মীরা সোবণ লাগী মালো ফুল বিছায়॥

রাণা আমাকে শূল-শয্যা পাঠিয়েছেন বটে, কিন্তু সেটা শেষে ফুলশয্যায় পরিণত হলো।

চিতোরে থাকতে মীরাবাঈ-এর ভক্তেরা বলতো ঃ ভক্তের রক্ষা কর্তা ভগবান। ভগবানই ভক্তকে রক্ষা করেন। মীরাবাঈ-কে গিরিধারীলালই আজীবন রক্ষা করে এসেছেন। তারা বলতো ভক্তকে যে ভগবান রক্ষা করেন, তার প্রমাণ অনেক।

সত্যযুগে ভগবান বিষ্ণু যে ভাবে হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার থেকে ভক্ত প্রহ্লাদ কে রক্ষা করেছিলেন, দেখা যায় এ যুগে তিনিই সেই একই ভাবে ভক্ত মীরাবাঈ-কে রাণা বিক্রমাজিৎ-এর অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছেন। তাদের ধারণা মীরাবাঈ রাণার অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়েও দুঃখকে দুঃখ বলে মনে করেনি। মীরাবাঈ প্রতিবার দুঃখের সময়ই ভগবানের অনুগ্রহ মনে মনে অনুভব করেছে। কারণ মীরাবাঈ নিজেই ভক্তদের বার বার বলতো : দুখ জহাঁ তহঁ পীর।" যেখানে দুখ সেখানেই ভগবান। এই কথার সঙ্গে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীর কথাও মনে করিয়ে দিত। কুন্তীর উক্তি ছিল : হে কৃষ্ণ, আমরা যখনই বিপদে পড়েছি, তখনই তোমার দর্শন পেয়েছি। সুতরাং আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যেন সব সময়ই আমাদের বিপদ আসে এবং তোমার দর্শন পাই।

"বিপদ : সন্তু তা : শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্ গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভব দর্শনম্ ॥"

মীরাবাঈ বার বার এই কথাগুলো তার ভক্তদের বলতো। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় তাদের মনে ভক্তি ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। সাধনায় শক্তি যোগানো। মীরাবাঈ-এর আজও মনে আছে যে কোন এক ঘরোয়া সভায় সে তার ভক্তদের উপদেশ দিতে গিয়ে বশিষ্ট দেবের কথা স্মরণ করেছিল। সে বলেছিল যে দেখো বশিষ্টদেব পর্যন্ত উপদেশ দিতে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্র কে বলেছিলেন ; যিনি দুঃখকে সুখ ও বিষকে অমৃত বলে গ্রহণ করতে পারেন, তিনিই প্রবুদ্ধ।

"দুঃখং সুখং ভাবনয়া কুর্বণ বিষ মিবা মৃতম্।
ইতি নিশ্চিত্য ধীরাত্মা প্রবুদ্ধ ইতি কথ্যতে ॥"

মীরাবাঈ শুনেছিল যে তার ভক্তদের বিশ্বাস, সে ভগবানেব অনুগ্রহে প্রবুদ্ধতা লাভ করেছে এবং সেই কারণেই সমস্ত দুঃখকে সুখ বলে গ্রহণ কবতে পেরেছে বিষ পান করে অমৃত পানের ফল লাভ করেছে।

মীরাবাঈ এর বিশ্বাস শ্রীবৃন্দাবনে এসে তার স্বপ্ন ও সাধনা আরও সংহত এবং কেন্দ্রিভূত হতে পেরেছে। যার মূলে ভক্ত সনাতনের একনিষ্ঠ সহযোগীতা ও সেবাপরায়নতা। মীরাবাঈ-এর ধারণা গিরিধারীলালই সনাতনকে তার কাছে এনে দিয়েছেন তার সাধনায় উত্তোরণ ঘটাবার জন্যে। অমৃতলোকের উৎসে পৌঁছাবার সুযোগ করে দেবার জন্যে। মীরাবাঈ মনে করে তার সাধনায় সিদ্ধি লাভের সনাতন একটা অবলম্বন। একটা অধ্যাতিক খুঁটি।

॥ ষোল ॥

মীরাবাঈ যে বিপদ মুক্ত এবারেও সে খবর রাণা-মহলে যথাসময়েই এসে পৌঁছে গেল। রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ সে খবর শুনে যেমন ক্রুদ্ধ তেমন দিশেহারা হয়ে

পড়েছিল। অবাক-আশ্চর্য্য হওয়া সে ইদানীং প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। সেবারে সে সোজাসুজি হুকুম দিল। বুঝলো আর গোপনীয়তা করে কোন লাভ হবে না। কোন ফল হবে না। সুতরাং মীরাকে এবারে প্রকাশ্যে সুরজকুণ্ডের জলে ডুবিয়ে মারা হবে। প্রকাশ্য দিবালোকে। সমস্ত প্রজাদের সামনে। তার মতে গোপনীয়তার দিন শেষ হয়েছে। কারণ যতবারই মীরাকে হত্যা করবার জন্যে চেষ্টা চালানো হয়েছে, ততবারই সে কোন-না-কোন উপায়ে বেঁচে গেছে। বিক্রমাজিৎ-এর বিশ্বাস, এর পেছনে রাজমহলের সর্দারদের হাত আছে। সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে মীরাবাঈ-এর ভক্তবৃন্দ ও সাধক-সাধিকার দল। সেই কারণেই মীরাবাঈকে কিছু করা যাচ্ছে না। অতএব এবারে আর গোপনীয়তা নয়। প্রকাশ্যে সকলের চোখের সামনে অতল সুরজ-কুণ্ডের জলে মীরাবাঈ-কে ডুবিয়ে মারবার হুকুম দিল রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ। সে এই হুকুম দেবার আগে একবার ভাবলো না যে, এর ফল কী হতে পারে।

সেদিন এ খবর শুনে মীরবাঈ আতঙ্কিত হয়েছিল। ভেবেছিল, বার বার তিনবার। এবারে কী হবে কে জানে। কিন্তু চিতোরের জনসাধারণ শুনে অবাক হয়েছিল। ভেবেছিল, মীরার মত একজন বৈষ্ণব-সাধিকাকে জলে ডুবিয়ে মারা হবে? এ কেমন কথা? এ কেমন বিচার? লোকের মুখে মুখে সে কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সকলেই বলতে লাগলো; কী আশ্চর্য্য! চিতোরের কুলবধূ, চিতোরের রাজমহিষীকে প্রকাশ্যে জলে ডুবিয়ে মারা? এমন ঘটনা কেউ কোন দিন শোনেনি। আজকে মহারাণা সংগ্রাম সিংহ অথবা ভোজরাজ বেঁচে থাকলে কি হতো? বর্তমান রাণা একটা অপদার্থ।

বনবীর কথাটা শুনে হেসেছিল। সকলে বলতে লাগলো: রাণাকে অপদার্থ প্রমান করাই তার কাজ।

বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা সেদিন প্রচার করেছিলেন যে মীরাবাঈ বৈষ্ণব। গিরিধারী লালের সেবিকা। আর রাণা শাক্ত। শক্তির উপাসক। কালিকা দেবীর পূজারী। মীরাবাঈ-কে জলে ডুবিয়ে হত্যা করে, বর্তমান রাণা বোঝাতে চাইছেন যে, চিতোরে আর বৈষ্ণব ধর্মের, প্রসার বা প্রচার চলবে না। গিরিধারী লালের সেবা বন্ধ। মন্দিরে মন্দিরে তালা পরবে। মীরাবাঈ-এর মৃত্যুর পর যদি কোন বৈষ্ণবকে চিতোরে বাস করতে হয়, তবে শক্তির উপাসক হতে হবে। নতুবা মৃত্যু।

বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা সেদিন ঐ ব্যাখ্যাই দিয়েছিলেন এবং প্রতিজনকে ঐ কথা বোঝাবার চেষ্ঠা করেছিলেন। তারা বলেছিলেন: আগামী দিনের মানুষ জানবে যে মীরাবাঈ ধর্মের জন্যে প্রাণ দিয়েছে। মীরাবাঈ অনন্যা সাধিকা।

পণ্ডিতদের এই ধরণের ব্যাখ্যা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলে সেদিন জনসাধারণের মনে ক্ষোভ, দুঃখ আর অনুতাপের সীমা ছিল না। কিন্তু আত্মপ্রকাশ অসম্ভব। তাহলেই রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ দেশদ্রোহী বলে হুলিয়া জারী করবে। ধরে আনতে বলবে। সুতারাং ক্ষোভ, দুঃখ সবই চাপা চাপা। বহি-প্রকাশ নেই। চারিদিকে যখন এতো গোলমাল, মীরবাঈ-কে নিয়ে যখন সকলেই এতো ব্যস্ত, তখন মীরাবাঈ একান্ত ভাবেই আত্মনিমগ্ন। গিরিধারীলালের সেবায় সম্পূর্ণ

নিয়োজিত। তার চোখে-মুখে সেদিন উদ্বিগ্নতার কোন ছাপ ছিল না। সে ছিল সদা আনন্দময়ী।

আজকে শ্রীবৃন্দাবনে বসে মীরাবাঈ ঐ কথা গুলো ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে গেল। এতো সাহস, এতো ধৈর্য্য, এত সহনশীলতা সেদিন কে তাকে জুগিয়েছিল। চিতোরে সে-দিন তার অবলম্বন বলে রাণা-পরিবারের কেউ ছিল না। যাদের হাতে সত্যিকারের শাসন ও শোষণের ক্ষমতা, সে-দিন সবাই তারা পিছিয়ে গিয়েছিল। শুধু পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল চিতোরের জনসাধারণ, ভক্তবৃন্দ আর সেবক-সেবিকার দল। যাদের হাতে সে-দিন কোন ক্ষমতা ছিল না। আজও নেই। তবুও সে-দিন তারাই মীরাবাঈ-কে শক্তি যুগিয়েছিল। অকুণ্ঠ সমর্থন করেছিল। এবং সেই শক্তি ও সমর্থনের ঢেউ এসে ধাক্কা দিয়েছিল চিতোরের মহিলা-মহলে। ফলে চিতোরের মহিলা-মহলের বাসিন্দারাও সেদিন সজাগ হতে বাধ্য হয়েছিল। রাজমহিষীরা সে-দিন বুঝেছিল যে এতোবড় একটা অন্যায় চিতোরে ঘটতে দেওয়া যেতে পারে না। গোপন পরিকল্পনা যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন প্রকাশ্য পরিকল্পনায় বাধা দিতেই হবে। কারণ তখন তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে এ ঘটনা চিতোরে অমঙ্গল ডেকে আনবে। অন্য রাজ্যের রাণারা চিতোরের ওপর কলঙ্ক আরোপ করবে। আর তা' ছাড়া নীতিগত ভাবে এটা অন্যায় ও। মীরাবাঈ রাজকুলবধূ। সে কোন অন্যায় করে নি। অতএব তাকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হবে, এ কাজ সহ্য করা যাবে না।

সেদিন রাজমহিষীরা গোপন পরামর্শে বসেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন ধনবতীবাঈ, কারমেতনবাঈ, উদাবাঈ, চম্পা আর চামেলী।

খবর শুনে মীরাবাঈ আশ্বস্ত হয়েছিল। ভেবেছিল ঈশ্বর মঙ্গলময়। তার এতোদিনের গিরিধারীলালের সেবা তাহলে মিথ্যা হয়নি। তার ঐকান্তিক সেবা, সাধনা ও সংগীতের শক্তি তাকে সে-দিন শক্তি জুগিয়েছিল। অতিমানসীয় দিব্য জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

রাজমহিষীদের গোপন পরামর্শের ফলাফল মীরাবাঈ-কে জোগাতে লাগলো উদাবাঈ, চম্পা আর চামেলী।

সেই গোপন পরামর্শে ধনবতীবাঈ বলেছিলেন: রাণাকে ঠেকাতে হবে। রাণাকে বোঝাতে হবে যে এটা অন্যায় হচ্ছে। এতে রাজকুলে কালি পড়বে।

কারমেতনবাঈ বলেছিলেন: রাণা শুনবে না। রাণার ধারণা মীরাবাঈ উদয় সিংহকে রাণা করতে চাইছে। চিতোর গড়ের কিছু সর্দারও মীরাবাঈ-এর এই পরিকল্পনার পেছনে আছে। উদয় সিংহ এখন রাণার ভয়ে কুম্ভল গড়ে পালিয়ে। রাণার ধারণা সে সেখান থেকে অন্য রাজ্যে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। মীরা উদয়কে কোলে করে মানুষ করেছে। সুতরাং সে উদয়কে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। রাণার আরও ধারণা, এ ব্যাপারে আলোচনার জন্যে মীরার দূত বুন্দী ও মেড়তায় গেছে। বীরমদেবজীকে মন্ত্রনা দিচ্ছে মীরা। সুতরাং রাণাকে বলে কিছু হবে না। রাণা ছাড়বে না।

চম্পা-চামেলী সেদিন নীরব ছিল। তারা মীরাবাঈ-কে খবর সরবরাহের জন্যে বসে। মীরার শোকে তারা মুহ্যমান।

ধনবতীবাঈ বলেছিলেন ঃ মীরাকে বাঁচাতেই হবে। যত টাকা লাগে আমরা দেব। আমরা সমস্ত সর্দারকে খবর পাঠাচ্ছি।

কারমেতনবাঈ তার জবাবে বলেছিলেন ঃ টাকা না হয় ছড়ানো গেল। কিন্তু কাজ উদ্ধার হবে কি ভাবে ?

ধনবতীবাঈ বলেছিলেন ঃ উদাবাঈ-কে বনবীর খুব ভালবাসে। ওকে একবার বনবীরের কাছে পাঠালে কি হয় ? বনবীর আপত্তি জানালে রাণা হয়তো আর এগুতে সাহস পাবে না।

কারমেতনবাঈ রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন ঃ রাণা হয়তো সাহস পাবে না। কিন্তু বনবীর রাজি হবে না। আসলে এ-সব কাজ বনবীর-ই করাচ্ছে। চিতোরে সকলের কাছে রাণাকে হেয় করতে চায়। বাইরের রাজ্যের রাণারা জানুক যে সে কত বড় অপদার্থ। সামনে যুদ্ধ আসছে। গুজরাটের বাহাদুর শাহ আবার শুনছি চিতোর আক্রমণ করবে। এই সময় চিতোরের সাধারণ মানুষকে কাছে পেতে হলে মীরাকে দরকার। কিন্তু বনবীর এটা হতে দেবে না। কুমার মালদেবজীর সঙ্গে বনবীরের আবার বন্ধুত্ব হয়েছে। বনবীর নাকি বলে বেড়াচ্ছে, চিতোরের ক্ষমতা তার হাতে আসা উচিত। আর ওদিকে মারওয়াড়ের ক্ষমতা মালদেবজীর হাতে। তাহলে সমস্ত রাজপুতনা তাদের তাঁবেদারী করবে। বনবীরের এটাই ইচ্ছা। আমার কথায় সহজ প্রমাণ হচ্ছে সামনে যুদ্ধ, অথচ চিতোরে কোন প্রস্তুতি নেই। বনবীর এ যুদ্ধে হেরে গিয়ে বর্তমান রাণাকে সরিয়ে দিতে চায়। আমি সব জানি। সুতরাং উদাবাঈ-কে বনবীরের কাছে পাঠিয়ে কোন ফল হবে না। এটা একটা পুরোপুরি চক্রান্ত। মীরাবাঈ-এ সবের মধ্যে নেই। কিন্তু তবুও তাকে রাজ্যের রাজনীতির মধ্যে টেনে এনে জলে ডুবিয়ে মারা হচ্ছে। মীরা হয়তো মেড়তার বীরমদেবজীর সঙ্গে যোগাযাগের চেষ্টা করতে পারে। তবে আমার মনে হয় সেটা রাজনীতির কিছু নয়। সম্পূর্ণ পারিবারিক। কিন্তু রাণা ভাবছে রাজনৈতিক। এটা ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কিছু নয়।

ধনবতীবাঈ সেদিন বলেছিলেন ঃ মীরাকে জলে ডুবিয়ে মারবার দিন আমরা সকলে মিলে মীরার ভজন গাইতে গাইতে সুরজকুন্ডের দিকে যাব এবং মীরাকে ঘিরে থাকবো। আমরা সকলে গিরিধারীলালের গান গেয়ে এ অবিচারের প্রতিবাদ জানাবো। আমার মনে হয় হয়তো শেষ মুহূর্তে রাণার মত পাল্টাবে। কারণ এতোগুলো রাজমহিষীর প্রতিবাদকে, সে অমান্য করতে পারবে না। তবে তার আগে উদাবাঈ-কে একবার বনবীরের কাছে পাঠাও। দেখো বনবীর কিছু করতে পারে কিনা।

কারমেতনবাঈ বলেছিলেন ঃ বেশ ! দেখা যাক।

উদাবাঈ বনবীরের কাছে হাজির হয়ে সব কথা জানিয়েছিল।

বনবীর বলেছিল ঃ আমার কিছু করবার নেই। রাণার হুকুম। তুমি রাণাকে গিয়ে জানাও।

উদাবাঈ সেদিন শুকনো মুখে ফিরে এসেছিল।

॥ সতের ॥

দেখতে দেখতে অতল সুরজকুণ্ডের জলে মীরাবাঈ-কে ডুবিয়ে মারবার দিন এগিয়ে আসতে লাগলো। মীরার শোকে সমস্ত চিতোর হাহাকার করতে লাগলো। সকলে সেদিন সমস্বরে বলেছিল ঃ এ অন্যায়। এ অবিচার। এর প্রতিবিধান করা দরকার। সুরজকুণ্ড অবরোধ করে রাখো, যাতে মীরাবাঈ-কে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয়।

সারা চিতোর জুড়ে গোলমাল। মিছিল চলেছে সুরজকুণ্ডের দিকে। সুরজকুণ্ড অবরোধ। মীরাবাঈ নির্বিকার। বাইরের এত কাণ্ড তার কানে আসছে না। সে তার মন্দিরের ভেতরে গিরিধারীলালের সামনে আপন মনে গান গেয়ে গিয়েছিল।

মীরাবাঈ-এর আজও মনে পড়ে, সেদিন কি উদ্বেগ, কি উৎকণ্ঠা ঈশ্বর তার ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন। মীরাবাঈ সেদিন দীর্ঘ সময় ধ্যানমগ্না থেকে ঊর্ধ্বতন লোকের আলোর অবতরণ ঘটিয়েছিল। মীরাবাঈ সেদিন অঝোর কান্নায় গিরিধারীলালের চরণ ধৌত করে গেয়েছিল ঃ

মাঈ মহাঁরী হরি না বুঝী বাত।
পিংড মাঁ সুঁ প্রাণ পাপী নিকসি ক্যুঁ নহীঁ জাত॥
রৈন অঁধেরী বিরহ ঘেরী তারা গিনত নিস্ জাত॥
পাট না খোল্যা মুখা ন বোল্যা সাঁঝ ভঈ পরভাত॥
অবোলণা জুগ বীতন লাগো তো কাহে কী কুসলাত।
লেকটারী কণ্ঠ সারুঁকারুংগী অপঘাত॥
আবণ আবণ কহি গয়ো হরী আবনহী কী বাত।
মীরা ব্যাকুল বিরহনী রে লালচ রহী লালচাত॥

সে গিরিধারীলালকে মনের আর্তি জানিয়ে বলেছিল ঃ হরি আমার কথা বুঝলেন না। শুনলেন না। এ দেহ থেকে পাপীপ্রাণ কেন বার হয়ে যায় না। গভীর রাতের তারা গুনেই আমার রাত কাটলো। বিরহ ঘিরে এলো। তবু দ্বার খুললো না। প্রিয়তম কথা বললো না। তার বাণী না শুনেই আজ আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

মীরার মন্দিরে গান চলছে। মীরা কান্নায় বার বার ভেঙ্গে পড়ছে। পাশে চম্পা, চামেলী আর উদাবাঈ। ওরাও কাঁদছে।

যাত্রার সময় হয়ে এলো। রাস্তায় মিছিলে মিছিল। সামনে ধনবতীবাঈ, কারমেতনবাঈ ও সমস্ত রাজপুতানী। মীরাকে ঘিরে মিছিল চলেছে সুরজকুণ্ডের দিকে।

সমবেত জনতা গাইছে ঃ

"রাণা মহাঁরো কাঁঈ করিছে, মীরা ছোড়দঈ কুললাজ।
বিষ প্যালা রাণাজী ভেজ্যা, মীরা মারণ কাজ॥
হঁসকে মীরা পী গঈ হৈ, প্রভু প্রসাদ পররাগ।
ডব্বা এক রাণাজী ভেজ্যো, উসমেঁ কারা নাগ॥
ডব্বা খোল মীরা জব দেখ্যো হৈ গয়ে সালিগরাম।
জৈ জৈ ধুনি সন্ত সভাভই, কৃপা করী ঘনশ্যাম॥
সজি সিংগার পগ বাঁধি ঘুঁঘরু দোকর দেতীতাল।
ঠাকুর আগে নৃত্য করতহী, গাবত শ্রীগোপাল॥
সাধু মোরে হস সাধুনকে, সাধু হমারে জীব।
সাধুন মীরা মিলিজো রহী হৈ জিমি মাখন মেঁঘীব॥"

চিতোরে এত বড় গানের মিছিল এর আগে কেউ কোনদিন দেখিনে। জনতা মীরাবাঈ-কে নিয়ে স্বরজকুণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে। স্বরজকুণ্ড মিছিলে আর জনতার অববুদ্ধ। মীরার গানে আকাশ-বাতাস মুখর।

রাণা বিক্রমাজিৎ এর কানেও সেদিন সে গান গিযে পেঁাছেছিল। রাণা বণবীর-কে ডেকে বলেছিল ঃ কী ব্যাপার! এতো গান কেন? এতো লোক কোথায় চলেছে?

বণবীর উত্তর দিয়েছিল ঃ স্বরজকুণ্ডের দিকে।

রাণা বিস্মিত হয়ে বলেছিল ঃ কেন?

বনবীর জবাব দিয়েছিল ঃ আজকে মীরাবাঈ-কে ডুবিয়ে মারবার দিন। চিতোরের সমস্ত মানুষ আজ মীরার ভজন গাহিতে গাহিতে সুরজকুণ্ডের দিকে এগিয়ে যাচেছ। মীরা রাজনীতিতে কিছু কম যায় না। চিতোরের সমস্ত মানুষকে সে আজ একজোট করে ফেলেছে। মীরা ইচ্ছা করলে যে কোন সময় গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে পারে।

ঃ কেন?

ঃ মীরা চিতোরের সমস্ত জনতাকে নিয়ে জোট বাঁধলে রাজ্যের বাইরের রাণারাও সুযোগ বুঝে মীরার সঙ্গে যোগ দিতে পারে। বিশেষতঃ বীরমদেবজী আর কুম্ভলগড়ের উদয় সিংহ। এরা জোট বাঁধলে বর্তমান রাণাকে নিশ্চিত অসুবিধায় পড়তে হবে। সঙ্গে হয়তো বাঁদীও এসে যোগ দিতে পারে।

ঃ হয়তো পারে। তবে মীরাবাঈ-এর আজ শেষ দিন। এতো অলীক স্বপ্ন না দেখলেও চলবে। এতোদিনে আমি কণ্টক শূন্য হবে।

ঃ হয়তো হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

রাণা বিস্মিত হয়ে বলেছিল ঃ কেন?

ঃ সুরজকুণ্ড মিছিলে অবরুদ্ধ। এই মিছিলের পুরোভাগে আছেন চিতোরের রাজমহিষীরা ও সমস্ত রাজপুতানীরা।

ঃ যেমন ?

ঃ যেমন, ধনবতীবাঈ, কারমেতণবাঈ, উদাবাঈ, চম্পা, চামেলী এবং আরও অনেকে।

বিক্রমাজিৎ সিংহ সে-দিন সে কথায় অত্যন্ত বিষন্ন বোধ করেছিল। বলেছিল ঃ আমার মায়েরাও তাহলে আজ মীরাবাঈ-এর পক্ষে। তাহলে-তাহলে আমি আর কী করতে পারি।

রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ নিজের ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

॥ আঠার ॥

যথা সময়ে রাণার কাছে খবর এল মীরাকে সুরজকুণ্ডের জলে ডোবাবার নানা ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সম্ভব হয়নি। মীরাবাঈ অলৌকিক শক্তিবলে এবং যোগ সাধনায় নিজেকে অনায়াসেই ভাসিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। মীরাকে জলে ডুবিয়ে মারা অসম্ভব। সমস্ত জনতা জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে সে-দিন মীরাবাঈ-কে মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল সমস্ত রাজপুতানীরা ও রাজমহিষীরা। চিতোরে সে-দিন ছিল আনন্দের দিন।

রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ সেদিন বলেছিলো ঃ আমি আজ কারো সঙ্গে দেখা করবো না। কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।

শোনা গিয়েছিল সে-দিন রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ তার নিজের জলসা ঘরের দরজা এঁটে বসেছিল। আর বনবীর শুধু হেসেছিল।

চিতোরে সে-দিন ছিল আনন্দের দিন। কিন্তু মীরাবাঈ মনে করেছিল সে-দিন ছিল তার সবচেয়ে অপমানের দিন। এমন অপমান সে জীবনে হয় নি। প্রকাশ্য জনতার সামনে অপমান। হাজার হলেও সে রাজমহিষী। চিতোরের কুলবধু। কিন্তু সে মর্যাদা সে-দিন বিক্রমাজিৎ সিংহ তাকে দেয় নি। সেই কারনেই সে-দিন মীরাবাঈ মনে মনে শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আর চিতোরে নয়। অন্যত্র। মীরাবাঈ আজও মনে করে যে সে-দিন সে সিদ্ধান্ত না নিলে তার হয়তো জীবনেও আর শ্রীবৃন্দাবনে আসা হতো না। সবই গিরিধারীলালের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাতেই সে-দিন সে শেষ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল এবং শ্রীবৃন্দাবনে আসার পথ সুগম হয়েছিল। অবশ্য সরাসরি নয়। মেড়তা ঘুরে। তবুও শ্রীবৃন্দাবনই ছিল তার শেষ লক্ষস্থল।

চিতোর ছাড়বার শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে মীরাবাঈ বীরমদেবজী ও জয়মলের সঙ্গে যোগাযোগ করে মেড়তার ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো।

মীরাবাঈ-এর পত্রের জবাবে সেদিন বীরমদেবজী লিখেছিলেন যে সব খবর তাঁরাও পাচ্ছেন। অতএব আর নয়। মীরা যেন পত্রপাঠ চলে আসার ব্যবস্থা করে।

মীরাবাঈ ও প্রস্তুত। এ অপমান আর সহ্য করা যায় না। সে-দিন চিতোরে আবার শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল যে মীরাবাঈ চিতোর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর ফিরবে না। বর্তমান রাণার অত্যাচার তাকে চিতোর ছাড়তে বাধ্য করলো। চিতোরে আর গিরিধারীলালের সেবা হবে না। সংগীত-সাধনা বন্ধ থাকবে।

মীরাবাঈ-এর আজও মনে আছে, সে-দিন চিতোরের বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা বলেছিলেন ঃ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার বন্ধ হলো। রাণা শাক্ত, শক্তির পূজারী। সুতরাং এখন থেকে শক্তির পূজাই চলতে থাকবে। মন্দিরে মন্দিরে তালা পড়বে।

মীরাবাঈ-এর চিতোর ত্যাগের খবর-টা বনবীর রাণার কানে তুলেছিল।

রাণা বলেছিল ঃ বেশতো ভালো। আপদ বিদায় হলো।

বণবীর বলেছিল ঃ তা' হলো বটে, তবে বর্তমান রাণাকে যথেষ্ট অপমান করে গেল। তেজ কমেনি একটুও।

রানার জবাব ঃ আমার করবার আর কিছু নেই। সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ঃ কিন্তু আমার কিছু করবার আছে।

বিস্মিত রাণা বলেছিল ঃ কী করবার আছে ?

ঃ মীরা যাত্রা করলে কিছু পরে, একদল সৈন্য পাঠিয়ে তাকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে গুম্ করে দেওয়া। অর্থাৎ একেবারে নিশ্চিহ্ন। কেউ জানতে পারবে না।

রাণা একটু চিন্তা করে বলেছিল ঃ সম্ভব হবে না। তবুও দেখো যদি পারো।

বনবীর হেসে চলে গিয়েছিল। ভেবেছিল যদি সত্যি এ কাজটা করা যায় তবে চিতোরে হয়তো সমস্ত জনতা রাণার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। আর ঠিক সেই সময় যদি মালদেবের একটু সাহায্য পাওয়া যায়, কিম্বা বঁদীর, তবে বর্তমান রাণাকে সরিয়ে নিজে রাণা হতে বেশী দেরী লাগবে না। দেখা যাক মীরাবাঈ-কে উৎসর্গ করে স্বর্গে বাস করা যায় কিনা।

বনবীর মীরাবাঈ-এর যাত্রার দিনটা লক্ষ্য রেখেছিল। বনবীরের নতুন পরিকল্পনার খবর-টা মীরাবাঈ-এর কাছে পেঁৗছে দিল তার দূত। শুধু পরিকল্পনা নয়, বনবীর ও রাণার মধ্যে কথোপকথন থেকে শুরু করে যাবতীয় সব। সব খবর মীরাবাঈ-এর হাতে চলে এলো। মীরাবাঈ সে-দিন বুঝেছিল যে পথে হয়তো বিপদ হতে পারে। তাই বীরমদেবজীকে লিখলো ঃ আমি এখান থেকে যাত্রা করছি। আপনি একদল সৈন্য পাঠান। পথে ওরা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। যদি অবশ্য প্রয়োজন পড়ে। কারণ পথে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

বীরমদেবজীর জবাব ঃ বেশ, তাই হবে।

নির্দিষ্ট দিনে মীরাবাঈ, চম্পা আর চামেলীকে নিয়ে মেড়তায় যাত্রা করলো। সে-কথা ভাবলে আজ মীরাবাঈ-এর কেমন যেন অবাক লাগে। কত উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে, জীবন বিপন্ন করে মীরাবাঈ সে-দিন মেড়তায় যাত্রা করেছিল। চিতোরের সাধারণ মানুষ কান্নায় ভাসিয়ে দিয়েছিল। মীরাবাঈ বুঝেছিল তাদের দেখবার আর

কেউ রইলো না। তাদের সুখ-দুঃখ, বেদনা-আনন্দের সাথী বলতে চিতোরে একজনই ছিল, সে মীরাবাঈ। এ-কথা মীরাবাঈ-এর নিজের নয়। জনসাধারণের। আজ তারা তাকেও হারালো। চিতোর সে-দিন শোকে মুহ্যমান। মীরাবাঈ প্রত্যেককে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলঃ আবার দেখা হবে। গিরিধারীলালের নিত্যপূজা যেন তারা চালিয়ে যায়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের যে কাজ সে করে গেল, তা যেন বন্ধ হয়ে না যায়। কিন্তু চিতোরের সাধারণ মানুষ জানতো যে, একাজ বন্ধ হবেই। রাণার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এ-কাজ করবার সাহস মীরাবাঈ ছাড়া চিতোরে দ্বিতীয় কারো নেই। সুতরাং ও পাঠ এবারে চুকবে। তবুও সে-দিন তারা মীরাবাঈ-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বলেছিল তারা চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

চিতোরে মীরাবাঈ-এর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেখে বনবীর আগেও অবাক হয়েছে, সে-দিনও হলো। মীরাবাঈ-কে সুয়জকুণ্ডের জলে ডুবিয়ে মারবার দিনে বনবীর দেখেছে মীরার প্রতি সাধারণ মানুষের কি ভালবাসা। কি দরদ। আর মীরাবাঈ-এর যাত্রা কালেও সে দেখলো। সারা চিতোর ভেঙ্গে পড়লো মীরার মন্দিরে। সকলেই মীরার পূজার প্রসাদ চায়। মীরার মুখের দুটো কথা শুনতে চায়। বনবীর সে-দিন ভেবেছিল, তারা লিখিত আদেশ দিয়ে যা' করতে পারে না, মীরাবাঈ মুখের কথায় তা করে দিতে পারে। প্রজাদের ভালবাসার রাস্তা মীরাবাঈ জানে, এ-কথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। যা' রাণার রাজসিংহাসনে বসে জানা সম্ভব নয়। চিতোরে রাজমহলে রাজমহিষী অনেকেই আছেন, কিন্তু মীরার মতো এতো প্রতিপত্তি কারো নেই। অথচ তাদের ঠাঁট্-ঠমক্ আছে। বিলাস-বৈভব আছে। রাজপ্রাসাদ আর রাজমহিষীর পদমর্যাদা আছে। মীরাবাঈ-এর এ-সব কিছুই নেই। তবুও সে অনন্যা। রাজমহিষীদের সঙ্গে মীরাবাঈ-এর তুলনাই চলে না।

বনবীরের সে-দিন মনে হয়েছিল, মীরাবাঈ ইচ্ছা করলে অনায়াসেই চিতোরের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে পারতো। বাইরের রাজ্যও তাকে সাহায্য করতো। কিন্তু বনবীর জানতো, মীরাবাঈ এ-সব কিছুই চায়নি। সে চেয়েছিল গিরিধারীলালের নিত্য সেবা আর গান। তবুও তাকে রাজনীতির জালে জড়িয়ে দাবা খেলা করা হলো।

বনবীর-সেদিন বার বার ভেবেছিল, মীরাবাঈ যদি তাকে একটু সাহায্য করতো, একটু সহযোগীতার হাত বাড়াতো, তবে তার রাণা হতে কোন অসুবিধা হতো না। সময় ও বেশী লাগতো না। কিন্তু বনবীর জানতো মীরাবাঈ-এর কাছে এ ধরনের সহযোগীতার আশা অলীক কল্পনা। বনবীর আরও জানতো মীরাবাঈ উদয় সিংহ-কে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। সে উদয়কে ভালবাসে। সুতরাং বনবীর বর্তমান রাণাকে সরিয়ে দিলেও মীরাবাঈ উদয়কে চেয়ে বসতো। সেটাই স্বাভাবিক। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের শেষ ছেলে উদয়। তার রাণা হওয়াটাই চিতোরের স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে পড়ে। চিতোরের সাধারণ মানুষ ও উদয়কেই চাইবে। যাই হোক, বনবীর তখন ভেবেছিল, মীরাবাঈ চলে যাবার পর সে

এগিয়ে যাবার আবার একটা নতুন পরিকল্পনা খাড়া করবে। এবং দেখবে কী দাঁড়ায়।

মীরাবাঈ চিতোর ছেড়ে চলে যাবার আগে বনবীরের এই ধরনের মানসিকতার খবর পেয়েছিল। তখন মীরাবাঈ-এর ও মনে হয়েছিল, বনবীর তাকে নিয়ে এতো চিন্তা না করলেও পারতো। কারণ মীরাবাঈ-এর চলা-ফেরা, কাজ কর্মে তার বোঝা উচিত ছিল যে সে কি চায়। আর আরাধ্য বস্তুটি কি? অবশ্য মীরাবাঈ সম্পর্কে তার যে, কোন ধারণা ছিল না তা' নয়, তার সঠিক ধারনাই ছিল। তবুও বনবীর চেয়েছিল মীরাবাঈ-কে রাজনীতির জালে জড়িয়ে তার ভবিষ্যত গড়ে তুলতে। মসনদের মুনাফা লুটতে। যা' মীরাবাঈ বনবীরকে করে দিয়ে যেতে পারে নি।

চিতোর ছাড়ার আগে মীরাবাঈ বনবীর সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিল যে, বনবীর যদি তাকে নিয়ে রাজনীতি না করতো, যদি বিক্রমাজিৎ সিংহকে তার সম্পর্কে অকারণ মিথ্যা না বোঝাতো এবং সবশেষে যদি বণবীর মীরাবাঈ-কে কেন্দ্র করে চিতোরের মসনদের স্বপ্ন না দেখতো, তাহলে আজকে তাকে এমন অনাদ্রিতা ও উপেক্ষিতা হয়ে চিতোর ছেড়ে চলে যেতে হতো না। যদিও চিতোরের সাধারণ মানুষ ও সাধু-সন্তেরা তার চলে যাবার শোকে মুহ্যমান। তবুও মীরাবাঈ জানে যে তার আজ এই বিদায়ের দিনে চিতোরের রাজপরিবারের কোন মানুষ তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবে না। কোন রাজকীয় আয়োজন হবে না। সাধারণ মানুষের আড়ম্বরহীন নির্মল নির্মাল্য ও নিবেদনের মধ্যেই তাকে বিদায় নিতে হবে। এবং মীরাবাঈ সে-দিন তাই নিয়েছিল।

নির্দিষ্ট দিনে মীরাবাঈ, চম্পা আর চামেলীকে নিয়ে মেড়তায় রওনা হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে গানের মিছিল! চিতোরের শুভানুধ্যায়ী জনতা। ঠিক হয়েছিল, ওরা মীরাবাঈ-এর সঙ্গে কিছু পথ যাবে। পরে ফিরে আসবে। তারপর মীরা, চম্পা আর চামেলী শেষ পথটুকু পাড়ি দেলে। সঙ্গে কিছু লোকজন।

মীরাবাঈ চিতোর ত্যাগের বেশ কিছুক্ষণ পরে বনবীর একদল সৈন্য পাঠালো। আদেশ, মীরাকে তড়িতে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে গুম-খুন করা। পরে রটিয়ে দেওয়া, মীরাবাঈ-কে পাওয়া যাচ্ছে না। সে অন্য কোথাও চলে গেছে। হয় বৃন্দাবনে, নয় দ্বারকায়।

বনবীরের পরিকল্পনা মীরাবাঈ-এর জানাই ছিল। সেই কারণে সে-দিন মীরাবাঈ-ও ভয়ানক ভাবে সতর্ক ছিল। সে সঙ্গে নিয়েছিল ধারালো তলোয়ার আর বিষ। মীরাবাঈ-এর দৃঢ়বিশ্বাস বনবীর তাকে হাতের মুঠোয় আনতে পারবে না। সে মেড়তায় তার দাদু দুদার কাছে মানুষ। দুদা তাকে আর জয়মলকে আসি চালনা, ঘোড়ায় চড়া আর পাকা তীরন্দাজ করে গড়ে তুলেছিলেন। যদিও দীর্ঘদিন সে-সব কোন কাজে লাগেনি। তবুও ভুলে যায়নি মীরাবাঈ। আজ প্রয়োজন হলে কাজে লাগবে। নতুবা বিষ প্রয়োগে আত্মহত্যা। কিন্তু

তবুও বনবীরের কাছে সে নতি স্বীকার করবে না। সে-দিন চলার পথে মীরাবাঈ-এর এই ছিল শপথ।

খবর এলো, বনবীরের সৈন্য এগিয়ে আসছে। মীরাবাঈ-ও প্রস্তুত। কিন্তু তার সে-দিনের সে-প্রস্তুতের কোন প্রয়োজন হয়নি। বনবীরের সৈন্যেরা এগিয়ে আসতে, বীরমদেবের সৈন্যেরাও এসে পড়লো। পথে মুখোমুখি দেখা। বনবীরের সৈন্যেরা পালিয়ে গেল। মীরাবাঈ সুস্থ শরীরে মেড়তায় পেঁাছে গেল।

॥ উনিশ ॥

মীরার কপালে শান্তি নেই। সে-দিনও সে সুস্থ মনে বসতে পারেনি। মেড়তায় পেঁাছে-ও গিরিধারীলালের সেবায় মন দিতে পারে নি। যেখানেই যায় বিপদ ঘনিয়ে আসে। এখানে-ও এলো। মীরাবাঈ এখানে এসেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের কাজে নামলো। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে চাইলো। তাদের সঙ্গে নিয়ে গিরিধারীলালের প্রকাশ্যে মন্দির গড়ে, তার পুজো শুরু করতে চাইলো। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মীরাবাঈ সে-দিন মিশে যেতে চেয়েছিল।

কিন্তু মীরাবাঈ-এর কপাল মন্দ। সে-দিন তা' হয়নি। সে-দিন বীরমদেবজী নিজেই আপত্তি তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ তা' হতে পারে না। তুমি একদিকে মেড়তা-কন্যা। অপর দিকে রাজকুলবধু। তোমার মান-সম্মান জ্ঞান রেখে চলতে হবে। তোমার চলা-ফেরা সীমানায় বাঁধা থাকবে। তা' না হলে এখানেও যেমন তোমার দুর্নাম রটবে, তেমন চিতোর থেকেও আপত্তি উঠতে পারে। কারণ এ ব্যাপারে তাদেরও মান-সম্মান জড়িত। সুতরাং তুমি রাজপ্রসাদের ভেতরের মন্দিরে পুজো দেবে। বাইরের মন্দিরে যাওয়া চলবে না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ রাখতে হবে। এ-কাজ 'রাজ্যের সম্মানের জন্যেই করা প্রয়োজন। তা' না করলে বংশের সম্মান ছোট হয়ে যাবে।

আজও মনে আছে, মীরাবাঈ সে-দিন জবাব দিয়েছিলঃ গিরিধারীলালের কাছে সবাই সমান। তাঁর কাছে বড়-ছোট বলে কিছু নেই। দেশের সাধারণ ভক্ত, যারা গিরিধারীলালের পুজো দিতে আসবে, সেবা করতে আসবে, তাদের বাইরে রেখে আমার নিত্য-সেবা বৃথা। আমি এ-কাজ করতে পারবে না। আমায় মাফ্ করবেন।

মারাবাঈ-এর কথা শুনে বীরমদেবজী সেদিন একটু উত্তেজিত হয়েই বলেছিলেনঃ কিন্তু রাজ্যের সম্মান, রাজ্যের মর্যাদার কথা আগে ভাবতে হবে।

মীরাবাঈ জবাব দিয়েছিলঃ রৈদাস জাতিতে চামার। আমি রাজপুতানী, রাজকুলবধু হয়েও তার কাছে দীক্ষা নিয়েছি। তাঁর মন্ত্রই ছিল; সাধারণ মানুষকে ভালবেসে কাছে টানা। তিনি বলতেন; সাধারণ মানুষই ভগবান। গুরুনানক, কবীর, তুলসীদাস, বড়ুচন্ডীদাস, তাঁদের বাণীও এক। তিনি

বলতেন ; সাধারণ মানুষের মধ্যে জীবনবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। স্বৈরাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে জোট বাধতে হবে। আমি মনে করি আমায় গিরিধারীলাল সর্বত্র অবস্থান করছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যেও তিনি রয়েছেন। সুতরাং তাদের বাদ দিয়ে নিষ্প্রাণ পুজোয় আমাকে বসতে বলবেন না।

জয়মল পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বলেছিল ঃ আমি নিজে বাইরে একটা মন্দির করে দেব। গিরিধারীলালের নিত্য-সেবা সেখানেই হবে।

মীরা জবাব দিয়েছিল ; আমি যেখানে বসে গান গাইবো, সেটাই আমার মন্দির জয়মল। আমায় জন্যে আর আলাদা মন্দির তৈরী করতে হবে না।

বীরমদেবজী সে-কথা শুনে তার পুত্র জয়মলের দিকে বেশ কঠোর ভাবে একবার তাকিয়ে, ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

লাগলো ঠোকাঠুকি। মীরাবাঈ বুঝেছিল, এখানেও তার থাকা চলবে না। চিতোরের রাণাদের অত্যাচারে তাকে চিতোর ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু সেখানে সাধারণ মানুষ তার পাশে ছিল। এখানে জ্যেষ্ঠতাতের অসন্তোষ আর অসম্মানের জন্যে, সাধারণ মানুষ তার নাগালেই আসতে পারছে না। সে মেড়তীয়া কন্যা হয়েও আজ তাকে মেড়তা ছাড়তে হবে।

তবে মীরাবাঈ বুঝেছিল যে জয়মল তার মন বুঝতে পেরেছে। হাজার হোক তারা দু'জনে একসঙ্গে মানুষ। জয়মল সে-দিন মীরাবাঈ-কে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলেছিল ; আমি বাইরে মন্দির করে দিচ্ছি। গিরিধারীলালের নিত্য-সেবা সেখানেই হবে। মেড়তা ছেড়ে যাবার কোন প্রয়োজন নেই।

মীরাবাঈ জয়মলের কথা শুনে সে-দিন হেসে বলেছিল ঃ পুত্র হয়ে পিতার বিরুদ্ধে যেও না জয়মল। অন্যায় হবে। মেড়তায় আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি এখন বৃন্দাবন যাত্রা করবো। গিরিধারীলালের পীঠস্থান। আমি এখন থেকে ওখানেই বাস করবো। চিতোরের কুটিল রাজনীতি, স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, কোলাহল, হলাহল আর রাজমহিষীদের প্রভাব জাহিরের কোন্দল এ-সবই দেখলাম। মেড়তায় রাজা ও প্রজাদের মধ্যে আকাশ-জমিন ফারাকও দেখছি। এর মধ্যে আমি আর নিজেকে জড়াতে চাই না। আমি এখন সমস্ত কোলাহলের বাইরে শান্তিতে সাধনায় বসতে চাই। তোমার সঙ্গে আমার সারা জীবন যোগাযোগ থাকবে। তুমি আমার ভাই। আজ তুমি ছাড়া আমায় আপনার বলতে কেউ নেই। তোমাকে আমি ভুলতে পারি না। তবে একটা কথা জেনে রেখো জয়মল, দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখে-কষ্টে তাদের পাশে এসে না দাঁড়ালে, দেশের বিপদের সময়ও তারা দাঁড়াবে না। আর তারা যদি পাশে এসে না দাঁড়ায়, তবে রাজত্ব করা যাবে না। রাজ্য রক্ষা করাও যাবে না। সৈন্য দিয়ে রাজ্যবিস্তার করা চলে, কিন্তু রাজ্য চালাতে গেলে লাগে সাধারণ মানুষকে। আমার জ্যেঠামশাই সেটা জানেন না। কিন্তু তুমি এ-কথাটা মেনো। তাহলে তোমার ভালই হবে।

জয়মল সে-দিন মীরাবাঈ-এর কথায় স্বীকৃতি জানিয়েছিল। মীরাবাঈবলেছিল ঃ শ্রীবৃন্দাবনের ভক্ত সনাতনকে একখানা পত্র লিখে দাও। ও এসে আমাকে নিয়ে যাক।

ও আমার পুত্রের মত। আমার আদর্শে বিশ্বাসী। আমি আপাততঃ সেখানে গিয়েই উঠবো। তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো।

তারপরেই মীরাবাঈ-এর শ্রীবৃন্দাবনে আগমন এবং বাস। পরে মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে গিরিধারীলালের নিত্যসেবা ও সঙ্গীত পরিবেশন। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর স্থিতি! কিন্তু তবুও মন মানে কৈ। এখানে চলে আসার পরেই মীরাবাঈ খবর পেল যে, মেড়তায় দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে চিতোরেও। মালদেব রাওগঙ্গাকে হত্যা করে নিজে রাজা হয়ে বসেছে এবং তার কিছুকাল পরেই সৈন্য নিয়ে মেড়তা রাজ্য দখল নিয়েছে। রাজ্যের এই দুর্দিনে মেড়তার সাধারণ মানুষ বীরমদেবজীর পাশে এসে দাঁড়ায়নি। খবর এখানেই শেষ নয়। খবর এলো বিক্রমাজিৎ সিংহ নাকি এতে খুশি হয়েছিল। কিন্তু সে বোঝেনি যে তার খুশি হবার কোন কারণ নেই। তারও বিপদ আসন্ন। চিতোরের শাসন-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার মতো। বনবীরের বিরুদ্ধে চারিদিক থেকে আবার অভিযোগ উঠছে। অযোগ্যতা, দুর্নীতি, অত্যাচার ও অবিচার। রাজ্যের কোন প্রজা তাকে চায় না। বনবীর অবস্থা বুঝে রাজনীতির নেপথ্যে সরে দাঁড়িয়েছে। নতুন রাজপ্রতিনিধি ধনবতীবাঈ। ধনবতীবাঈ-এর প্রতি মীরাবাঈ-এর ধারণা মোটামুটি ভালই। কারণ এই মহিলা সরাসরি মীরাবাঈ-এর বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। বরং সহযোগীতায়ই করে এসেছেন। বিক্রমাজিৎ সিংহ মীরাবাঈ-এর প্রতি যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল, ধনবতীবাঈ-এর তা'তে সমর্থন ছিল না।

শ্রীবৃন্দাবনে বসে মীরাবাঈ খবর পেল যে, ধনবতীবাঈ রাজপ্রতিনিধি হয়ে শাসন-ব্যবস্থায় হাত লাগিয়েছেন এবং চিতোরকে শক্তিশালী করবার চেষ্টা করছেন। কথাটা শুনে মীরাবাঈ-এব ভালই লেগেছিল। কিন্তু ধনবতীবাঈ-এর কপাল মন্দ। কাজের শুরুতেই বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করে বসলো। সঙ্গে অগণিত সৈন্য। মালদেব সৈন্য পাঠালো না। বংদী সরে দাঁড়ালো। সে-দিন চিতোরের বেশীরভাগ সর্দারকে বাহাদুর শাহ পয়সা দিয়ে কিনে রাখলো। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখলো, কিন্তু যুদ্ধ করলো না। বাহাদুর শাহ সুযোগ বুঝে সৈন্য দিয়ে চিতোর অবরোধ করে রাখলো। বিক্রমাজিৎ সিংহ বিপদ বুঝে চিতোর ছেড়ে পালালো। দীর্ঘদিন চিতোর অবরোধ থাকার ফলে চিতোরের রসদ ফুরিয়ে গেল। বাইরের যোগাযোগ বন্ধ। এখন হয় যুদ্ধ, নয় অনাহারে মৃত্যু। রাণারা কেউ নেই। সেনাপতি অথবা সর্দার বলতে কেউ নেই। চিতোরে নামমাত্র সৈন্য জমা। ওদের পক্ষে কিছু করা অসম্ভব। তবুও সমস্ত রাজপুতানীরা নিজেদের মান-সম্মান রক্ষার জন্যে জোট বাঁধলো। একত্রিত হয়ে দাঁড়ালো, ধনবতীবাঈ, কারমেতনবাঈ এবং আরও শত শত রাজপুতানীরা। তারা তলোয়ার হাতে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো। খবর শুনে মীরাবাঈ স্তম্ভিত হয়েছিল। গর্বে তার বুক ভরে গিয়েছিল। ভেবেছিল চিতোরের মহিলা-মহলে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা মুক্তিপ্রাণা মহিলা। স্বদেশ-বোধ তাঁদেরও আছে। মীরাবাঈ এতোদিন তাঁদের যে ভাবে দেখে এসেছে, অথবা ভেবে এসেছে, আজ তা' মিথ্যা প্রমাণিত হতে চলেছে। মীরাবাঈ এতে

খুশি। আনন্দিত। কারণ তাঁদের সম্পর্কে বহুদিনের ধ্যান-ধারণা আজ ভেঙ্গে যাচ্ছে। মীরাবাঈ এতদিন ভেবে এসেছে যে, এই সব মহিলা-মহলের রাজমহিষীরা শুধু বিলাস বৈভবেই দিন কাটাতে ভালবাসে। যাইহোক তলোয়ার হাতে সমস্ত রাজপুতানীরা বাইরে বেরিয়ে আসতেই সৈন্যেরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ধনবতীবাঈ, কারমেতনবাঈ এবং আরও হাজায় হাজার রাজপুতানী চিতোর গড়ের সামনে প্রাণ দিল। শত শত রাজপুতানী জহব ব্রত পালন করলো। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখলো। চিতোর শ্বশান হয়ে গেল। রাজাহীন রাজ্য, শ্বশানের নিস্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বাহাদুর শাহ চিতোরের সমস্ত ধন-দৌলত নিঃশেষ করে লুটে নিয়ে গেল। চিতোবের দৌলত-খানা ফাঁকা পড়ে রইলো। ফিরে যাবার পথে খবর এলো, গোয়া এবং পর্তুগীজেরা গুজরাট আক্রমণ করেছে। বাহাদুর শাহের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। সর্বনাশ! রাজ্য সম্পূর্ণ অরক্ষিত। সৈন্য-সামন্ত সব লড়াইয়ে চলে এসেছে। বাহাদুব শাহ ছুটলো নিজের রাজ্য সামলাতে।

অনেক পরে মীরাবাঈ খবর পেয়েছিল যে, বিক্রমাজিৎ সিংহ নিষ্প্রাণ চিতোরে ফিরে এসেছে। চিতোর ফাঁকা শ্বশান। মায়েরা কেউ বেঁচে নেই। শত শত রাজপুতানী ও রাজমহিষীরা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। আর নয় তো জহর ব্রত করেছে। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে। আছে শুধু মাত্র বনবীর। কিছু সাধারণ প্রজা।

মীরাবাঈ চিতোরে থাকতেই বিক্রমাজিৎ সিংহ চিতোরের রাণা। কিন্তু আজ তার অভিভাবকহীন জীবন। পরিপূর্ণ অসহায়। বর্তমানে তার সুখ-দুঃখের খবর নেবার বেউ নেই। প্রাণহীন বিরাট প্রাসাদে নিঃসঙ্গভাবে পাইচারী করতে করতে বিক্রমাজিৎ-এর চোখেও নাকি আজকাল জল আসে।

মীরাবাঈ-এর অনেক চোখের জলের জন্যে বিক্রমাজিৎ সিংহ দায়ী। মীরাবাঈ কে অনেক দুঃখ সে দিয়েছে। লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার শেষ পর্যায়ে তাকে নামিয়ে এসেছিল বিক্রমাজিৎ সিংহ। কিন্তু তবুও বিক্রমাজিৎ-এর বর্তমান অবস্থার জন্যে মীরাবাঈ আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। তবুও নিয়তিকে মানতেই হয়। গতিশীল জীবনকে স্বীকার করে নিতেই হয়। একদিন মীরাবাঈ-এর ওপর বিক্রমাজিৎ-এর অত্যাচার যেমন সত্য ছিল, আজ তেমনই বিক্রমাজিৎ-এর পঙ্গু জীবনও সত্য। মহাকালের অমোঘ অশনি-সংকেত।

শ্রীবৃন্দাবনে এসে মীরাবাঈ বার বার চিতোরকে দূর থেকে দেখেছে আর মনে হয়েছে যে চিতোর আজ ইতিহাস হতে চলেছে। অতীতের শৌর্য্য-বীর্য্য, যুদ্ধ আর মুখর জীবনের খবর বহন করে নিজে একদিন একা দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু মীরাবাঈ জানে, চিতোরে এমন দিন ছিল না। বিক্রমাজিৎ-এর পিতার আমলে এ চিতোর ছিল মুখর। মহারাণা সংগ্রামসিংহ, ভোজরাজ, রতণসিংহ, বিক্রমাজিৎ সিংহ উদাবাঈ' উদয় আর এদিকে মহারাণার তিনরাণী। তারপর হাজার রাণা, সর্দার আর হাজার রাজপুতানীতে এ চিতোর ছিল মুখর। কুটিল রাজনীতি, যুদ্ধ আর তার পরিকল্পনার কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে মহারাণাকে। মহারাণাকে

মোটামুটি ভাবে সারাজীবনে আঠাবো বার যুদ্ধ করতে হয়েছে এই চিতোরের স্বাধীনতা রাখবার জন্যে। মালদেব, সুরজমলের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে হয়েছে এ চিতোর সুরক্ষিত রাখবার জন্যে। তারপর ধীরে ধীরে আকাশে কাল মেঘ জমা হতে শুরু করেছে। মহারাণার মৃত্যু হলো। চিতোরের আকাশে কাল মেঘের জমাটি আরও বাড়লো। উত্তরকালে চিতোরের ইতিহাস শুধু পরাজয় আর মৃত্যু। মহারাণার পরে যত যুদ্ধ গেছে, সবই পরাজয়ের ইতিহাস বহন করেছে। সবাই চলে যেতে, আজ এসে দাঁড়িয়ে বিক্রমাজিৎ একা। নিষ্প্রাণ ইতিহাস-কলঙ্কিত চিতোরের রাণা। বাহাদুর শাহের চিতোর আক্রমণ সে'ও সামলাতে পারেনি। হাজার হাজার রাজপুতানী আর মায়েদের একা ফেলে চিতোর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। মীরাবাঈ-এর বারবারই মনে হয়েছে যে মহারাণার পুত্র হয়েও বিক্রমাজিৎ সিংহ পিতার কিছুই পায়নি। পিতার উপযুক্ত পুত্র যদি সে হতে পারতো, তবে আজ চিতোর শ্বশান হয়ে যেত না। মীরাবাঈ খবর পেয়েছে যে জলসাঘরের জাফরীকাটা জানালায় দাঁড়িয়ে বিকেলের সূর্য্য-ডোবা লাল আকাশখানার দিকে তাকিয়ে বিক্রমাজিৎ সিংহ নাকি আজকাল প্রায়ই চোখের জল ফেলে।

মীরাবাঈ খবর শুনে খুবই দুঃখিত হয়েছিল। বিক্রমাজিৎ-এর অত্যাচারের কোন ক্ষমা নেই। কেউ ক্ষমা করবে না। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মে ক্ষমাই মহৎ গুণ। মীরাবাঈ-বৈষ্ণবী। যৌবনে যোগীনী। স্তুতরাং ক্ষমা তাকে করতেই হয়। বিক্রমাজিৎ সিংহ যতই অপরাধ করুক, তবুও ক্ষমার মঙ্গল স্পর্শে তাকে পবিত্র করতেই হয়।

॥ কুড়ি ॥

শ্রীবৃন্দাবনে মীরাবাঈ-এর জীবন ভালই কাটছিল। মীরা ভাবলো, এতদিনে গিরিধারীলাল মুখ তুলে তাকিয়েছেন। এখানে সে শান্তিতে গিরিধারীলালের নিত্যসেবা করতে পারছে। সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে, সমস্ত সাধারণ মানুষকে নিয়ে, সে আজ ঠাকুরের গান গাইতে পারছে। গান রচনা করতে পারছে। সকলকে শোনাতে পারছে। রাজবংশের বাধা বলতে কিছু নেই। যেটা চিতোরে বা মেড়তায় সে পায়নি। জেষ্ঠতাত বীরমদেবজীর কাছে মীরা এটা আশা করেছিল। কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মীরাবাঈ আশ্রমের চত্বরে বসে আপনমনে গান গায়। সেই গান শুনতে বহু লোকের সমাগম হয়। সকলেই মীরার গানে ধন্য ধন্য করে। মীরাবাঈ-এর ভক্তি আর বিশ্বাস দেখে সকলে অবাক হয়। মাঝে মাঝে রৈদাস কে মনে পড়ে। মীরাবাঈ-এর মন্ত্রগুরু। রৈদাস বলতেন ঃ আত্মদান গুরুই সদ্‌গুরু। রৈদাস জাতিতে

চামার হলেও আত্মজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। কথায় বলেঃ গুরোঃ পরতরং নাস্তি, তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্‌ গুরুম্‌। ভব ব্যাধির চিকিৎসার জন্যে সদ্‌গুরু তুল্য আর বৈদ্য নেই। মীরাবাঈ বার বার ভেবেছে, আমি সেই পরম গুরুর আশ্রয়েই থাকবো।

এই ভাবনার অভ্যাস-যোগে নিজেকে যুক্ত করতে করতে একদিন মীরাবাঈ উদ্ধব কুণ্ড দর্শন করতে চলে গেল। সেখানে গিয়ে একটি বৃক্ষমূলে বসে কৃষ্ণের ভাবাবেশে গান গাইতে লাগলো।

"আলী সাঁবরো কী দৃষ্টি, মানো প্রেম কী কটারী হৈ।
লাগত বেহলী ভাই, তনকী সুধি বুধি গাই,
তনমন ব্যাপো প্রেম মনো মতবারী হৈ।
সখিয়াঁ মিলি দুই চারি, বাবরী সী ভাই ন্যাবী
হে'ঁ তৌ বাকো নাকো জানো কুংজ কো বিহারী হৈ।
চংদ কো চকোর চাহে, দীপক পতঙ্গ দাহে
জল বিনমীন জৈসে তৈসে প্রীত প্যারী হৈ॥
বিনতী করোঁ হে শ্যাম, লাগো মৈঁ তুমাহারে পাস
মীরা প্রভু এসে জানো দাসী তুমহাঁবী হৈ॥"

মীরাবাঈ ভাবাবেশে গান গেয়ে যেতে লাগলো। তাকে ঘিরে ভীড় জমতে লাগলো। মীরাবাঈ-এর ভাব সমাধি দেখে মানুষে অবাক। এমন দৃশ্য তারা আগে কখনও দেখেনি। মুগ্ধ মানুষের মধ্যেও কিছু গুঞ্জন। কিছু কথা। কিছু বিরূপ মন্তব্য। এই মন-মাতানো সংগীত পরিবেশনের মধ্যেও অনেকে বলতে লাগলো, মীরাবাঈ রাজকুলবধূ। বিধবা। তার একি চাল-চলন। দিনরাত সাধুসন্ন্যাসীদের নিয়ে থাকা। তাদের মধ্যে বসে গান গাওয়া। যেখানে সেখানে একা একা ঘুরে বেড়ানো। নানা লোকের সঙ্গে মেলামেশা।

মীরাবাঈ-এর গান শেষ হতে সে আশ্রমে ফিরে এলো। কিন্তু গুঞ্জন শেষ হল না। বিরূপ-মন্তব্য তার পিছু পিছু ধাওয়া করতে লাগলো। এ ধরনের সমালোচনা আগেও হয়েছে। মীরাবাঈ শুনে খুব্ধ হয়েছে। কিন্তু তারপরেই আশ্রমিকাদের ভালবাসায় এবং আন্তরিকতায় সে-সব কথা ভুলে গেছে। ভেবেছে ও কিছু নয়। সমস্ত শুভ কাজের পেছনেই একটা অশুভ ছায়া অনুসরণ করে। পরে সেই অশুভ ছায়া শুভ শক্তির কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সুতরাং তার সম্পর্কে এই গুঞ্জন অথবা বিরূপ মন্তব্য একদিন স্বাভাবিক ভাবেই পরাভূত হবে। কিন্তু এবারের আসরের গুঞ্জন ও মন্তব্য তাকে বেশ চিন্তিত করে তুললো। কারণ সে বুঝলো যে এই ধরনের আলোচনা শেষে রসালো রূপ নিয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরবে। বৃন্দাবনে এসে একদিকে যেমন তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বেড়েছে, ভক্তবৃন্দের ভালবাসা প্রসারিত হচ্ছে, অপর দিকে বিরূপ মন্তব্য এবং সমালোচনার প্রসারতাও কিছু কম হচ্ছে না। সেই কারণেই মীরাবাঈ-এর মাঝে মাঝে মনে হয় যে হয় তো এখানেও তার জায়গা হবে না। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের লীলানিকেতনেও

একদিন হয় তো তার ঠাঁই হবে না। তখন সে যাবে কোথায়? সে মেড়তা-কন্যা হয়েও মেড়তা তাকে জায়গা দেয়নি। চিতোর তার যৌবনের লীলাভূমি হয়েও রাণাকুলের অত্যাচারে চলে আসতে হয়েছে। এখন শেষ পথ শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ-বিহারীর লীলানিকেতনে নিশ্চিত আশ্রয়। এটাও যদি ছাড়তে হয়, তাহলে? এই চিন্তা মীরাবাঈ-কে মাঝে মাঝেই চিন্তিত করে তোলে। মর্মে মর্মে পীড়িত করতে থাকে। তবুও মীরাবাঈ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে স্মরণ নিয়েছি। তিনি যেখানে নিয়ে যাবেন, যেখানে ঠাঁই দেবেন, সেখানেই আমার ঘর।

শ্রীবৃন্দাবনে মীরাবাঈ কে নিয়ে যখন চারিদিকে কৌতূহল-কৌতুকের গুঞ্জন, তখনই একদিন অবিশ্বাস্য ভাবে বিক্রমাজিৎ সিংহের দূতের আবির্ভাব ঘটলো। আজকে এ-কথা ভাবলে মীরাবাঈ-এর মন বেদনায় ভরে ওঠে। কিন্তু সে-দিন সে অবাক হয়েছিল। এমন কথা সে জীবনেও ভাবেনি। কল্পনাতেও আনেনি। বিক্রমাজিৎ সিংহ সে-দিন তাকে চিতোরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তাকে নাকি চিতোরের খুব প্রয়োজন। সাধারণ প্রজারা তাকে চাইছে।

আজও মনে আছে, মীরাবাঈ সেদিন চিঠিখানা বার কয়েক মন দিয়ে পড়েছিল। একটু চিন্তাও করেছিল। তারপর দূতকে জবাব দিয়েছিল যে সে যাবে না। যেতে ইচ্ছুক নয়।

দূত তখন বেশ বিনয়ের সঙ্গেই বলেছিল : রাণাজীর হুকুম মাইজী।

মীরাবাঈ রেগে গিয়ে তার জবাব দিয়েছিল : রাণাজী আমাকে ধরে নিয়ে যাবে নাকি। আমি রাণাজীর অধীনে বাস ও করি না। চাকরিও করি না। সুতরাং তুমি যেতে পার।

দূত বলেছিল : কিন্তু আমি চাকরি করি মাইজী। আমি নোকর আছি। আপনি আমার প্রতি বিরূপ না হয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন। আমি আবার দু'দিন পরে আসবো।

মীরাবাঈ সে-দিন ভেবেছিল, শ্রীবৃন্দাবনের শ্যামকুঞ্জে সে বাসা বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু কপাল মন্দ। এখানেও তার সমালোচনায় লোকে মুখর হচ্ছে। অবশ্য যদিও গিরিধারীলালেয় নিত্যসেবার মন্দিরে ভক্তের ভীড় কিছু কম হচ্ছে না। গানের আসর ও মানুষ-জনে পূর্ণ থাকছে। সকলেই তাকে ভক্তি-ভালবাসায় ভরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তবুও—

মীরাবাঈ-এর মনটা কেমন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার বারবারই মনে হয়েছিল, বিক্রমাজিৎ সিংহ তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। ভারী অদ্ভুত! এই বিক্রমাজিৎ সিংহ-ই একদিন তাকে অত্যাচারে জর্জরিত করে তুলেছিল। যার ফলে সে চিতোর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। আজ আবার সে'ই দূত পাঠিয়েছে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। তাহলে কি বিক্রমাজিৎ-এর আবার নতুন করে মানসিক পরিবর্তন এলো? হতেও পারে। আজ চিতোরে কিছু নেই। কেউ নেই। নিঃসঙ্গ বিক্রমাজিৎ সিংহ তাই হয়তো আবার তাকে স্মরণ করেছে। তার ভুলের প্রায়শ্চিত করবার জন্যে। তার ভুলের অনুশোচনা প্রকাশ করবার জন্যে। তা' হতেও পারে। মানুষের

পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে মানুষের পরিবর্তন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিক্রমাজিৎ সিংহ তার স্বভাব পালটিয়ে ফেলেছে। সে মানুষ হয়েছে, এ-কথা ভাবতে মীরাবাঈ-এর সেদিন ভারী ভাল লেগেছিল। তাই সে মনে মনে ভেবেছিল, আবার চিতোর। তার শ্বশুর, তার স্বামীর ঘর। সে রাজকুলবধূ, রাজমহিষী, চিতোর তার শ্বশুর বাড়ী। অনেকদিন পরে মীরাবাঈ-এর আবার নতুন করে তার স্বামী শ্বশুর-কে মনে পড়েছিল। ভোজরাজ এবং মহারাণা সংগ্রাম সিংহ। এরা দু'জন শুধু পিতা-পুত্রই ছিলনা। গুরু-শিষ্য ও বলা যেতে পারে। চিন্তায়-ভাবনায়, পাণ্ডিত্যে, বীরত্বে আর আচার ব্যবহারে ভোজরাজ তার পিতার সবটুকুই পেয়েছিল। রাজনীতিতে তার জ্ঞানও ছিল পিতার মতই স্বচ্ছ। পিতার মত সে-ও চিতোবে সর্ব-ধর্ম সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিল। চিতোরের সকল রাজপুতরাই শাক্ত, শক্তির উপাসক। কালিকা দেবীর পূজারী। কিন্তু তা' সত্ত্বেও মহারাণা সংগ্রাম সিংহের আমলে, অথবা ভোজরাজের জীবদ্দশায়, বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভের অনেক সুযোগ হয়েছিল।

এ-সব কথা ভাবলে মীরাবাঈ-এর চোখে আজও জল আসে। সে এ-সব কথা ভাবতে চায় না। চিন্তা করতে চায় না। কিন্তু সে-দিন বিক্রমাজিৎ-এর দূত অতীতের বেদনাময় স্মৃতি গুলোকে টেনে নামিয়ে এনেছিল। মীরার মত শ্বশুর আর স্বামীর-ও স্বপ্ন ছিল তামাম হিন্দুস্থান একত্রিত করে এক ধর্ম রাজ্যে পরিণত করা। এটা মীরাবাঈ-এর দীর্ঘদিনের বাসনা। এ প্রস্তাবে ভোজরাজ এবং শ্বশুরেরও স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু আজ তারা কোথায়? চিতোরেব ইতিহাসে আজ তারা শুধুমাত্র অতীত স্মৃতি। তারপর রাজমহিষীদেব মধ্যে রতণ কুঁয়র ঝালী, কুঁয়রবাঈ, ধনবতীবাঈ, কারমেতন-বাঈ, এঁদের নিজেদের স্বার্থের কোন্দল চিতোরে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং তাতে যোগ দিয়েছিলেন মালদেব, সুরজমল। কিন্তু চিতোরের অন্যান্য রাজপুরুষদের মত তাঁরাও আজ কোথায় মিলিয়ে গেছেন। তাঁদের পদধ্বনি আজ আর শোনা যায় না। কিন্তু স্বার্থের বিষাক্ত নিশ্বাস আজও চিতোর বয়ে বেড়াচ্ছে। এঁদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব আজ অজ চিতোরকে ফাঁকা করে দিয়েছে। চিতোর আজ নিঃসঙ্গ একা দাঁড়িয়ে। গুজরাটের বাহাদুর শাহ শেষ করে দিয়ে গিয়েছে। মীরাবাঈ-এর সে-দিন মনে হয়েছিল যে, চিতোরের ভগ্নস্তূপের ওপর বিক্রমাজিৎ সিংহ একা দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে। দূত পাঠিয়েছে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু সে গিয়ে কী করবে? কাজ যা' ছিল সব শেষ। আজ আর নতুন করে সেখানে করবার কিছুই নেই।

তবে সে-দিন নানা চিন্তার মধ্যে একটা চিন্তাই মীরাবাঈ-এর মনকে বারবার স্পর্শ করে যাচ্ছিলো, সেটা হচ্ছে বিক্রমাজিৎ সিংহ বোধ হয় এত দিনে পালটিয়েছে। অর্থাৎ সে হয়তো এতোদিনে পরিবর্তিত। পরিপূর্ণ রূপান্তরিত। মীরাবাঈ-এর মনে হয়েছে, এ রূপান্তর অসম্ভব কিছু নয়। পিতা এবং মায়েরা মৃত। ভাইদের মৃত্যু হয়েছে। বাহাদুর শাহের আক্রমণে কাতারে কাতারে রাজপুত রমণী প্রাণ দিয়েছে। জহর ব্রত পালন করেছে। বিক্রমাজিৎ সিংহ এ-সব দেখেছে। এবং এই

সমস্ত কর্মের জন্যে চিতোরের সাধারণ প্রজারা বিক্রমাজিৎ সিংহ-কে দায়ীও করেছে। সেই কারণেই মীরাবাঈ-এর সে-দিন মনে হয়েছিল যে, আজ হয়তো বিক্রমাজিৎ সিংহ যথার্থ পুত্রে পরিণত হয়েছে। বিক্রমাজিৎ সিংহ জীবনে কখনও স্নেহ পায় নি। পাবার অবকাশ ও ঘটেনি। পিতা মহারাণা সংগ্রাম সিংহকে সারাজীবনে আঠারো বার লড়তে হয়েছে, নিজের রাজ্য ঠেকাবার জন্যে। তাঁর পুত্রদের স্নেহ করবার সময় ছিল না। রাজ্যের রাজনীতি আর যুদ্ধ, এই নিয়েই তাঁর সারা জীবন কেটেছে। আর মায়েরা সারা জীবন বিলাস-বৈভব, ধন-দৌলত আর স্বার্থের কোন্দল নিয়েই মেতে থেকেছে। পুত্রদের দিকে তাকাবার তাদের সময় ছিল না। পুত্রেরা মানুষ হয়েছে ধাত্রীদের হাতে। মীরাবাই-এর মনে হয় ভোজরাজ তবুও কিছু মায়ের স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিল। পিতার সাহচর্য পেয়েছিল। কারণ সে ছিল রাজ্যের বড় ছেলে। চিতোরের ভাবী রাণা। সেইজন্যে। কিন্তু পরবর্তী ভাইয়েরা, যেমন রতন সিংহ, বিক্রমাজিৎ সিংহ ও উদয় সিংহ, এরা পিতার সাহচর্য অথবা মায়ের স্নেহ-ভালবাসা, এ-সব থেকে চিরদিনই বঞ্চিত। সেই কারণেই মীরাবাঈ-এর মনে হয়েছে, এদের আচার-আচারণ রুক্ষ। রতন সিংহ-কেও সে দেখেছে। বিক্রমাজিৎ-সিহকেও সে দেখছে। একই ধাতুতে গড়া। সহ-অবস্থান অথবা সমন্বয়তার কোন মনোভাব এদের মধ্যে নেই। এরা শাক্ত-ধর্মের সত্যিকারের প্রতিভু। কিন্তু মহারাণা সংগ্রাম সিংহ অথবা ভোজরাজ ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া। ওঁনারা ছিলেন সহমর্মী। যুক্তি-তর্কের চেয়ে হৃদয়কে প্রশ্রয় দিতেন বেশী। কতদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে আজ মীরাবাঈ শ্রীবৃন্দাবনের এই শ্যামকুঞ্জে স্থিতি লাভ করেছে। ভেবেছে চিতোরের ভাবনা-চিন্তার সমাধি ঘটলো। এবারে নতুন করে চলা শুরু। নতুন নামে আর নামগানের নামাবলীতে নিজেকে জড়িয়ে, পবিত্র-করণেব কাজে নামা। চিতোরের প্রতিদিনের জীবনে যে গড়ল উঠেছিল, এখানে এসে সাধনার সমুদ্র-মন্থনে তা অমৃতে পরিণত করা। এ-কাজের পরিকল্পনা নিয়েই শ্রীবৃন্দবনে মীরাবাঈ কাজে নেমেছিল। কিন্তু কাজে নেমেও বাধা এসেছে। এবারের বাধা বিক্রমাজিৎ সিংহ। তাকে চিতোরে ডেকে পাঠিয়েছে। যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এবং সেই বিক্রমাজিৎ কে ঘিরেই মীরাবাঈ এর মনে চিতোরের পরিক্রমা চলছে।

মীরাবাঈ অনেক ভাবনার পর শেষে ঠিক করেছিল যে সে যাবে। চিতোরেই ফিরে যাবে। শ্বশুর-স্বামীর বাসভূমিতে ফিরে গিয়ে আবার নতুন করে নিজের সাধনায় বসবে। মন্দিরের দরজা খুলবে। কাতারে কাতারে সাধু-সন্ন্যাসীরা সব আসবে। বসবে, পুজো দেবে, গান শুনবে। তাকে আবার নতুন করে স্নেহ-ভালবাসায় ভরিয়ে দেবে। সেই ভাল। সেই ভাল। সে যাবে, যাবে। চিতোরেই ফিরে যাবে।

অনেক চিন্তার পর মীরাবাঈ সে-দিন মনস্থির করে ফেলেছিল। দীর্ঘদিন পরে সে-দিন অতীত-চিতোরের পরিপূর্ণ ছবিটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। মীরাবাঈ সে-দিন স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তার চোখে জল। সে চোখ তুলে দেখলো, সামনে দূত দাঁড়িয়ে।

মীরাবাঈ সে-দিন বেশ দৃঢ়স্বরেই বলেছিল ঃ আমি প্রস্তুত। আগামীকাল যাবার ব্যবস্থা কর।

দূত কুর্ণিশ জানিয়ে চলে গিয়েছিল।

॥ একুশ ॥

আবার নতুন করে মন্দিরের দরজা খুলেছিল মীরাবাঈ। অনেক আশা, অনেক উদ্দীপনা নিয়ে চিতোরের সাধারণ মানুষকে, আবার নতুন করে কাছে টেনে নিয়েছিল। আবার নতুন করে নাম-গান শুরু করেছিল। মীরাবাঈ সে-দিন বোঝেনি যে চিতোরের এই কুম্ভ গড়লে পূর্ণ। অমৃতে নয়। তাকে অমৃত পানের আশ্বাস দিয়ে গড়ল পান করানো হবে। গড়িয়ষী মহিলায় ধুয়ো দিয়ে, তাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হবে।

মন্দিরের চত্বরে মীরাবাঈ-কে আবার নতুন করে ধ্যানের আসন পাততে দেখে, সাধারণ প্রজারা উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। মীরাবাঈ-এর পুনরাগমনে সাধু-সন্তেরা সত্যিই আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁরা মনে প্রাণে এইটাই চেয়েছিলেন। তাঁদের চিরদিনের আশা, আকাঙ্খা আর আন্তরিক ইচ্ছা হচ্ছে, চিতোরে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ভগবৎ ভাবনা গড়ে উঠুক। মানুষ মীরাবাঈ-এর গান শুনে, তাকে ভালবেসে, তার হাতের প্রসাদ পেয়ে নির্মল আনন্দধারায় ধন্য হোক। মীরাবাঈ-ও ইচ্ছা পূরণে উন্মুখ। সে-ও সকলের জন্যে মন্দিরের দরজা খোলা রাখতে চায়, সকলকে ভালবাসতে চায়। স্নেহ দিয়ে কাছে আগলে রাখতে চায়। জীবনে দুঃখ-কষ্ট সে'-ও কিছুকম সহ্য করেনি। কিন্তু তার পরিবর্তে সে চেয়েছিল একটু আশার কথা। একটু সেবা, পূজো আর গান। তার জন্যে তাকে কিছু কম সহ্য করতে হয় নি। সে-দিন আবার নতুন করে সকলকে কাছে পেয়ে মীরাবাঈ-এর আনন্দের সীমা ছিল না। মীরাবাঈ সে-দিন পুজো শেষ করে নিবেদনের নির্মাল্যে নিজেকে সিক্ত করে মন্দিরের চত্বরে বসে আবার নতুন করে গান ধরেছিল ঃ

রমৈয়া বিনু নীদ ন আবে।
নীদ ন আয়ে বিরহ সতারে
প্রেমকী আঁচ দুলায়ে॥
বিনপিয়া জোত মন্দির আঁধিয়ারো,
দীপক দায় ন আয়ে।
পিয়া বিনা মেরী সেজ অলুনী
জাগত রৈন বিহায়ে।
পিয়া কব রে ঘর আয়ে॥
দাদুর মোয় পাপিহিয়া বোলে
কোয়ল সবদ সুনায়ে॥

ঘ্ঁমট ঘটা উলর আঈ,
দামিন দমক ডরায়ে ॥
নৈন ঝর লায়ে ॥
ক্যা কর্ঁ কিত জাঊ মোরি সর্জান,
বেদন কুন বুতায়ে।
বিরহ নাবান মোরী কায়া উসী হৈ,
লহর লহর জীয় জায়ে।
জড়ী ঘস লায়ে ॥
কো হৈ সখী সহেলী সজনী
পিয়া কুঁ আন মিলায়ে।
মীরাকে প্রভু কবরে মিলোগে,
মন মোহোন মোহিঁ ভারে।
কবৈ হুঁস কর বত্‌লায়ে ॥

মীরাবাঈ আত্মভোলা। নতুন করে চিতোরের মানুষকে পেয়ে, সে সে-দিন গানে আত্মভোলা হয়ে পড়েছিল। গানেব তারুণ্যে তন্ময় হযে পড়েছিল। অনেকদিন পরে আবার চিতোরের জনগনকে সে পেয়েছে। সেবার জন্যে। গান শোনাবার জন্যে। দলে দলে লোক আসছে। আসব ভরে উঠছে। নিষ্প্রাণ চিতোরে আবার প্রাণ ফিরে আসছে।

মীয়াবাঈ সে-দিন চিতোবে পা বেখেই খবর পেয়েছিল যে, বিক্রমাজিৎ সিংহ আবার নতুন করে শক্তিপূজার হুকুম দিয়েছে। মীবাবাঈ-এর আশঙ্কা হয়েছিল আবার নতুন করে গোলমাল না বাধে। কিন্তু বাধেনি। কারণ বিক্রমাজিৎ-এর আদেশে কারো মন ভরেনি। সেইজন্যে, চিতোরের সকল প্রজাই মীরাবাঈ-এর গানের আসরে এসে জুটেছে। বিক্রমাজিৎ-এর সঙ্গে সংঘাত মীরাবাঈও চায় নি। আর তা' ছাড়া বিক্রমাজিৎ সিংহ এবারে মীরাবাঈ-কে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছে। সাদরে আহ্বান করেছে। বিক্রমাজিৎ সিংহ জানতো যে মীরাবাঈ-কে আবার নতুন করে চিতোরে ডেকে আনার অর্থ, চিতোরে মৃত বৈষ্ণব-ভাবনা-কে আবার নতুন করে জাগিয়ে তোলা। আবার নতুন করে গিরিধারীলালের নিত্যসেবার সেবাব্রতী হওয়া। মন্দিরে মন্দিরে গানের আসর বসানো। এ-সব জেনে শুনেই বিক্রমাজিৎ সিংহ মীরাবাঈ-কে ডেকে পাঠিয়েছে। সুতরাং সংঘাতের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তবুও বিক্রমাজিৎ-এর শক্তি-পূজার নয়া-ফতেয়া জারীর আদেশ শুনে, মীরাবাঈ প্রথমে একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর জনগণের উদ্দাম আর উৎসাহ তাকে উদ্দীপিত করেছিল। বিক্রমাজিৎ-এর শক্তি পূজার নয়া ফতেয়া সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। মীরাবাঈ তখন স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত। গিরিধারীলালের নিত্যসেবা, পূজা আর গান, এই নিয়েই তার দিন কাটে। রাজ্যের জনগনও কিছুটা নিশ্চিন্ত।

কিন্তু শোনা গেল, বিক্রমাজিৎ সিংহ একটুও নিশ্চিন্ত নয়। বনবীর নাকি এখন

তার পূর্বের অবস্থার ফিরে এসেছে। বিক্রমাজিৎ সিংহ যদিও রাণা, তবুও বনবীরকেই মানে সবাই। এটা ঘটনা। এবং প্রচারিত সত্য। বিক্রমাজিৎ সিংহ-কে কেউ মানে না। বনবীরের কথাতেই রাজ্য চলছে। চিতোরের সর্দারেরা, অন্য রাজ্যের রাণারা তাকেই খাতির করে। মান-সম্মান দেখায়। সেনাপতিরা তার কাছেই পরামর্শের জন্যে আসে। বিক্রমাজিৎ সিংহ রাণা। কিন্তু রাজ্য চালায় বনবীর। বিক্রমাজিত সিংহ এটা বোঝে। তবুও তার করবার কিছু নেই। কিছু একটা করতে যাবার অর্থই, বনবীরের বিপক্ষে চলে যাওয়া। সে-কাজ তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে চিতোরে আবার একটা নতুন করে ঝড় উঠবে। আবার একটা গৃহযুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়বে। হয়তো প্রয়োজনে বনবীর বিক্রমাজিত সিংহ-কে সরিয়েও দিতে পারে। এটা সবাই জানে। এমনকি বিক্রমাজিৎ সিংহ ও না বোঝে তা নয়। কিন্তু সে উপায়হীন। তখন চিতোরে এমন খবরও মাঝে মাঝে ছড়িয়ে পড়তো যে, বনবীর মীরাবাঈ-এর সঙ্গে রাজনৈতিক মতলব আঁটছে। কারণ তৎকালীন চিতোরের অবস্থা অনুসারে জনগনের ধারনা ছিল, বনবীর এবং মীরাবাঈ-ই একমাত্র ক্ষমতাশীল। মীরাবাঈ আর বনবীর একত্রিত হলে বিক্রমাজিৎ সিংহ কে সরিয়ে দিতে বেশী সময় লাগবে না। তা' ছাড়াও তখন মীরাবাঈ চিতোরে এসে তার ভাই জয়মলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে লোক পাঠিয়েছিল। তা'তেও চিতোরের জনগণের মধ্যে দ্বি-মত সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ বলেছিল এ ভ্রাতৃ স্নেহ। আবার কেউ বলেছিল রাজনীতি। বিক্রমাজিৎ সিংহ এ সবই শুনছিল। তা' ছাড়াও বিক্রমাজিৎ সিংহ জানতো যে উদয় সিংহের ওপর মীরাবাঈ এর একটা অপত্য স্নেহ আছে। উদয় সিংহ মীরাবাঈ-এর কোলেই মানুষ। বিক্রমাজিৎ-এর ধারনা উদয় সিংহকে এই রাজ্যের রাজনীতির আওতায় আনবার চেষ্টা মীরাবাঈ এবং বনবীর দুজনেই করতে পারে। অথবা যুগ্ম-প্রচেষ্টা। বনবীরের অসাধ্য কিছু নেই। আর মীরাবাঈ তার শক্তি বাড়াবার জন্যে, চিতোরে নিজের জীবনযাত্রাকে নিশ্চিত করবার জন্যে, বনবীরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উদয়কে অনায়াসেই সাহায্য করতে পারে। কিছুই অস্বাভাবিক নয়। লোকমুখে প্রচারিত সংবাদ যে, বিক্রমাজিৎ সিংহ নাকি এই সব নানা চিন্তায় এবং আশঙ্কায় শুকিয়ে যাচ্ছে। এক রাশ বিরক্তি আর বিপদের সঙ্কেতে তার মন ভরে উঠছে। লোকে বলছে ঃ বিক্রমাজিৎ সিংহ নাকি এই সব বিপদের বিধি-সম্মত একটা ব্যবস্থার কথা ভাবছে। কিন্তু সে জানে যে এ-ব্যাপারে বনবীরের সঙ্গে আলোচনা করে কোন লাভ হবে না। কোন সর্দার বা সেনাপতির সঙ্গে আলোচনায় বসলে, তারা মুখ খুলবে না। আসল সত্য উদ্ঘাটিত হবে না। উপরন্তু বনবীরের কানে চলে যাবে। বনবীর হয়তো অন্য ব্যবস্থা নিয়ে বসবে।

চিতোর রাজ্যের জনগণের মধ্যে যখন বিক্রমাজিৎ সিংহ, মীরাবাঈ এবং বনবীরকে নিয়ে নানা জল্পনা চলছে, তখন মীরাবাঈ কিন্তু নির্বিকার। সে আগের মতই পুজো-অর্চনা ও নিজের ধ্যান-ধারণা নিয়েই দিন কাটাচ্ছিল। তার কানে সব খবরই আসছিল। কিন্তু সে কোন গুরুত্ব দিচ্ছিল না। যেমন আগে দেয় নি। আর তা' ছাড়া এ-বারে বিক্রমাজীৎ সিংহ নিজেই তাকে ডেকে এনেছে। অতএব মীরাবাঈ ধরে

নিয়েছিল যে, লোকের কথায় কান দেবার কোন অর্থ হয় না। সে চিতোরে যে কাজ সম্পাদন করতে এসেছে তাই করে যাবে। কিন্তু বিধি বাম। এমন সময় আকস্মিক ভাবে খবর ছড়ালো যে বিক্রমাজিৎ সিংহ মীরাবাঈ-কে ডেকে পাঠাবে। জানতে চাইবে যে, চিতোরে সে কী চায়। বিক্রমাজিৎ-এর নাকি আগে সেটাই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এ-খবর প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চিতোরের সাধারণ প্রজারা ধরে নিলো যে, মীরাবাঈ-কে বিক্রমাজিৎ সিংহ ভয় পাচ্ছে। যদিও সে নিজে লোক পাঠিয়ে মীরাবাঈ-কে আমন্ত্রণ করে চিতোরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে যে সে মীরাবাঈ-কে ভয় পাচ্ছে। অথচ ভয় পাবার কোন যুক্তি-নির্ভর কারণ চিতোরের জনগণ খুঁজে পাচ্ছে না। মীরাবাঈ চিতোরে কোন দিনও রাজনীতি করে নি। আজও করছে না। মীরাবাঈ সম্পর্কে বর্তমানে চিতোরে যা রটছে তা কল্পনা। রাজনীতির পাশা খেলা। লোকের ধারণা মীরাবাঈ-কে এই রাজনীতির পাশাখেলায় আগেও ফেলা হয়েছে এবং এখনও ফেলা হচ্ছে। বিক্রমাজিৎ সিংহ কেন মীরাবাঈ-কে ডেকে এনেও, এতো ভয় পাচ্ছে, তার যুক্তি-সংগত কোন কারণ চিতোরের জনগণ দেখতে পাচ্ছে না। অথচ বিক্রমাজিৎ সিংহ যে মীরাবাঈ কে ভয় পাচ্ছে, এটা সূর্যের মতই সত্য। যাইহোক চিতোরের ভক্তগণ ও সাধিকারা বিক্রমাজিৎ-এর ডাকের অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগলো।

এই প্রচারিত সংবাদের দু' মাস পরে মীরাবাঈ-এর ডাক এলো। শোনা গেল বিক্রমাজিৎ সিংহ নাকি বলে পাঠিয়েছে যে, পুজোর পরে মীরাবাঈ যেন তার সঙ্গে দেখা করে।

কিন্তু মীরাবাঈ দেখা করেনি। সে-দিন সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সে দেখা করবে না। সে খবর পাঠিয়েছিল যে, সে গিরিধারীলালের সেবার ভয়ানক ব্যস্ত। প্রয়োজন হলে বিক্রমাজিৎ সিংহ নিজেই যেন মীরাবাঈ-এর মন্দিরে এসে তার সঙ্গে দেখা করে।

খবর শুনে সে-দিন গুম্ হয়ে গিয়েছিল বিক্রমাজিৎ সিংহ। এতোটা সে আশা করেনি। সে রাণা হওয়া সত্ত্বেও মীরাবাঈ যে তাকে এমন ভাবে অপমান করবে, এটা তার ধারনার বাইরে ছিল। মীরাবাঈ জানে যে এখন বিক্রমাজিৎ সিংহ তার সম্পর্কে কী ভাবছে। বিক্রমাজিৎ সিংহ ভাবছে যে, একবারে মীরাবাঈ তাকে সরাসরি অপমান করেছে। কিন্তু এতো সাহস সে কোথায় পাচ্ছে? রাণাকে সম্মান জানানো, তার কথা মেনে চলা সকলেরই উচিত। মীরাবাঈ তা' করেনি। অতএব বিক্রমাজিৎ সিংহ এখন ধরেই নেবে যে, মীরাবাঈ চিতোরে বসে রাজনীতি করছে। চিতোরের রাজনীতিতে সে ভায়ানক ভাবে জড়িয়ে আছে। গিরিধারীলালের নিত্যসেবায় যে-সব লোক জমায়েত হয়, মীরাবাঈ তাদের দিয়েই বাইরে এ-রাজ্যের খবর পাচার করছে। খবর দেওয়া-নেওয়া করছে। হয়তো মীরাবাঈ এই ভাবেই উদরের সঙ্গে যোগযোগ করছে। বনবীরের সাহায্য নিচ্ছে। আর এ ব্যাপারে বনবীর তাকে সাহায্য করবেই। মীরাবাঈ এই ভাবে অবস্থাটা নানা ভাবে পর্যবেক্ষণ করে শেষ-সিদ্ধান্ত নিলো যে, সে কোন অবস্থাতেই দেখা করবে না। তার ফলে যদি তাকে আবার শ্রীবৃন্দাবনে

ফিরে যেতে হয় তবুও যাবে। কিন্তু সে নিজে বিক্রমাদিৎ-এর আপন বৌদি হয়ে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে না। প্রয়োজন হলে বিক্রমাজিৎ সিংহ নিজেই আসবে।

এবং তাই এলো। বিক্রমাজিৎ সিংহ আর স্থির থাকতে না পেরে, একদিন নিজেই মীরাবাঈ-এর মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়ালো। মীরাবাঈ এর তখন পুজো শেষ। লোকজন চলে গেছে। মীরাবাঈ বিক্রমাজিৎ-কে দেখে প্রথমে একটু থমকে গিয়েছিল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে কাছে এসে বলেছিল ; কেমন আছ বিক্রম। তোমাকে বড় রোগা রোগা লাগছে। এত অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে তুমি বড়ই অসহায় হয়ে পড়েছ। আজ তোমার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। আমি বুঝি বিক্রম। তা' তুমি মাঝে মাঝে আমায় কাছে এসে বোসো না। তুমি এখানে এলে তোমার অমর্যাদা কিছু হবে না। তুমি জানো যে, তোমার বাবা এ মন্দিরে এসে বসতেন। গিরিধারীলালের সেবায় যোগ দিতেন। আর তা' ছাড়া তোমার মা আমার বন্ধু ছিলেন। আমরা ছিলাম সম-বয়সী। আজকে চিতোরে তুমিই আমার একমাত্র আপনজন। শ্বশুর কুলের তুমিই আমার একমাত্র বংশ পরিচয়।

মীরাবাঈ এর কথাগুলো যতই আন্তরিকতা পূর্ণ হোক না কেন, বিক্রমাজিৎ সিংহ যে সে-কথাগুলো ভাল ভাবে গ্রহণ করছে না, সেটা তার মুখ দেখে মীরাবাঈ সে-দিন পরিষ্কারই বুঝেছিল। বিক্রমাজিৎ সিংহ ভেবেছিল মীরাবাঈ তার নিজের কথা-গুলো গোপন করে শুধু বাইরের পোষাকী কথাই বলে যাচ্ছে। এটা বোঝা গিয়েছিল বিক্রমাজিৎ-এর চাপা আক্রোশ দেখে। বিক্রমাজিৎ সিংহ আর থাকতে না পেরে, বলে উঠেছিল ঃ আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আপনি এলেন না কেন ?

প্রশ্নটা মীরাবাঈ এর ওপর আকস্মিক এসে পড়ায় মীরাবাঈ প্রথমে একটু থমকে গিয়েছিল, তারপর হেসে জবাব দিয়েছিল ঃ তুমি বর্তমান রাণা, এটা আমি জানি। কিন্তু তোমারও জানা উচিত বিক্রম যে আমি তোমার বৌদি। তোমাদের সবচেয়ে বড় দাদার আমি স্ত্রী। তুমি রাণা এটা বাইরের লোকের জন্য। আমি তোমার নিকটতম আত্মীয়া। আমাকে সম্মান জানানো তোমার কর্ত্তব্য। আর তা'ছাড়া আমাকে সম্মান জানালে তুমি লোক চক্ষুর কাছেও সম্মানিত হবে।

বিক্রমাজিৎ সিংহ তখন ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেছিল ঃ আপনি বৈষ্ণব ধর্ম ছেড়ে শক্তি পুজা করেন না কেন ?

মীরাবাঈ তখন একটু উষ্ম হয়েই বলেছিল ঃ তুমি বলতে চাইছো, গিরিধারীলালের পুজা আমি ছেড়ে দেব ?

বিক্রমাজিৎ সিংহ ; না, আপনাকে আমি পুজো ছেড়ে দিতে বলি না। পুজো আপনার চলতে থাক। তবে গিরিধারীলালের পুজো ছাড়াও শক্তি পুজোয় আসতে পারেন কিনা।

মীরাবাঈ তখন রাগত ঃ স্বরে জবাব দিয়েছিল ঃ না। পারি না।

বিক্রমাজিৎ সিংহ ঃ কেন পারেন না ? আপনি জানেন যে চিতোরের রাণারা শাক্ত। শক্তির উপাসক। তারা পুজো করে কালিকা দেবীকে। একলিঙ্গেশ্বর তাদের গৃহদেবতা।

মীরাবাঈ ঃ আমার সব জানা আজে বিক্রম। রাণা বংশের ইতিহাস আমায় অজানা কিছু নয়। কিন্তু তোমার ও জানা উচিত বিক্রম যে তোমার পিতা মহারাণা সংগ্রাম সিংহ এবং বড় দাদা ভোজরাজ অর্থাৎ আমার স্বামী এই চিতোরেই বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্টপোষকতা করে গেছেন। আমি তাঁদের সহযোগিতায় চিতোরে গিরিধারী-লালের অনেকে গুলো মন্দির তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলাম। তাঁরা আমাকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার-প্রসারে যথেষ্টে সাহায্য করেছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম, সহ-অবস্থান আর সহনশীলতার ধর্ম। মানুষকে ভালবেসে কাছে টানার ধর্ম। তাঁরা আজ আর কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু আমি জানি, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, রাজ্যের প্রজাদের ভালবেসে কাছে না টানলে রাজ্য শাসন করা যায় না। রাজ্য বিস্তার সৈন্য-সামন্ত দিয়ে হতে পারে। কিন্তু রাজ্য শাসনে প্রজাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি তাঁদের রাজ্যশাসনে সহযোগিতাই করেছি। তুমি জানো প্রজারা গিরিধারী-লালের পুজো দিতে এখানে আসে, গান শোনে। প্রজাদের সাথে যোগাযোগ এই ভাবেই গড়ে ওঠে। আমি সেতু মাত্র। প্রজাদের যোগাযোগ থাকলে তারাও রাজ্য শাসনে সরিক হয়। তাবাও এই রাজ্যটাকে নিজের রাজ্য বলে মনে করে। তখন রাজ্য শাসন সহজ হয়ে আসে। তোমরা বয়সে তরুণ। আমি জানি তোমরা এ-সব মানো না। তোমরা নিজেদের স্বার্থ, দলাদলি আর প্রতিপত্তির লোভে নিজেদের পরিচালিত কর। কিসে তোমরা রাণা হতে পারবে, অথবা কী ভাবে দাবার ছক কাটলে তোমার রাণা হবার পথ সুগম হবে, তোমরা নিরত ঃ এই চিন্তেতেই ব্যস্ত। কিন্তু তোমার পিতা মহারাণা সংগ্রাম সিংহ বা তোমার বড় দাদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আলাদা। কোন প্রকার সংকীর্ণ মনোভাবকে তাঁরা প্রশ্রয় দেননি। অবশ্য তোমাকে দোষারোপ করে কোন লাভ নেই। তাঁদের সাহচর্য তুমি পাওনি বলেই, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তুমি মানুষ হতে পারনি।

বিক্রমাজিৎ সিংহ ঃ তাহলে চিতোরে বসে আপনি এতদিন রাজনীতির সহযোগীতা করে এসেছেন? গিরিধারীলালের সেবা, এটা আপনার পোষাকী আবরণ মাত্র।

বিক্রমাজিৎ-এর কথা শুনে সেদিন ফুঁসিয়ে উঠেছিল মীরাবাঈ। তবুও সে নিজেকে সহজ করে নিয়ে বলেছিল ঃ বড় বেশী এগিয়ে আসছো বিক্রম। তোমার মুখে এ-কথা শোভা পায় না। তুমি বার বার ভুলে যাচ্ছ যে, আমি তোমার বৌদি। বড় দাদার স্ত্রী। আমাকে সম্মান করে কথা বলা তোমার উচিত। আমি বিশ্বাস করি যে সব শিক্ষা সকলে পায় না। অথবা সহশীলতা সকলের সমান নয়। তবুও রাজনীতির কথা যখন তুললে, তখন শুনে রাখো বিক্রম, আমি রাজনীতি তোমার চেয়ে অনেক ভালবুঝি। এবং সোজা ভাবে বুঝি। তোমাদের মত কুটিল রাজনীতির পক্ষপাতী আমি নই। আমি রাজনীতি করলে তোমরা জায়গা পেতে না। আমার রাজনীতি উদারতার রাজনীতি। মানুষকে শোষণ আর শাসনের রাজনীতি নয়। মানুষকে ভালবাসে কাছে টানার রাজনীতি। তোমরা সংকীর্ণ মন নিয়ে এ রাজনীতি কোথায় পাবে? চিতোরে আমারও একটা স্বপ্ন ছিল। এবং সে-স্বপ্নে বিশ্বাসী ছিলেন, তোমার পিতা এবং বড়দা।

বিক্রমাজিৎ সিংহ ঃ কী স্বপ্ন ?

মীরাবাঈ ঃ সে তুমি বুঝবে না বিক্রম। আজ শ্বশানে বসে স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখছো। কিন্তু চিতোর শ্বশান করে দেবার মূলে তোমরাই।

বিস্মিত বিক্রমাজিত সিংহ বলেছিল ঃ আমরাই ! আপনি কী বলছেন ?

মীরাবাঈ দৃঢ় বিশ্বাস-নিয়ে জবাব দিয়েছিল ঃ হ্যাঁ,-তোমরাই। তোমাদের স্বার্থ, আত্মকলহ, কোন্দল, আর দন্দ্ব। তারই সুযোগ নিল বাহাদুর শাহ। তোমরা চিতোর রক্ষার জন্যে যদি এক জোট হতে পারতে, যদি দেশের সাধারণ প্রজাদের বোঝাতে পারতে যে, দেশ আজ বিপন্ন। এ-দেশ তোমাদের, সুতরাং তোমাদের মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে আজ তোমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে, তাহলে বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করতে সাহস পেত না। কিন্তু তোমাদের নিজেদের মধ্যেই দেশপ্রেম, দেশপ্রীতি বলতে কিছুই নেই। অতএব প্রজাদের আর বোঝাবে কি ? কিন্তু আমি আমার দেশকে ভালবাসি। চিতোরকে ভালবাসি। আমার স্বপ্ন ছিল তামাম হিন্দুস্থানকে এক জোট করে এক হিন্দু রাজ্যে পরিণত করা। এক ধর্মরাজ্য হিসাবে দাঁড় করানো। আমার শ্বশুর ও স্বামীর মতও তাই ছিল। তাঁরাও আমার মতে বিশ্বাসী ছিলেন। এমন একটা পরিকল্পনা আমাদের ছিল। কিন্তু কপালের লিখন। তাঁরা একে একে সকলেই বিদায় নিলেন।

কথা বলতে বলতে সেদিন মীরাবাঈ-এর চোখে জল এসে গিয়েছিল। অবশ্য তাঁতে বিক্রমাজিৎ-এর মন গলেনি। সে তখন বিদ্রুপ করে বলেছিল ঃ আপনি তাহলে তামাম হিন্দুস্থানের মহারাণী হবার বাসনা পোষণ করতেন। কারণ তামাম হিন্দুস্থান যদি কোন প্রকারে একজোট করা যেত, তবে আমার দাদা হতেন মহারাজা আর আপনি মহারাণী। কিন্তু দাদার অকাল মৃত্যুতে আপনি মহারাণী হবার আর সুযোগ পেলেন না। সুতরাং আপনার স্বপ্ন ব্যর্থ।

বিক্রমাজিৎ-এর কথায় মীরাবাঈ খুবই আঘাত পেয়ে বলেছিল ঃ তোমরা যদি এমন কথা ভেবে থাক, আমার বলার কিছুই নেই। কিন্তু চিতোরের সাধারণ প্রজারা জানে এবং আমার শ্বশুর ও স্বামী জানতেন যে, আমি আজীবন গিরিধারীলালের সেবা নিয়েই দিন কাটিয়েছি।

বিক্রমাজিৎ সিংহ ঃ সেবা-টা আপনার পোষাকী। আসলে আপনি রাজণীতি করতেন। এটা এখন বুঝতে পারছি। এবং আমার মনে হয় আপনি এবারেও চিতোরে ফিরে এসেছেন রাজনীতি করতে। এ-কথা আমার আগেও মনে হয়েছিল। সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু আজ জলের মত পরিস্কার হলো।

বিক্রমাজিৎ-এর কথা শুনে মীরাবাঈ সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বিশ্বাসই করতে পারেনি যে বিক্রমাজিৎ সিংহ তাকে চিতোরে ডেকে এনে এমন অপমান করতে পারে। তখন স্বাভাবিক ভাবেই মীরাবাঈ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। অবশ্য বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত মানুষদের উত্তেজিত হওয়া অথবা তর্ক করা নিষিদ্ধ। সহনশীলতাই তাদের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু মীরাবাঈ সে-দিন নিজেকে আর সামলাতে পারে নি। হাজার হোক রাজকুলবধূ রাজপুতানী। তাই সে-দিন সে উত্তেজিত হয়ে জবাব

দিয়েছিল ঃ তুমি এত ছোট, এতো নীচ, আমি ভাবতেই পারি না। তুমিই লোক পাঠিয়ে আমাকে এখানে এনেছো কি অপমান করতে? কৈ আমি তো এখানে আসতে চায়নি। তোমার যদি আমার উপর এতোই সন্দেহ, তবে আমাকে আনবার জন্যে কেন লোক পাঠালে?

বিক্রমাজিৎ সিংহ তখন থেমে থেমে জবাব দিয়েছিল ঃ আপনি বিশ্বাস করুণ, আপনাকে চিতোরে ফিরিরে আনবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু আমাকে এ-কাজ করতে হয়েছে বনবীরের অনুরোধে। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি চিতোরে এসেই রাজনীতি শুরু করবেন। এবং এখন দেখছি, চিতোরের ক্ষমতায় আসবার একটা বাসনা, এখনও আপনি মনে মনে পোষণ করেন। যদিও আজ তার কোন পথই আর খোলা নেই। তবুও আমি জানি, মানুষ আজীবন বাসনার দ্বারা পরিচালিত।

কেটে পড়েছিল মীরাবাঈ। বলেছিল ঃ থামো বিক্রম। আর এগুবার চেষ্টা কোরো না। তোমার ওপর একটা ভালো ধারনা নিয়েই আমি এখানে এসেছিলাম। আমার-আমার ধারনা হয়েছিল, তুমি আর আগের মত নেই। তুমি পরিবর্তীত। অবশ্য পরিবর্তীত এটা ঠিকই। তবে এত নীচে নেমে গেছ যা' আমার ধারনার অতীত। আমার ধারনা হয়েছিল, তুমি তোমার মাকে হারিয়ে, তোমার আত্মীয়-পবিজনকে হারিয়ে, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ স্নেহ পাবার জন্যে। ভালবাসা পাবার জন্যে। আমি ভেবেছিলাম, আজ তুমি একা। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার লোক নেই। কিন্তু এখন দেখছি, তুমি স্নেহ-সান্ত্বনা পাবার যোগ্য হবে ওঠো নি। আর উঠবেও না। যার মধ্যে এতো নীচতা, সে স্নেহ-ভালবাসা দাবী করতে পারে না। তোমার চেয়ে উদয় অনেক বড়। তাকে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। আমি জানি তার মধ্যে একটা শৌর্য্য-বীর্য্য,-বীরত্ব আর দেশপ্রেমের আভাষ আছে। সে যদি কোনদিন চিতোরে ফিরে আসতে পারে, তবে চিতোর আবার জাগবে। চিতোরের জনগণ আবার চিতোর রক্ষার জন্যে প্রাণ দেবে। আমি মনে করি, চিতোরের স্বাধীণতা রক্ষার বর্তমান উপযুক্ত ব্যক্তি তুমি নও, উদয়। উদয় সিংহ।

এতক্ষণে রাগে ফেটে পড়েছিল বিক্রমাজিৎ সিংহ। সে মীরাবাঈ-এর চাবুক সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে বলে উঠেছিল ঃ আমি জানি। সে-কথা আমি জানি। আপনি বনবীরকে নিয়ে উদয়কে চিতোরে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন। উদয়কে আপনি ভালবাসেন। আপনার ইচ্ছা যে উদয় রাণা হোক। এ ব্যাপারে আপনি সাহায্য চাইছেন মেড়তার আর গুজরাটের। বুঁদীতেও আপনার লোক গেছে। আপনি জয়মলের সঙ্গে ও যোগাযোগ করছেন। আমার কাছে খবর আছে। আমি-আমি রাণা। আমি হুকুম দিচ্ছি। আগামীকাল আপনি চিতোর ছেড়ে চলে যাবেন। এটা আমার হুকুম এবং বৌদি হিসাবে অনুরোধও জানাবেন।

বিক্রমাজিৎ সিংহ মীরার মন্দির ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো। মীরাবাঈ তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল ঃ শোনো রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ। রাণার হুকুম যখন, তখন আমি নিশ্চয়ই চলে যাব। বনবীরের মন রাখতে তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে,

আমার জানা ছিল না। কিন্তু তুমি রাণা, তোমার হুকুম আর পরাক্রম তখন কোথায় ছিল, যখন বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করলো? কোথায় ছিল তোমার এই পরাক্রম? এই হুকুমের পরোয়ানা? লজ্জা করে না? তোমার মায়েরা আর হাজার হাজার রাজপুত রমণীরা চিতোরের অবরোধ ভেঙ্গে তলোয়ার হাতে বাহাদুর শাহের সামনে এসে দাঁড়ালো, হাজার হাজার রাজপুতানীরা জহর ব্রত পালন করলো, তখন-তখন কোথায় ছিলে তুমি ভীরু পলাতক?

থমকে দাঁড়িয়েছিল বিক্রমাজিৎ সিংহ। মীরাবাঈ-এর এমন মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি। যেন একটা প্রচণ্ড জলস্রোত উত্তুঙ্গ পাহাড় থেকে নেমে আসছে। ভীত হয়েছিল বিক্রমাজিৎ সিংহ। বুঝেছিল এতোটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হয়নি। সে তখন গলার স্বর নামিয়ে এনে জবাব দিয়েছিল ঃ কিন্তু আমি থেকেও বা কি করতে পারতাম।

উত্তেজিত মীবাবাঈ বলেছিল ঃ মরতে পারতে। দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশের জনগনের জন্যে মরতে পারতে। প্রাণ দিতে পারতে।

বিক্রমাজিৎ-এর এখন গলার স্বর অতীব নরম। সে বিনিয়ে বিনিয়ে বলেছিল ঃ বুঁদী, গুজরাট আমাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েও সময় মত সৈন্য পাঠালো না। এগিয়ে এলো না।

মীরাবাঈ ঃ আসবে না। ভীরু পলাতক-কে কেউ সাহায্য করে না। তুমি যদি চিতোরের জন্যে লড়তে, দেশবাসীকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে, তবে ওরা তোমার চরিত্র বল দেখে ভরসা পেত। সৈন্য পাঠাতো। যেখানে তুমি নিজেই অনুপস্থিত, সেখানে তারা কার জন্য সৈন্য পাঠাবে। কিন্তু আমার শ্বশুর, অর্থাৎ তোমার বাবা মহারাণা সংগ্রাম সিংহের আমলটার কথা একবার ভেবে দেখ। তিনি তাঁর কঠোর চরিত্রবলে দুনিয়াটা এক করে রেখেছিলেন। চিতোরের জন্যে লড়তে তার একটা চোখ আর একটা হাত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরেও তিনি অনেক বার লড়েছেন। চিতোর রক্ষার জন্যে তিনি জীবনে আঠারো বার লড়াই করেছেন। সারাজীবন শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। পিছিয়ে আসেননি কখনও। আর তাঁরই পুত্র হয়ে তুমি চিতোরের প্রচণ্ড দুর্দিনে কোথায় বুক চিতিয়ে সামনে দাঁড়াবে, দেশের মানুষকে বল-ভরসা দেবে, তা' না করে চিতোর ছেড়ে পালালে। এখন বলছো আমি রাণা। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আমি বলি তুমি চিতোরের কলঙ্ক। দেশের অভিশাপ।

বিক্রমাজিৎ সিংহ ঃ বৌদি! বিক্রমাজিৎ সিংহ সে-দিন উত্তেজনায় নিজের তরবারীতে হাত রেখেছিল।

মীরাবাঈ সে-দিকে একবার তাকিয়ে মন্দির ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

॥ বাইশ ॥

মীরা মন বৃন্দাবন। এই ঘটনার পর থেকেই মীরাবাঈ পাকাপাকি ভাবে বৃন্দবন বাসিন্দা। আর চিতোরে পা রাখেনি মীরাবাঈ। চিতোর তার কাছে হয়ে দাঁড়ালো স্মৃতি। অতীতে যা শ্রুতিতে ছিল। সে-দিন তা হয়ে দাঁড়ালো স্মৃতি। মনের স্মরণীকা।

বিক্রমাজিৎ সিংহের এক রাশ অপমান মাথায় নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরে এলো মীরাবাঈ। ফিরে এসেই সনাতন কে বলেছিলঃ আবার ফিরে এলাম সনাতন। চিতোরে আমার আরও কিছু অপমান পাওনা ছিল। এবারে সেটা পেয়ে গেলাম। চিতোরের সাধারণ মানুষ জানলো, আমি রাণা পরিবাবের রাজমহিষী হওয়া সত্ত্বেও, বিক্রমাজিৎ সিংহ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই অকারণ অপমান এবারে আমাকে মাথা পেতে নিতে হল। সেটাতে ও আমি বিশেষ দুঃখ পেতাম না, যদি বিক্রম আমার সঙ্গে তর্ক না করতো। আমাকে সরাসরি চিতোর ছেড়ে চলে যেতে না বলতো। কিন্তু এবার সেই ভয়ানক অপমান আর গ্লানিটাও আমার মাথায় বর্ষিত হল। বিক্রমকে আমি কত ছোট দেখেছি। আর এখনই বা কত বয়স। আমি ওদের রাণা-পরিবারের বড়দাদার স্ত্রী। সে সম্মান এবার বিক্রম আমাকে দিল না। আমি চিতোরে যাবার আগে ভেবেছিলাম, বিক্রম এতো দিনে পালটেছে। সারা জীবনে সে কারো স্নেহ-ভালবাসা পায়নি। সেই কারণে এর চরিত্রে চিবকালই একটা রুক্ষতার ভাব ছিল। এবারে ডেকে পাঠাতে আমি ভেবেছিলাম, ওর চরিত্রে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এতবড় একটা যুদ্ধ চিতোরের বুকে হয়ে গেল। ওর মায়েরা আর সমস্ত রাজপুত রমণীরা মারা গেলেন। ওর বয়ঃজ্যেষ্ঠরা আর কেউ বেঁচে নেই। সুতরাং আমার ধারনা হয়েছিল ও এবারে কিছু স্নেহ-ভালবাসা চায়। আমি ওব মায়ের সমবয়সী। ভেবেছিলাম বিক্রম ডেকে পাঠিয়েছে। বিক্রম আমার ওপর যতই অত্যাচার করুক, ও আমার পুত্রের মত। এখন ওকে সান্ত্বনা দেওয়া বা স্নেহ জোগানো আমার কাজ। বলতে গেলে চিতোরে বয়সী রাজপুত রমণীদের মধ্যে একমাত্র আমিই বেঁচে। অতএব এটা আমার নৈতিক কর্ত্তব্য বলে মনে করেছিলাম। আমি সে কর্ত্তব্য করতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু বিক্রম দিলো না। অনুশোচনায় আর আত্মগ্লানিতে আমার মন ভরে উঠছে সনাতন। এমন অপমানিত আমি জীবনে হইনি। বিক্রম বললো, ও নাকি বনবীর কে খুশি রাখবার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমি চিতোরে ফিরে যাই, এ-ইচ্ছা তার ছিল না। ওর ধারনা আমি চিতোরে বসে এতোদিন রাজনীতি করেছি। আমার গিরিধারীলালের সেবা-টা নাকি পোষাকী।

মীরাবাঈ-এর সব কথা শুনে সনাতন সেদিন বিষন্ন মুখে বলেছিলঃ

চিতোর থেকে ফিরে আসার পর আপনি বড় বেশী অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন। বড় বেশী কথা বলেছেন। আপনার মনের আঘাত আমি বুঝি। কিন্তু কী করবেন।

মীরাবাঈ চোখের জল মুছে জবাব দিয়েছিল ঃ হ্যাঁ, সনাতন। সবই ভবিতব্য। আমার কপালে ছিল। তাই ঘটলো।

সনাতন ঃ অনেক রাত হ'লো এবারে আপনি বিশ্রাম নিন।

মীরাবাঈ ঃ হ্যাঁ, তাই নেব।

মীরাবাঈ আশ্রমের আঙ্গিনা ছেড়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। ভেবেছিল এবার সে বিশ্রাম নেবে। ঘুমিয়ে পড়বে। আগামীকাল থেকে গিরিধারীলালের নিত্যসেবা, পূজা আর গান ছাড়া আর কিছু ভাববে না। চিতোর তার জীবন থেকে মুছে গেছে। তার ভাবনার আকাশ থেকে বিলুপ্ত। কিন্তু হলো কৈ? ঘুম আসে না। রাত বাড়ে, চিন্তা বাড়ে। চিন্তার জাল পাকে পাকে মীরাকে জড়াতে থাকে। ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়ে মীরাকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। এমন চিন্তায় আচ্ছন্ন, মীরাবাঈকে অনেকদিন কেউ করতে পারেনি। কিন্তু বিক্রম পারলো। বিক্রম, রতনসিংহ ও ভোজরাজ। একই পরিবারভুক্ত মানুষ এরা। কিন্তু বিচিত্র চরিত্রের। রতনসিংহ ও বিক্রমের মধ্যে চরিত্রের কিছু কিছু মিল থাকলেও ভোজরাজের সঙ্গে এদের কোন মিল নেই। না চেহারায় না চরিত্রে। ভোজরাজের চরিত্র গড়ে উঠেছিল মহারাণা সংগ্রাম সিংহের প্রত্যক্ষ অনুশাসনে। প্রত্যক্ষ নিয়মানুবর্তিতায়। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ভোজরাজের ওপর যতটা নজর দিতে পেরেছিলেন, ততটা এদের ওপর দিতে পারেননি। তখন তিনি যুদ্ধবিগ্রহে সর্বদাই ব্যস্ত। ভোজরাজ আর মহারাণা সংগ্রাম সিংহ একই চিন্তাধারার মানুষ। আর সে চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মীরাবাঈ-এর মতামত। মীরাবাঈ-এর বাসনা ছিল তামাম হিন্দুস্থান একটি রাজ্যে পরিণত করা। যেমন ওঁদেরও বাসনা ছিল। কিন্তু চিতোরে তার পরের যুগ অন্ধকারাচ্ছন্ন। শুধু পরাজয় আর পরাজয়। ভোজরাজের কথা মনে হতে মীরাবাঈ-এর চোখে জল এলো। ভোজরাজকে সে-রাতে বড় বেশী মনে পড়েছিল মীরাবাঈ এর। ভোজরাজের অভাবটা সে-রাতে ভয়ানক ভাবে অনুভব করেছিল মীরা। হয়তো বিক্রমাজিৎ-এর অপমানের চাবুকটাই মীরাবাঈ-এর মনটাকে আবার ভোজরাজের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

আসলে বিক্রমাজিৎ এর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াটাই মীরাবাঈ-এর ঠিক হয়নি। সে চুপচাপ বিক্রমাজিৎ-এর কথা শুনে চিতোর ছেড়ে চলে এলেই পারতো। কিন্তু বিক্রমের একটা কথা সে-দিন মীরাবাঈ সামলাতে পারে নি। অপমানিত বোধ না করে পারেনি। বিক্রম যখন বলেছিল ঃ আমি রাণা, আমি আপনাকে চিতোর ছেড়ে চলে যেতে বলছি।

মীরাবাঈ তখন ভেবেছিল ঃ আমি তার বৌদি। রাজপরিবারের রাজমহিষী। তার আপনজন। পারস্পরিক ভাবনার ভুল। চেতনার ভুল। তাই মীরাবাঈ সে রাতে ভুলের ফসল তুলেছিল সারারাত জেগে জেগে আর আত্মগ্লানিতে ভুগে ভুগে।

॥ তেইশ ॥

চিতোরের খবর শ্রীবৃন্দাবনে প্রায়ই আসে। এবারে খবর এলো মীরাবাঈ-এর অনুপস্থিতিতে চিতোর নাকি আবার শোকে মুহ্যমান। পণ্ডিতেরা স্তব্ধ। প্রজারা ক্ষুব্ধ। কিন্তু মুখে কারো কোন কথা নেই। প্রতিবাদ নেই। চিতোরের সকলেই জানে মীরাবাঈ চিতোর ছেড়ে চলে যাবার অর্থ বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া। এবং মীরাবাঈ বৈষ্ণব ধর্মের জন্যে যে কাজ করেছে, তা লুপ্ত করে দেওয়া। মীরাবাঈ যে প্রতিকূল অবস্থা ও আবহাওয়ার মধ্যে একটার পর একটা মন্দির তৈরী করে জনগণের বৈষ্ণব সাধনার পথ সুগম করে দিয়েছিল, এমন কাজ মীরাবাঈ-এর পর আর কারো হাতে নেওয়া অসম্ভব। মীরাবাঈ চিতোরের রাণা পরিবারের রাজমহিষী। রাজকুলবধূ ছিল বলেই সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ পেশ করতে পেরেছিল। এবং সেই সঙ্গে মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ও ভোজরাজের সহযোগিতাও স্মরণীয়। কিন্তু তার পরের যুগে মীরাবাঈ-এর জীবনে প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। মীরাবাঈ-কে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এবং বার বার তাকে একলিঙ্গের পূজারিণী করবার গোপন ষড়যন্ত্র হয়েছিল। কিন্তু মীরাবাঈ-কে কেউ টলাতে পারেনি। এ কথা বর্তমান সংবাদে স্বীকৃত। মীরা তার ভক্তবৃন্দ, সাধু-সন্ন্যাসী ও সাধকবৃন্দের সহযোগিতায় প্রতিবাদের ঝড় তুলে এগিয়ে গিয়েছিল। এবং পরবর্তী রাণাদের অস্বীকার করে বৈষ্ণব ধর্মের মাথা উঁচু করে রেখেছিল। যে কাজ আর কারো করা সম্ভব নয়। সুতরাং আজ মীরার অনুপস্থিতিতে মন্দিরে মন্দিরে তালা ঝুলছে। গিরিধারীলালের নিত্য সেবা বন্ধ। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার-প্রসার বন্ধ। প্রজারা ক্ষুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবাদহীন। সকলেই বুঝে নিয়েছে যে এবারে বিক্রমাজিৎ-এর আমলে বৈষ্ণব ধর্মের যবনিকা পাত ঘটলো এবং শক্তি পূজার শক্ত আসন তৈরী হলো। বিক্রমাজিৎ-এর আগেও চিতোরে শক্তি পূজা কিছু কম হয়নি। তবে তার পাশে বৈষ্ণব ধর্মের মন্দির গুলোতেও নিত্য পূজার ঘণ্টা বাজতো।

খবরে প্রকাশ মীরাবাঈ চলে যাবার পর, বিক্রমাজিৎ সিংহ কিছুদিন ধরে চিতোরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করেছিল। মীরাবাঈ-এর অনুপস্থিতিতে মন্দির গুলোতে তালা পড়েছে বটে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারও প্রসারের কাজ বন্ধ হয়েছে বটে, তবে চিতোরের জনগণ শক্তি পূজোর কোন আগ্রহ দেখায় নি। শক্তি পূজায় জনগণের সমর্থক আগে যেমন ছিল এখনও তাই আছে। বাড়তি কিছু হয়নি। শোনা যাচ্ছে পণ্ডিতরা মুখ খুলছেন না। আলোচনা অথবা সমালোচনায় নামছেন না। শক্তি পূজার সমর্থন জানিয়ে মতামত ও জাহির করছেন না। অথচ মীরাবাঈ চলে যাবার পর বিক্রমাজিৎ সিংহ বারবার জনগণকে শক্তি পূজায় এগিয়ে আসতে

অনুরোধ জানিয়েছে। উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্ট করেছে। শেষে ব্যর্থ হয়ে আদেশ জারী করেছে। কিন্তু তবুও অবস্থা পূর্ববৎ।

খবরে আরও প্রকাশ, বিক্রমাজিৎ সিংহ নাকি চিতোরের বর্তমান অবস্থায় অপমানিত বোধ করছে। ভাবছে মীরাবাঈ চিতোর ছেড়ে চলে যাবার সময় শুধু যে তাকে অপমান করে গেছে তা' নয় যাবার পরও চিতোরের জনগণকে দিয়ে তাকে আরও বেশী অপমানিত করছে এবং তার শাসন ক্ষমতার ওপর চাবুক চালাচ্ছে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই বিক্রমাজিৎ সিংহ আরও বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। কারণে-অকারণে নান আদেশ জারী করে জনসাধারণকে আরও বেশী ক্ষুব্ধ করে তুলছে। এ-দিকে বনবীর মনে মনে বুঝে নিয়েছি যে, বিক্রমাজিৎ-এর সময় আসন্ন। এবারে পরিপূর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় থাকা। বিক্রমাজিৎ-এর দুষপ্রবৃত্তি এতদূর বেড়ে গেছে যে, সে নিজের আপন সর্দার ও সেনাপতিদের পর্য্যন্ত যত্রতত্র বদলি, অত্যাচারও অযাচিত লাচ্ছনা করছে। ফলে সৈন্য বিভাগে ফাটল ধরতে শুরু করেছে। তারা বিক্রমাজিৎ-এর সমালোচনার মুখর হয়ে উঠছে। অথচ বিক্রমাজিৎ সিংহ কিন্তু এ-সবে গ্রাহ্য করছে না। সে তার নীতি আঁকড়েই পড়ে আছে। ফলে চিতোরে আবার অসন্তোষ, হতাশা ও বিক্ষুব্ধতা জমা হচ্ছে। রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ নিজের শাসন ও ক্ষমতা প্রকাশের জন্য এতদূরে এগিয়ে এসেছে যা' কল্পনার বাইরে। চিতোরের জনগণের ধারনা বিক্রমাজিৎ সিংহ-এর দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে এবং সে-নিজেই নিজের বিলুপ্তির পথ পরিষ্কার করছে।

এবারে চিতোর থেকে দীর্ঘ সংবাদ এসেছে। এমন সংবাদ প্রায়ই আসে। মীরাবাঈ এর ভক্তবৃন্দ এবং সাধক-সাধিকারা পাঠিয়ে থাকে। বর্তমানে মীরাবাঈ-এর বাস শ্রীবৃন্দাবনে। মীরাবাঈ-এর মানসিকতা আজ তৈরী হয়েছে শ্রীবৃন্দবনকে ঘিরেই। শ্রীবৃন্দাবনই হবে মীরাবাঈ-এর সাধনার উত্তেরণ ভূমি। কিন্তু তবুও চিতোরের এই ধরণের সংবাদ মীরাবাঈ-কে ব্যথিত না করে পারে না। তবে বর্তমানে তার করবার কিছুই নেই একথা মীরাবাঈ জানে। সে কিছু করবার বাসনা নিয়েই চিতোরে গিয়েছিল। এবং একরাশ অপমান মাথায় নিয়ে ফিরে এসেছে। অতএব চুপ করে থাকা ছাড়া মীরাবাঈ-এর দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই। তাই বাধ্য হয়ে মীরাবাঈ নিজেকে সাধনার মনোনিবেশ করবার বারবাব চেষ্টা করতে লাগলো। নিত্যসেবা ও নামগানের সময়-সীমা আরও বাড়িয়ে দিল।

কিন্তু বিধি বাম। সাধনায় ব্যঘাত অবশ্যই আসে। মীরাবাঈ-এর জীবনেও বার বার এসেছে। বার বার সে ভেঙ্গে পড়েছে এবং পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে পথ চলার চেষ্টা করছে।

এবারে চিতোর থেকে যে সংবাদ এলো তা' একেবারেই অবিশ্বাস্য। মীরাবাঈ খবর পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

এবারের খবরে প্রকাশ বিক্রমাজিৎ সিংহ নাকি তার নিজের ক্ষমতার এত বেশী বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে যে, একদিন সভাগৃহে সকলের সামনে করিম চাঁদকে অকারণ লাচ্ছনা করেছে এবং সভাগৃহ ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দিয়েছে। বিক্রমাজিৎ সিংহ

ভুলে গিয়েছে যে, এই করিমচাঁদই একদিন বিপদে সংগ্রাম সিংহের জীবন বাঁচিয়েছিল। কিন্তু করিম চাঁদ সেটা ভোলেনি। করিম চাঁদ বয়সে প্রবীন। ইহজগৎ থেকে বিদায় নেবার সময় তার আসন্ন। বিক্রমাজিৎ সিংহ এ-সব কথা চিন্তা না করেই এমন একটা আদেশ জারী করে বসেছে। এই আদেশেই বিক্রমাজিৎ-এর কাল হয়ে দাঁড়ালো। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সভায় অন্যান্য গুণীজনের, আসন ত্যাগ করে সভা ছেড়ে চলে গেল। শিরোমণি চন্দ্রাবৎ বীর কর্ণাজী রেগে গিয়ে বললো : এতদিন আমরা ফুলের গন্ধই নিয়ে এসেছি। এবার ফল আস্বাদনেব সময় এসেছে। তখন অপমানিত করিম বললো : আগামীকালই তার আস্বাদন পাওয়া যাবে।

সভার সকলেই বিক্রমাজিৎ-কে একা বসিয়া রেখে সভাছেড়ে চলে গেছে। বনবীর নেপথ্যে দাঁড়িয়ে হেসেছে। এবং ভেবেছে যে দাবার ছক অনেক খানি এগিয়ে এসেছে। এবাবে এখন থেকেই তাকে যে কোন পরিস্থিতের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। বিক্ষুব্ধ সভ্যদেব গোপন ষড়যন্ত্রের প্রতি নজর রাখতে হবে।

বিক্রমাজিৎ এর অদৃষ্ঠের পরিহাস। সে রাণা হয়েও রাণা পদের মর্যাদা ও সম্মান বজায় রাখতে পারেনি। তাকে সব কাজে মোটামুটি ভাবে বুদ্ধি যোগাতেন ও সাবধান করতেন তার মা, কারমেতনবাঈ। কিন্তু তিনি আজ পরলোকে। রাণা পদ মর্যাদার কত গুরুত্ব বিক্রমাজিৎ সিংহ নিজেও সেটা পরিষ্কার ভাবে জানে না।

রাণা, রাজপুতদের আরাধ্য দেবতা। সে রাণা বালক হলেয় রাজভক্ত রাজপুতেরা তাকে দেবতার মতো পুজো করে। এটা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অবশ্য পালনীয অনুশাসন। সে অনুশাসন সহজে অবহেলা করতে চায়না। কিন্তু অনুশাসনের সীমা ছাড়িয়ে গেল তা' অবশ্যই লঙ্ঘনীয়। রাণা যদি দুবাচারী হয়, রাজ্য নষ্টের আশঙ্কা দেখা দেয, তবে সে রাণা দেবতা ভাবাপন্ন রাণা নয। তখন প্রজারা তাকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, ও পদচ্যুত করে। রাজপুত বিধান গ্রন্থে এ কথা পরিষ্কার ভাবে বলা আছে। সাধারণ ভাবে রাজপুত রাণারা প্রজাদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন করেনা। কারণ রাজারা ভালভাবেই জানে যে, প্রজারা তাদের যে ভালবাসা, পুজো ও ভক্তি দেখায়, তা' রাজপুতবিধান গ্রন্থের অনুশাসনের ফলেই সম্ভব হয়ে থাকে।

মেবারের অধিপতিগন 'একলিঙ্গকা দেওয়ান' অথবা একলিঙ্গের প্রতিনিধি উপাধি পেয়ে থাকেন। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ নিজেও এ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বিক্রমাজিৎ সিংহ এ সবই জানে। কিন্তু তবুও সে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। তার ধ্যান-ধারণা অন্যান্য রাণাদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। সে মনে করে তার রাজ্যের প্রজারাই তাকে উৎখাত করে, তাকে সরিয়ে অন্যকে রাণা করতে চইছে। প্রজাদের মনে অবশ্য এ ধরনের কোন চিন্তাই ছিল না। বিক্রমাজিৎ-এর একটানা অত্যাচার, উৎপীড়ন, ও শাসন তাদের এ চিন্তায় টেলে এনেছে। প্রজারা আগের রাণাদের দেখেছে এবং এখন বিক্রমাজিৎ-কেও দেখছে। সুতরাং তফাৎটা তারা অনায়াসেই বুঝতে পারে।

দীর্ঘ লম্বা চিঠি। লম্বা ইতিহাস। এ সমস্ত সংবাদ মীরাবাঈ জানে।

তার চিতোর জীবনে এ সমস্তই দেখেছে শুনেছে। তবুও চিতোরের সাধকেরা মীরাবাঈ এর অবগতির জন্যে এবারে সংবাদ টা বিশদ ভাবেই পাঠিয়েছে।

পত্র লম্বা হলেও তাকে যখন পাঠানো হয়েছে, তখন পড়তেই হয়। মীরাবাঈ পাতা উলটিয়ে আবার পড়তে শুরু করলো ঃ

আপনি জানেন, অতীতের রাণারা পুরাণকে বেদের মত অতি পবিত্র জ্ঞান করতো। বীর্য্যবান রাজপুতগণের ধারনাও এ একই। তারা মনে করে, তাঁদের পূজনীয় পিতৃপুরুষের মহতী কীর্ত্তি ও লীলার একমাত্র সাক্ষী এই পুরাণ। সেই কারণেই তারা বীরত্ব, মহত্ব, ও সন্ন্যাস ধর্মের জ্বলন্ত আদর্শ স্বরূপ দেবাদিদেব মহাদেবকে বিশেষ ভক্তির সঙ্গে পূজা করে থাকে। শিব রাজপুতদের, বিশেষত ঃ মেবারী রাজপুতদের, প্রধান উপাস্য দেবতা। আপনি জানেন যে, মেবারে একলিঙ্গদেবের যত মন্দির আছে, সমস্ত দেব-বিগ্রহের সামনেই তাদের প্রিয়তম বাহন বৃষভের ধাতবমূর্তি।

আপনি এ কথাও জানেন যে, রাণাকুলের বংশধরেরা একলিঙ্গদেবের পুরোহিতদের বিশেষ ভাবে সম্মান করতেন। এঁদের গোস্বামী উপাধিতে ভূষিত করতেন। চিতোরে এঁরাই বর্ণ শ্রেষ্ঠ সম্মানীয় ব্যক্তি। এরাই চিতোরের সমস্ত ধর্মকে ধারণ করে আছেন। জনগণের প্রতি ধর্ম-গ্রন্থের অনুশাসন আরোপের দায়িত্ব এঁদের। জনগণকে সুপথে চালিত করা; মনে ধর্ম ভাব জাগিয়ে তোলা এবং চিতোরে একলিঙ্গদেবের প্রচার ও প্রসারের কাজ চালিয়ে যাবার পুণ্য কর্ত্তব্য এঁরাই পালন করে থাকেন। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই রাজকার্য্যে এরাই সহায়ক। এঁদের জীবন যাত্রা কঠোর নিয়মে ও অনুশাসনে বাধা। এঁরা সারা জীবন কৌমার্য্য ব্রত পালন করেন এবং অন্তিমকালে পালিত শিষ্যের হাতে নিজেদের গুরু ভার অর্পন করে ইহলোক ত্যাগ করেন। শৈব পুরোহিতগণ আবার নিজেদের কপালে অর্দ্ধ চন্দ্র চিহ্ন ধারণ করেন। মস্তকে জটাভার, জটাকলাপ গুচ্ছাকারে মস্তকে জড়িয়ে রাখেন। তার মধ্যে একটি বিল্বপত্র ও পদ্মবীজের মালা একত্রে গাঁথা থাকে। তাঁদের সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখা। পরণে গৈরিক বসন। তাঁরা নিজেদের আত্মীয়-পরিজনদের মৃতদেহ না পুড়িয়ে বদ্ধ পদ্মাসন ভাবে সমাধিস্থ করেন। এবং সেই সমাধির ওপর এক-একটি মাটির স্তূপ তৈরী করে দেন। ফলে রাশি রাশি মাটি প্রায় চূড়াকারে স্তুপীকৃত হতে থাকে। সময়ে সময়ে শুদ্ধাচারিণী যোগিনীদেরও পুরোহিতের অনুপস্থিতিতে এ কাজ শেষ করতে দেখা যায়। আপনি জানেন যে, মেবারে এমন অনেক গোঁসাই আছেন, যাঁরা কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করে শিল্প, বাণিজ্য, ও সেনাদলে যোগ দিয়ে, জীবিকা নির্বাহ করেন। বণিক গোস্বামীগণ ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বৃহৎ ও সমৃদ্ধতম সম্প্রদায়। এই ধরনের সম্প্রদায় মেবারে অনেক আছেন। রাণারা তাঁদের বিশেষ ভাবে অনুগ্রহ করে থাকেন। এক কথায় বলা যায়, এই গোস্বামী সম্প্রদায়ই ধর্মের পুরোধা এবং ধর্মকে ধারণ করে আছেন। রাণারা যেমন এঁদের গোস্বামী পদে ভূষিত করেন, তেমনই এই সব সম্প্রদায়ও মেবারের অধিপতিগণকে 'একলিঙ্গকা দেওয়ান' বা একলিঙ্গের প্রতিনিধি পদে বরণ করেন।

বিক্রমাজিৎ সিংহ জীবনে এ সমস্তই দেখেছে। এবং নিজেও জানে। কিন্তু তবুও সে এ সব সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত হানতে শুরু করেছে। তার ধারণা এই সব সম্প্রদায় এখন আর ধর্মের অনুশাসন মেনে চলছে না। ধর্মগ্রন্থের বিধান অনুসারে কাজ করছে না। রাণাকে রাজকার্যে সাহায্য করছে না। শুধু সরকারের বিত্ত ভোগ করছে আর নিজেদের সম্পত্তি বাড়াবার চেষ্টা করছে। কারণ তারা যদি ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতো এবং একলিঙ্গদেবের একনিষ্ঠ পূজারী হতে পারতো, তাহলে আপনি চিতোরে এত গিরিধারীলালের মন্দির তৈরী করতে পারতেন না। বৈষ্ণব ধর্মের এত প্রচার অথবা প্রসারের কাজ সম্ভব হতো না। এদের অলসতা ও দৃষ্টিহীনতার জন্যেই এ কাজ সম্ভব হয়েছে এবং ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে।

মীরাবাঈ পত্রের এই পর্য্যায়ে এসে থামতে বাধ্য হলো। সে আপন মনেই বলে উঠলো: ভুল। বিক্রমাজিৎ সিংহ ভুল বুঝেছে। চিতোরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের পেছনে মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ও ভোজরাজ দাঁড়িয়ে আছেন। এঁদের সহযোগিতা না পেলে মীরাবাঈ জীবনেও চিতোরে এত মন্দির স্থাপন করতে পারতো না। এটা সহজ ও স্বাভাবিক কথা। চিতোরের সকলেই এটা জানে এবং বিক্রমাজিৎ-এরও অজানা থাকার কথা নয়। কারণ সে মহারাণা সংগ্রাম সিংহের সেজো ছেলে এবং বরাবরই চিতোরে মানুষ। বিক্রমাজিৎ-এর এই ধরনের ধ্যান-ধারনা গড়ে ওটার কোনো যুক্তি মীরাবাঈ খুঁজে পেলো না। যাইহোক, মীরাবাঈ আবার পড়তে শুরু করলো। ওরা লিখেছে:

বিক্রমাজিৎ সিংহ কোনদিনও এইসব সম্প্রদায়কে ভাল চোখে দেখেনি। আজও দেখে না। ফলে এই সব সম্প্রদায়ও রাণার প্রতি অসন্তুষ্ট। অন্য দিকে বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা তো রাণাকে দেখতেই পারে না। প্রজারাও বিপরীত মুখী এবং গোপন পরিকল্পনায় ব্যস্ত। ঠিক এই পরিস্থিতিতে রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহ যেদিন সভা-গৃহে প্রত্যক্ষ ভাবে করিম চাঁদের মত একজন প্রবীন সদস্যকে অপমান করে বসলো, সে-দিন বিক্রমাজিৎ সিংহ নিজের বিপদ নিজেই ডেকে নিয়ে এলো। সভাস্থ সকলে সোজাসুজি রাণাকে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং তার বিনা অনুমতিতে সভাগৃহ ছেড়ে চলে গেল। অতএব আপনি বুঝাতেই পারছেন যে, চিতোরের আকাশে আবার দুর্যোগের মেঘ জমতে শুরু করেছে।

এই ঘটনার পরবর্তী সংবাদ হচ্ছে, সভাস্থ সকলে এবং সর্দারেরা রাজভবন পরিত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসলো। আপনি জানেন না যে বিক্রমাজিৎ-এর ব্যবহার কোনদিনও কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। চিতোরের কোন মানুষ তার চরিত্র এবং ব্যবহারে সন্তুষ্ট নয়। আপনার ওপর সে যে অবিচার ও অত্যাচার করেছে, তা' চিতোরে ইতিহাস হয়ে আছে। কিন্তু তব ও তাকে রাণার সম্মান না দিয়ে উপায় ছিল না। সেটাও আপনি জানেন। সেই কারণেই এতদিন সকলে নীরবে সহ্য করে এসেছে। কিন্তু বিক্রমাজিৎ এর সে-দিনের ব্যবহার সকলকে অবাক করে দিয়েছে। আলোচনায় সে-দিন ঠিক হয়েছে যে, যদিও বিক্রমাজিৎ সিংহ চিতোরের

প্রতিভু, তব ও তাকে এভাবে রাজ্য চ লাতে দেওয়া যেতে পারে না। এর একটা বিকল্প বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। সে আলোচনা সভায় উদয়ের কথাও উঠেছে। অনেকে বলেছে, মহারাণা সংগ্রাম সিংহের ছোট ছেলে উদয়। সে বিক্রমাজিৎ-এর ভয়ে কুম্ভল দ্যুর্গে আত্মগোপন করে আছে। আমবা, সমস্ত সর্দারেরা, যদি সম্মিলিত শক্তি নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিতে পারি, তবে সে আমাদের ভরসায় আবার চিতোবে ফিরে আসতে পারে এবং তখন তাকে রাণা পদে অভিষিক্ত করে, আবার নতুন করে রাজ্য শাসনেব প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ-ব্যাপারে অনেকের আপত্তিও দেখা যাচ্ছে। অনেকে বলছে: উদয় এখনও ছেলে মানুষ। রাজ্য শাসনের নীতি তার কিছুই জানা নেই। এ ছাড়া চিতোরে এখন যা অবস্থা, তাতে শাসন ফিরিয়ে আনতে গেলে একজন শক্ত লোকের দরকার। বিক্রমাজিৎ-কে সরিয়ে যদি উদয়-কে নিয়ে আসা যায়, তবে তার সঙ্গে বনবীরের মতানৈক্য ঘটবেই ঘটবে। ফলে চিতোরে আবার সেই ঝগড়া, বিবাদ এবং বিপ্লব দেখা দেবে। এবং আমাদের মনে হয় চিতোরের মূল সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। সুতরাং আপৎকালীন বন্দোবস্ত হিসাবে বণবীরের হাতেই শাসন ভার তুলে দেবাব কথা চলছে। সবাই বলছে, দেখা যাক বণবীর কি করে। তবে এ-কথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে, বণবীর বিক্রমাজিৎ-এর চেয়ে অনেক শক্ত মানুষ। তাব শাসন ব্যবস্থাও কঠোর। রাজ্যের অনেক মানুষ তাকে ভয় করে চলে। গুজরাট, বুন্দী ও অম্বরের রাজারাও তাকে সম্মান করে। রাজ্যের বাইরেও তাব নাম ডাক আছে। সে ইচ্ছা করলে ধর্মের বিধান অথবা অনুশাসন আরোপ করে, একটা সুষ্ঠ নীতির মাধ্যমে রাজ্য শাসন চালিয়ে নিতে পারে। এ-ধরনেব প্রস্তাবে অনেকে সম্মতি জানিয়েছে। আবার অনেকে বিরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে: বনবীর অত্যাচারী, শোষক ও দুর্নীতি পরায়ণ। তাব হাতে রাজ্যের শাসন ভার তুলে দিলে রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেবে। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। বনবীর সুযোগ বুঝে সমস্ত ধন-দৌলত লুঠ করে নিয়ে, নিজেকে ধনী করে তুলবে। সে অকারণ নিজের প্রভাব ও প্রতাপ খাটাবে।

আপনি শুনলে অবাক হবেন যে, চিতোর রাজ্যে যখন এই ধরনের আলোচনা চলছে, তখন বিক্রমাজিৎ সিংহ এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাকে সরিয়ে অন্য কাউকে যে রাণা করবার গোপন প্রস্তুতি চলছে, এ-ব্যাপারে সে কোন খবরই রাখে না। কিন্তু আমরা জানি বনবীর বসে থাকবার পাত্র নয়। সে গোপনে লোক লাগিয়ে সমস্ত খবর বার করে নিচ্ছে। জেনে নিচ্ছে, কোথায় আলোচনা সভা বসেছে। কে কে যোগ দিচ্ছে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কোন আগ্রহ-ই দেখাচ্ছে না। তবে আমাদের মনে হয় যে, পরবর্তী পর্য্যায়ে আলোচনায় কী দাঁড়ায় তার ওপর সে নজর রাখছে।

ভক্ত সনাতন সামনে এসে দাঁড়ালো। মীরাবাঈ মুখ তুলে তাকালো। সনাতন বললো: পাশের প্রাঙ্গনে অনেক লোক জমা হয়েছে। আপনার যাবার সময় হয়েছে। আজকে তারা আপনার গান সম্পর্কে কিছু শুনতে চায়।

মীরাবাঈ বিস্মিত হয়ে বললো: আমার গান।

সনাতন: হ্যাঁ! আপনার গান?

ঃ মানে ?

ঃ মানে, আপনার গানের মূল উৎস কোথায়। সংগীত রচনার মাধ্যমে আপনি কি প্রকাশ করতে চাইছেন। ভক্তি, প্রীতি, প্রেম না বেদনা।

একটু চুপ করে থেকে মীরাবাঈ বললো ঃ বুঝেছি। আচ্ছা তুমি আসরে গিয়ে বসো। আমি আসছি।

সনাতন চলে গেল। মীরাবাঈ একটু চিন্তা করলো। আজকের আসর তাহলে একটু ভিন্ন স্বাদের হবে। শ্রীবৃন্দাবনের জনসাধারণের কাছ থেকে এ ধরনের প্রশ্ন অথবা কোন প্রস্তাব আগে আসেনি। সুতরাং মীরাবাঈ-কে আগে এ ব্যাপারে কিছু ভাবতে হয়নি। তবে আজ এ প্রশ্ন যখন উঠেছে, তখন সে তার নিজের সংগীত সম্পর্কে বিশেষ আলোচনাই করবে। যাতে সকলে তার গানের মূল উৎস খুঁজে পায়। তার সংগীতকে আস্বাদন করতে পারে। কারণ মীরাবাঈ-এর বিশ্বাস যে সংগীতের তন্ময়তা অথবা সংগীতের নিবেদনই মানুষকে উত্তোরণের পথ করে দেয়। ভক্তি-ভাবনাই মানুষকে ভাগবত মুখী করে। মানুষকে ভগবানের কাছে পৌঁছে দেয়।

যাইহোক, আজকের আসরের বৈপরীত্য মীয়াবাঈ-কে ভালভাবেই আকর্ষণ করলো। মীরাবাঈ চিতোরের চিঠি-টা ভাঁজ করে ভাল করে রেখে দিল। ভাবলো লম্বা চিঠি। আবার একবার ভালো করে পড়বে। এবারের চিঠিতে চিতোরের যে সংবাদ এসেছে তার অনেক কিছুই তার জানা। চিতোরের নানা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা সে আগেও শুনেছে। চিতোরে থাকতে নিজেও সেই সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছে। কিন্তু চিতোরের বর্তমানে প্রবাহিত ঘটনাবলী তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। বনবীর যদি সত্যিই রাণা হয়ে বসে, তাহলে চিতোরের দারুণ দুর্দিন বলতে হবে। যাইহোক, চিতোর থেকে পরবর্তী পত্র না আসা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মীরাবাঈ চিন্তিত মনে আসরের দিকে পা বাড়ালো।

॥ চব্বিশ ॥

আসরে পেঁাছে মীরাবাঈ রীতিমত অবাক হল। জমাটি আসর। এমন পূর্ণ আসর মীরাবাঈ অনেক দিন পায়নি। আসরে ভীড় না হলে ভাগবত-ব্যাখ্যা অথবা আলোচনা জমে না। সাধনা নিরিবিলি, নির্জনে। কিন্তু আলোচনা জনগণে।

মীরাবাঈ হাজির হতেই উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়ালো। মীরাবাঈ হাত ইশারায় তাদের বসতে বললো। তারপর সুবাসিত ধূপ-ধুনোর মধ্যে নিজের আসনে বসে বক্তব্য রাখতে লাগলো। মীরাবাঈ বলতে শুরু করলো ঃ আপনারা আজ আমার গানের মূল উৎসের কথা জানতে চেয়েছেন। সংগীত রচনার মাধ্যমে আমি কি প্রকাশ করতে চাইছি। ভক্তি প্রীতি, প্রেম না বেদনা।

আমার গান মূলতঃ ভক্তি কে কেন্দ্র করে। ভক্তি-ভাবনাকে কেন্দ্রবিন্দু করে এবং ভক্তি-বিশ্বাস কে অখণ্ড রেখেই আমার জীবন চর্য্যা। সংগীত রচনা ও গান

গাওয়া। আমার গানের মূল উৎস কৃষ্ণ-ভজনা। কৃষ্ণকে দর্শন পাবার তীব্র আকুতি ও তাকে না পাবার তীব্র বেদনা-বোধ। সুতরাং আমার গানকে বিচার করতে গেলে ভক্তির মাধ্যমে আসতে হবে। কারণ আমার রচিত পদ ধর্ম-বিশ্বাস ও ভক্তি-ভাবনাকে ঘিরে আছে। আমি মনে করি যে, আপনারা যদি ভক্তি-ভাবনা এবং ধর্ম-বিশ্বাস কে বাদ দিয়ে আমার রচিত পদ বিচার করেন, তাহলে আমার সংগীতের প্রতি অবিচার করা হবে। আমার সাধনার মূল কথা, প্রতিটি মানুষের জন্ম ও পুনর্জন্মের যে বৃত্ত, তা' থেকে নিজেকে বাইরে নিয়ে আসা এবং অতি মানবীয় শক্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই সাধনার পথে অগ্রসর হবার যে মাধ্যম আমি বেছে নিয়েছি, সেটা ভক্তি, পুজো ও ধর্ম-বিশ্বাস। এবং এ-ব্যাপারে আমি পরিপূর্ণ ভাবে আশ্রয় নিয়েছি শ্রীবৃন্দাবন লীলার শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কাছে। আমার মনে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণই আমাদের আশ্রয় দাতা ও মুক্তিদাতা।

আমি যে কৃষ্ণকে আশ্রয়দাতা ও মুক্তিদাতা হিসাবে ভজনা করি, সে কৃষ্ণ মহাভারতের বীর যোদ্ধা নয়। সে কৃষ্ণ ভাগবত পুরাণের ননী চোর, গোচারক ও প্রেমিক-কৃষ্ণ। বৃন্দাবন লীলার কৃষ্ণ, গোপীপরিবৃতা কৃষ্ণ। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। আমি কৃষ্ণকে ভজনা করি গোপীরূপে। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, গোপীরূপে কৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি ও ভালবাসা সেটাই শ্রেষ্ঠ। কারণ তাতে গভীরতা অনেক বেশী।

ভাগবত গীতায় ভক্তির যথার্থ অর্থ বোঝাতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন ঃ

আমার প্রতি মন রাখো। আমার প্রতি অনুরক্ত থাকো। আমার জন্যে জীবন উৎসর্গ করো। আমি বিশ্বাস করি এবং আমি অঙ্গীকার করছি, তুমি আমার দেখা পাবে। কারণ তুমি আমার প্রিয়।

আমি এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে সারা জীবন কৃষ্ণকে অনুসরণ করে এসেছি। জীবনের দুর্দিনে ও সুদিনে, বিপদে ও আপদে আমি কৃষ্ণের সহচরী বলে মনে করেছি। কৃষ্ণকে ভক্তি ও পুজোর মাধ্যমে সেবা করাকেই জীবনের সব পাওয়ার শেষ পাওয়া বলে মনে করেছি।

আপনারা জানেন যে, ভাগবত পুরানে 'ভক্তি' শব্দের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে 'ভক্তি' এমন একটা অনুভূতি যা মানুষকে আচ্ছন্ন করলে মানুষের বাক্ বন্ধ হতে পারে। দু'চোখ বেয়ে জলের বন্যা বইতে পারে। আত্মসুখের উত্তেজনায় মাথার চুলে এবং সমস্ত মুখ-মণ্ডলে শিহরণ জাগতে পারে। মানুষ এই অনুভূতির প্রভাবে কখনও হয়তো কাঁদতেও পারে বা হাসতেও পারে। এর প্রভাবে মানুষ অজ্ঞান বা অচেতন ও হতে পারে। মানুষের এই অবস্থা হলে আমরা বলি ভক্তের ভক্তির ফলে ভাব-সমাধি হয়েছে। ভক্তের কৃষ্ণ দর্শন হচ্ছে। তাঁর বাঁশীর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। ভাব-সমাধিতে তাঁকে গভীর ভাবে স্মরণ করছে। ভক্ত এবং ভগবান এক আত্মা হয়েছে। ভক্ত কৃষ্ণের কাছে তাঁর বীরত্বের কাহিনী শুনছে। তাঁদের মধ্যে ভালবাসার কথা হচ্ছে। যতক্ষণ না সেই ভক্ত ভাব-সমাধি

থেকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে আসছে, ততক্ষণ আমরা তাঁকে অতি মানবীয় বলে মনে করি।

এই ভক্তিকে আবার সাধারণ ভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়। বাৎসল্য, দাস্য, সাখ্য ও মাধুর্য।

পুত্রের প্রতি পিতা-মাতার যে ভক্তি-ভালবাসা তাকে বাৎসল্য ভাব বলা হয়। যেমন কৃষ্ণের প্রতি মা-যশোদার যে বাৎসল্য ভাব বা ভক্তি-ভাব। আমার এই বাৎসল্য ভাবের গান খুব বেশী নেই। এর পরে আমি আসছি 'দাস্য' অথবা 'দাসী' ভাব। ভগবানের কাছে ভক্তের উপস্থিতি 'দাস' অথবা 'দাসী'রূপে।

আমার এই পর্যায়ে অনেক গান আছে। আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে নিজের ভক্তি-ভালবাসা অনেক গানের মাধ্যমে নিবেদন করেছি। আমার রচিত সেই দাস্য-ভাবের একটি সংগীত পরিবেশন করেই আজকের আসর আমি শেষ করবো। ভবিষ্যতে যদি সুযোগ আসে তবে আমি 'সাখ্য' ও 'মাধুর্য' ভাব নিয়ে আলোচনা করবো। আপনারা গোলমাল করবেন না। ধৈর্য্য ধরে বসুন। শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করতে গেলে সেবক রূপে আসতে হয়। সেবকের ভাব অভ্যাস করতে হয়। একে বলা হয় অভ্যাস যোগ। আপনারা সেবক ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি অর্পণ করুন। আমি সংগীত পরিবেশন করছি।

মীরাবাঈ গান ধরলো ঃ

"মীরা কে প্রভু সাঁচী দাসী বনাও
ঝুঠে ধংধাঁসুঁ মেরা ফংদা ছুড়াও॥
লুটেহী লেত বিবেক-কা ভেরা
বুধি বল যদপি করুঁ বহুতেরা।
হায় রাম নহিঁ কছু বস্ মেরা
মরত হুঁ বিরস প্রভু ধাও সবেরা॥
ধরম উপদেশ নিত প্রতি সুনতী হুঁ
মন কুচাল সে ভী ভরতী হুঁ॥
সদা সাধু সেবা করতী হুঁ
সুমিরণ ধ্যানমেঁ চিত ধরতী হুঁ॥
ভক্তি-মার্গ-দাসী কো দিখাও
মীরাকে প্রভু সাঁচী দাসী বনাও॥"

মীরাবাঈ এর গান সমস্ত আসরে আবেশ ছড়াতে লাগলো এবং ধীরে ধীরে তা শেষ হয়ে এলো। মীরাবাঈ এখন গভীর ধ্যানে মগ্ন। দু'চোখ মুদ্রিত। পাশে সনাতন। সে'ও ধ্যানের অবগাহনে আচ্ছন্ন। আসর স্তব্ধ। উপস্থিত সকলেরই মন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পিত। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটলো। মীরাবাঈ-এর মুদ্রিত নয়ন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো। আসরের দু'জন ভক্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললো ঃ আপনি গানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে যা' নিবেদন করলেন, যে আকুতি জানালেন, তার অর্থ আমাদের জানান। গানের কলির ব্যাখ্যা করে আমাদের আলোকিত করুন। আমাদের অবিদ্যা

দূর করুন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমরা আমাদের ভক্তি-ভাবনা আন্তরিক ভাবে অর্পণ করতে চাই।

ভক্ত দু'জনের কথা শুনে মীরাবাঈ খুশি হয়ে বললো : আপনারা আমার রচিত গানের অর্থ জানতে চেয়েছেন জেনে আমি খুশি। আমি আনন্দিত। আমি আমার গানের ব্যাখ্যা করছি। আপনারা তা' অনুভব করুন এবং ভক্তি মার্গের পথ অন্বেষণ করুন। আমি আগেই বলেছি যে, এখানে আমি 'দাসী'ভাবে আমার মনের ইচ্ছা, আমার আন্তরিকতা ও ভক্তি ভাব শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করেছি। আমার গানের অর্থ : হে প্রভু মীরাকে তোমার দাসী করে নাও। আমার মিথ্যা কাজের বাঁধন খুলে দাও। আমার বিবেকের ঘর লুটে নিচ্ছে। বহুবিধ প্রয়োগ করেও আমি কিছু করতে পারছি না। হায় রাম আমি দেখছি যে কিছুই আমার বশে নেই। আমি মরছি, আমি বিনাশ হয়ে পড়ছি। প্রভু তুমি শীঘ্র এস। ধর্মের উপদেশ নিত্য শুনছি। পাপকে ভয় করে মনকে সর্বদা পাপ থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছি। সদা সাধু সেবা করছি। স্মরণ ধ্যানে চিত্ত আমার নিত্যই রত। এখন তোমার 'দাসী'কে ভক্তিমার্গের পথ দেখাও। হে মীরার প্রভু, মীরাকে তোমার দাসী করে নাও।

সভায় সে দিন সকলেই মীরাবাঈ কে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। মীরাবাঈ সকলের প্রীতি ভালবাসা মাথায় নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলো।

॥ পঁচিশ ॥

ধ্যান-ধারণা আর পূজো-পার্বনের মাঝেই মীরাবাঈ এর মন চিতোরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। চিতোর থেকে বেশ কিছু দিন হল কোন পত্র আসে নি। বিক্রমাজিৎ সিংহ কে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বনবীর কে রাণা করবার আয়োজন চলছে। এটা গত পত্রের সংবাদ। কিন্তু তারপর ?

মীরাবাঈ এ-সমস্ত কিছু ভাববে না ভাবলেও ভাবতে হয়। ভাবনা আপনিই আসে। চিতোর তার যৌবনের লীলাভূমি। যৌবনে যোগিনী হলেও তার যোগ-সাধনার মূল ভূমি চিতোর। স্বামী ভোজরাজ এবং মহারাণা সংগ্রাম সিংহের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবার ফলেই, মীরাবাঈ-এর সাধনার উত্তরণ ঘটা সম্ভব হয়েছে। এ-কথা সর্বজন স্বীকৃত। মীরাবাঈ এ'দের কাছে নিঃসন্দেহে ঋণী। সেই কারণেই চিতোরকে সে ভুলতে পারে না। ভুলে যাবে ভাবলেও ভোলা যায় না। চিতোরের বর্তমান অশান্ত ঘূর্ণি তাকেও মাঝে মাঝে আবর্তে ফেলে দিয়ে আনন্দ পায়। চিতোরের একটা সংবাদ এলে মীরাবাঈ জানে যে তার মন স্বাভাবিক ভাবেই অশান্ত হয়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায়।

মীরাবাঈ-এর ভাবনা-চিন্তার এক সপ্তাহের মধ্যেই চিতোরের সংবাদ এলো। চিতোরের ভক্ত-সম্প্রদায় মীরাবাঈ-কে জানালো যে পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনায় ঠিক হয়েছে যে আপাততঃ উদয় সিংহ যেমন আছে থাক। তাকে এখনই ডাকতে

গেলে আবার একটা যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং বনবীরকেই সুযোগ দেওয়া যাক। দেখা যাক বনবীর কি করে। কেমন চালায়। যদি সে প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে, যদি সর্দারদের যথাযথ সম্মান না দেয়, অথবা ক্ষমতা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে, কিম্বা নিজের প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করে, তখন বিকল্প বন্দোবস্তের কথা ভাবা যাবে। তখন উপায়হীন হয়ে উদয়কেই রাণা পদে অভিষিক্ত করবার প্রস্তুতি চালাতে হবে। কারণ আইনতঃ তারই রাণা হওয়া উচিত। চিতোরের রাণা-পদ বিক্রমাজিৎ এর পর তারই প্রাপ্য।

সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করে, বনবীরের কাছে পাঠানো হয়েছিল। বনবীর সোজাসুজি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। বনবীর রাণা হতে রাজী হয় নি। সকলেই অবাক। এমন কথা কেউ কল্পনাও করেনি। সকলেই আশা করেছিল যে প্রস্তাব পাঠালেই বনবীর রাজি হয়ে যাবে। কিন্তু বনবীর বলে পাঠিয়েছেঃ বিক্রমাজিৎ সিংহ আইনত রাণা। তার অবর্তমানে উদয় সিংহ। আমার রাণা হবার কোন প্রশ্নই আসে না।

বনবীরের এমন বিনয় কেউ জীবনে শোনেনি। কেউ আশা করেনি। বনবীরের দীর্ঘদিনের চরিত্রের কথা সকলেরই জানা। কিন্তু সে দিনে তার চরিত্রবল দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। ভেবেছিল, বনবীর হয়তো চরিত্রের দিক থেকে পালটেছে।

কিন্তু পরে দেখা গেল, বনবীর বনবীরই আছে। একটুও পালটায়নি। আসলে সে এ-ব্যাপারে খুব ধীর স্থির ভাবে এগুতে চাইছে। সে চাইছে, রাজ্যের সর্দারেরা ও সাধারণ মানুষ তাকে আরও বেশী পীড়াপীড়ি করুক। তার কাছে আরও বেশী অনুরোধ আসুক। তখন বলা যাবে যে, সকলের অনুরোধেই সে রাণা হচ্ছে। এ-ব্যাপারে তার কোন লোভ বা লাভ নেই। কোন গোপন আশাও সে পোষণ করে না।

অবশ্য ঘটনা সে-দিকেই মোড় নিল। রাজ্যের সর্দারেরা তাকে আরও বেশী অনুরোধ করতে লাগলো। রাণা হবার জন্যে লোভ দেখাতে লাগলো। ফলে কী হলো জানেন? ফলে যা ঘটলো তা অবিশ্বাস্য। কেউ বিশ্বাস করবে না। এ সংবাদ শুনে আপনার মানসিকতা কী হবে জানি না। চিতোরে আপনার নিবিড় সম্পর্ক। কিন্তু তবুও আপনাকে না জানিয়ে উপায় নেই। তাই জানাই যে, তার ফলে একদিন গভীর রাতে সর্দারদের সহযোগিতায়, বনবীর বিক্রমাজিৎ-কে হত্যা করে নিজে রাণা হয়ে বসলো।

মীরাবাঈ পত্রের এই লাইনটা দু'বার পড়লো। বিক্রমাজিৎ-কে হত্যা করা হলো। বিক্রমাজিৎ সিংহ তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তার ওপর অনেক অবিচার চালিয়েছে। কিন্তু তা' হলেও সে তার স্বামীর ছোট ভাই, তার একান্তই আপনজন। বনবীর বিক্রমাজিৎ কে হত্যা করেছে, এই বীভৎস দৃশ্যটা ভাবতে ভাবতেই মীরাবাঈ অজ্ঞান হয়ে গেল।

সনাতন ঘরে ছিল না। সে বাইরে ভক্তবৃন্দদের সংগে শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করছিল। কিন্তু ঘরের মধ্যে একটা অশনি-সংকেত পেতেই সে দৌড়ে

এসে থমকে দাঁড়ালো। এমন ঘটনার জন্যে সনাতন একটুও প্রস্তুত ছিল না। এমন ঘটনা ঘটবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সনাতন জানে মীরাবাঈ পরিপূর্ণ সুস্থ। প্রতিদিন সে সভায় যাচ্ছে। নানা বিষয়ে আলোচনা করছে। নানা জনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। এবং নানাভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত জনবৃন্দের ভাবনার ঘর সমৃদ্ধ করছে। তারা তার গানে ও কৃষ্ণনামে আপ্লুত হয়ে ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। এ-সবই সনাতন দেখছে। সেখানে অসুস্থতার কোন চিহ্ন নেই। অথচ আজকে আকস্মিক ভাবে এই বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে সনাতন প্রথমে বুঝতেই পারলে না যে তার কি করা উচিত। সে ছুটে বাইরে এসে ললিতাকে খবর দিল। ললিতা বিস্মিত হয়ে ছুটে এলো। তারপর ডাক্তার-বদ্যি এবং সব শেষে ঘর ভরা শিষ্য-শিষ্যা ও আশ্রমিকার দল।

ডাক্তার বললেনঃ আকস্মিক উত্তেজনার ফল। ভয়ের কোন কারণ নেই। পূর্ণবিশ্রাম প্রয়োজন।

মীরাবাঈ কে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া হলো। লোকজন বড় একটা আসে না বললেই চলে। শুধু ললিতা ও সনাতন। ললিতা মীরাবাঈ-এর সেবা শুশ্রূষার দায়িত্বে।

ললিতার সেবা যত্ন ও শুশ্রূষায় মীরাবাঈ সাত দিনেই সুস্থ হয়ে বিছানায় উঠে বসলো। সবাই খুশি। ললিতা-সনাতন দায়িত্ব মুক্ত হলো। তবে সভা-সমিতি ও সংগীত আপাততঃ বন্ধ। লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ চলতে পারে। ডাক্তারের কথা মত সেই ভাবেই চলতে লাগলো।

আরও সাত দিন পরে মীরাবাঈ কোন এক সন্ধ্যায় নিজের ঘরে আপন মনে গুন গুন করে কৃষ্ণ প্রেমের গান গাইছিল। ঘরে কেউ নেই। ললিতা ও সনাতন গেছে আজকের জমাটি জনসভায়। কৃষ্ণের রাসলীলার ব্যাখ্যা শুনতে। সেখানে মীরাবাঈ-এর ও যাবার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে হয়ে ওঠে নি। ঘরের মধ্যে আপন মনে গান গাইতে গাইতে আকস্মিক ভাবেই মীরাবাঈ-এর চিতোরের চিঠিটার কথা মনে এলো। তার মনে পড়লো, সে-দিন চিঠি-টা পড়তে পড়তেই সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। বনবীর বিক্রমাজিৎ সিংহকে হত্যা করে নিজে রাণা হয়ে বসেছে। এই অংশে এসেই তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল এবং শেষে অজ্ঞান। কিন্তু তারপরে চিঠি-টা আর পড়াই হয়নি। কিন্তু সে জানে যে, সেই চিঠি-টা তার বালিসের নীচেই আছে। সনাতন রেখেছে। মীরাবাঈ এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে চিঠি-টা বার করলো। ঘরে কেউ নেই। অখণ্ড অবকাশও হাতে। সুতরাং জিরিয়ে-জারিয়ে পড়তে কোন অসুবিধা নেই। চিঠি-টা খুলতে গিয়ে মীরাবাঈ-এর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। চিঠি-তে আবার কোন দুঃসংবাদ নেই তো?

একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সে। তারপর চিঠি-টা খুলে পড়তে শুরু করলো। চিতোরের এবারের চিঠি-টা অনেক বড় এবং নানা সংবাদে ঠাসা।

বিক্রমাজিৎ-এর হত্যার পরে চিতোরের মহিলা-মহলের অবস্থাটা জানবার জন্যে

উৎসুক হয়ে উঠলো মীরাবাঈ। পাতা ওলটাতেই নজরে এলো : বিক্রমাজিৎ-এর হত্যার পর রাজপ্রাসাদে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদের কান্না ও শোক বিক্রমাজিৎ-এর জীবনাবসান ঘোষণা করলো। কিন্তু সে-শোক বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে নি। কারণ তার পরমুহূর্তেই বনবীরের অভিষেকের আনন্দ ও কোলাহলে সে শোক চাপা পড়ে গিয়েছিল।

মীরাবাঈ চিঠি হাতে জানালার সামনে এসে আকাশে চোখ তুলে তাকালো। ভাবতে অবাক লাগে যে আজ বনবীর চিতোরের রাণা। যে, রাজবংশের কেউ নয়। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ দয়াপরবশ হয়ে এই বনবীরকে সেনাবিভাগে চাকরি দিয়েছিলেন। তার কাছে তিনি বিশ্বস্ততা ও দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন। সেই বনবীর চিতোরের রাজপরিবারে একটির পর একটি হত্যা কাণ্ড চালিয়ে আজ সে রাণা। তার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা আজ ফলবতী হয়েছে। তবে মীরাবাঈ-এর ধারণা এই বনবীরও বেশিদিন রাজত্ব করতে পারবে না। কারণ তার অপর্য্যাপ্ত লোভ ও অত্যাচারধর্মী মানসিকতা তাকে ঐ পদে টিকে থাকতে দেবে না। তাকে টেনে নাবাবে। এটা মীরাবাঈ-এর বিশ্বাস। মীরাবাঈ এর ধারণা আজ চিতোরে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন সর্বধর্ম সমন্বয়তা। এই সাগর-স্বরূপ মন নিয়ে আজ চিতোরে দাঁড়াতে হবে। লোভ-লালসা বর্জন করে দেশপ্রেমের আত্মিক-শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে, শাসন-দণ্ড হাতে নিতে হবে। দেশের মানুষকে কাছে ডেকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করতে হবে। তবেই শাসন চলবে। মীনারে বসে মানী-মানুষের মত হুকুম চালালে চলবে না। সেদিন শেষ হয়েছে। তবে মীরাবাঈ জানে যে চিতোরে আজ এমন মানুষ কেউ নেই। যাইহোক, চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, বনবীর রাণা হয়ে সকলের সহযোগিতা চেয়েছে। সে সকল সর্দারদের ডেকে সভা করে বলেছে : রাজ্য রক্ষার ব্যাপারে আপনারাই সব। আপনারাই শক্তির উৎস। আপনাদের সহযোগিতা এবং সাহসই আমাকে শক্তি যোগাবে। আমাকে রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করবে। আমি রাণা-পদের অযোগ্য। বাইরের রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। কারণ চিতোরে এখন দুর্দিন। আপনাদের সহানুভূতি পেলে, আমি সে চেষ্টাও চালিয়ে যাবার আশা রাখি। রাজ্যের অপর রাণারা, সর্দারেরা এবং সেনাপতি ও সৈন্য-সামন্তেরা যাঁরা যে পদে বহাল আছেন এবং যে পদের দায়িত্ব পালন করছেন, আপাততঃ সবই ঠিক থাকবে। কোন অদল-বদল হবে না। আপনারা আপনাদের পদমর্য্যাদা ও দায়িত্ব ভালই বোঝেন। এবং আমি জানি যে, সে দায়িত্ব আপনারা আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছেন। সুতরাং এ-ব্যাপারে আমার বলবার কিছুই নেই। পদের অদল-বদলের অর্থই হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে একটা মানসিক ক্ষোভ ডেকে আনা। এ-ব্যাপারে আমার কোন সমর্থন নেই জানবেন।

সে-দিন এই ভাবেই সভা শেষ হয়েছিল। সকলেই বনবীর-কে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। সকলেই মনে করলো বনবীর রাণা হয়ে পালটে গেছে। তার মানসিক পরিবর্তন হয়েছে। এতোদিনে রাজ্যে হয়তো একটা শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

নীতি, আইন ও ধর্মের অনুশাসন প্রবর্তিত হবে। সাধারণ মানুষ ও প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করবে। শাক্তধর্মের পুরোহিতেরা ভাবলেন, তাদের ধর্মের প্রচার ও প্রসারে বনবীর এগিয়ে আসবে। আবার বৈষ্ণবধর্মের পণ্ডিতেরা ভাবলেন, বিক্রমাজিৎ সিংহ আইন করে বৈষ্ণবধর্মের যে প্রসার বন্ধ করে দিয়েছিল, সেটা আবার চালু হবে। আবার সমস্ত মন্দিরের দরজা খুলে যাবে। সকাল-সন্ধ্যায় নিত্য পুজো শুরু হবে। সাধু-সন্ন্যাসীরা মন্দিরের চত্বরে বসে নাম-গান শুনবে।

একটা অতৃপ্ত আশা, একটা জীবনবোধের শুভ সূচনার প্রতীক্ষায় রাজ্যের সকলে অপেক্ষা করে রইলো।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। অপেক্ষাই সার হলো। বনবীর রাজ্যের সর্দার ও সেনাপতিদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা' রাখলো না। শাক্তধর্মের পুরোহিত ও বৈষ্ণবধর্মের পণ্ডিতদের কথা। কর্ণপাত করলো না। রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও প্রজাদের সুখ-দুঃখের দিকে ফিরেও তাকালো না। সে রাজ-ক্ষমতাকে সুখের উৎস বলে মনে করলো। সে মনে করলো, এমন সুযোগ জীবনেও আর আসবে না যে সুযোগের জন্যে সে সারা জীবন অপেক্ষা করে ছিল। যে সুযোগের জন্যে সে রত্না সিংহ ও বিক্রমাজিৎ-কে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। যে পদ পাবার জন্যে তাকে আজীবন রাজনীতির লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। সে পদ আজ তার হাতের মুঠোয়। সুতরাং এর সৎ ব্যবহার তাকে করতেই হবে। বনবীর রাজ্যের কল্যাণের প্রতি মনোনিবেশ না করে, নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করলো। কী করে গুছিয়ে নিয়ে, সারা জীবন ভোগ-বিলাসে কাটিয়ে দেওয়া যায়, তারই হিসাব কষতে লাগলো। এবং ধীরে ধীরে চিতোরের ধন-রত্ন অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে লাগলো। রাজ্যের সর্দার ও সেনাপতিদের কথা অমান্য করে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে নানা বিভাগে চাকুরিতে নিযোগ করতে লাগলো। আর একলিঙ্গদেবকে পুজো দিয়ে বলতে লাগলো : আপনার কৃপায় আমি রাণা হয়েছি। এখন বঞ্চিত না হই। বনবীর ধীরে ধীরে রাজ্যের সমস্ত সর্দার ও সেনাপতিদের অন্যত্র সরিয়ে দিতে লাগলো। পদ-মর্যাদার গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে নিজের হাতে নিতে লাগলো। এবং সেই সব পদে নিজের লোকদের নিয়োগ করতে লাগলো। যা'তে সমস্ত সর্দারেরা ও সেনাপতিরা বিদ্রোহ করতে না পারে। কারণ তারা একজোটে থাকলেই বিদ্রোহের সম্ভাবনা বেশী। বনবীর অতীতের সব কিছু ভেঙ্গে দিয়ে নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সীমানা বাড়িয়ে, আবার নতুন করে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করলো। তার ইচ্ছা রাজ্যের যাবতীয় শাসন যন্ত্র তার হাতে থাক। যারা এ-ব্যাপারে বাধা দান করবার জন্যে প্রস্তুতি নিতে গেল, বনবীর তখনই তাকে সে-পদ থেকে সরিয়ে দিল। অথবা প্রয়োজনে অত্যাচারও করতে লাগলো।

চিতোরে আবার নতুন করে চিন্তায় মেঘ নেমে এলো। প্রতিটি মানুষ ও প্রজার মনে গোপন আশার সমাধি ঘটালো। তারা পরিষ্কার বুঝে নিল যে, বনবীর কে দিয়ে এ রাজ্যের কল্যাণের কোন আশা নেই। তারা সমস্ত আশা-আকাঙ্খা জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের ভবিতব্যকে মেনে নিতে বাধ্য হল। সর্দার ও সেনাপতিরা আপাতত :

মুখ খুললো না বটে, তবে গোপনে গোপনে শলা-পরামর্শ চালাতে লাগলো। নতুন পথের চিন্তা করতে লাগলো। তাদের শুধু যে বর্তমান আশাই নির্মূল হয়েছে তাই নয়, ভবিষ্যত ও শূন্য গর্ভে নিপাতিত হতে চলেছে।

বনবীর অবশ্য সে-দিকে লক্ষ্য না করে, নিজেকে গুছিয়ে নিতে লাগলো। যাতে রাণা-পদ কোনদিন চলে গেলেও তাকে কোন প্রকার অভাবে অথবা কষ্টে পড়তে না হয়।

আপনি জানেন, চিতোরে 'দুনা' বলে একটা শব্দ আছে। 'দুনা' শব্দের অর্থ মহারাণার উচ্ছিষ্ট অন্ন। এই 'দুনা' সকলে পায় না। সকলের ভাগ্যে জোটে না। 'দুনা' পাওয়া একটা সম্মানীয় ব্যাপার। রাণা যখন কোন ভোজ-সভা আয়োজন করেন, তখন রাজ্যের সমস্ত সর্দারেরা ও সেনাপতিরা সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। কিন্তু আপনার জানা আছে যে 'দুনা' (রাণার উচ্ছিষ্ট অন্নের অংশ) পান দু' একজন বিশেষ সেনাপতি ও সর্দারেরা। রাণা পাচক কে দিয়ে সেই 'দুনা'বিশেষ সর্দার ও সেনাপতির বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। অর্থাৎ তাঁরাই রাণার বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তি। রাণা তাঁদেরই সম্মান জানাতে ইচ্ছুক। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের বংশধরের কাছ থেকে প্রসাদ পাওয়া গর্বের, এমন একটা চিন্তা সকলেই মনে মনে পোষণ করেন।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, বনবীর যদিও রাণা, কিন্তু সে শীতল সেনী নামে এক দাসীর গর্ভজাত সন্তান। সুতরাং তার 'দুনা' কেউ নিতে চায় না। কিন্তু বরবীরের ইচ্ছা যে বিশেষ বিশেষ সর্দার কে 'দুনা' পাঠিয়ে তাদের সম্মানীত করে। কিন্তু কেউ যখন তার 'দুনা' নিতে চায় না, তখন সে নিজের প্রভাব ও প্রতাপ খাটাতে শুরু করলো। সে ভাবলো রাণার 'দুনা' গ্রহণ করা সর্দার ও সেনাপতিদের অবশ্যই কর্ত্তব্য। সুতরাং সে যখন রাণা, তখন তার 'দুনা' নেবে না কেন? এই ধরনের একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে একদিন বনবীর চন্দ্রাবৎ সর্দারকে তার 'দুনা' (নিজের উচিছষ্ট অন্ন) পাঠিয়ে দিল। আপনি জানেন যে চরিত্রের দিক থেকে চন্দ্রবৎ সর্দার অত্যন্ত কড়া এবং রাগী। তার সঙ্গে বনবীরের সম্পর্ক দীর্ঘ দিন ধরেই ভাল যাচ্ছিলো না। বনবীর এত দিন পরে 'দুনা' পাঠিয়ে সেই সুযোগটাই নিল।

চন্দ্রাবৎ সর্দারও ছাড়বার পাত্র নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সর্দার ও সেনাপতি কে সে কথা জানিয়ে দিল। এবং বনবীরের কাছে এসে বললোঃ বাপ্পা রাওয়ের প্রকৃত বংশধরের কাছ থেকে এ প্রসাদ পেলে গৌরবের হতো। কিন্তু শীতল সেনীর দাসী-পুত্রের কাছ থেকে এ প্রসাদ গ্রহণের অর্থ, অবমাননা। বনবীর এতোটা আশা করেনি। সে থমকে গেল। ভাবলো সামলে নেওয়া যায় কিনা। কিন্তু সম্ভব হল না। ফলে সমস্ত সর্দার ও সেনাপতিরা একত্র হয়ে জোট বাঁধলো। সভা করলো। সভায় প্রস্তাব নেওয়া হলো যে আর নয়। এবারে উদয় সিংহের সঙ্গেই যোগাযোগ করতে হবে। তাকেই রাণা পদে বরণ করে আনতে হবে। উদয়ই রাণা বংশের শেষ সন্তান। সুতরাং এ পদ তারই প্রাপ্য। সমস্ত সর্দার ও সেনাপতিরা ঠিক করলো যে, তারা তাদের সমস্ত শক্তি, সৈন্য-সামন্ত দিয়ে

উদয়কে ফিরে আসতে সাহায্য করবে। যদি তার ফলে উদয়ের সঙ্গে বনবীরের একটা লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয় তবুও ভাল। চিতোরের সমস্ত শক্তি যদি উদয়ের পক্ষো চলে আসে এবং উদয়-কে রাণা হতে সমর্থন জানায়, তবে বনবীর বুদ্ধিমান হলে, এ লড়াইয়ে নামবে না। সে তার আত্মীয় ও পরিবারবর্গ কে নিয়ে গোপনে পালাবে।

রাজ্যের চারিদিকে নানাপ্রকার শলা পরামর্শ চলতে লাগলো। যুদ্ধ-সম্ভাবনা একটা প্রস্তুতি ও লক্ষ্য করা গেল। তবে তেমন জোরদাব নয়। বনবীর গোপনে সমস্ত সংবাদই সংগ্রহ করছিল। এবং যুদ্ধের জন্যে তৈরী হচ্ছিলো। কিন্তু শেষে তারই মন্ত্রী যখন চিতোরের সমস্ত শক্তি ও সর্দারদেব একত্রিত কবে উদয়কে আমন্ত্রণ করে দুর্গে নিয়ে এলো এবং বর্তমান রাণা বলে স্বীকৃতি জানিয়ে চিতোরে উদয়ের জয়-পতাকা স্থাপন করলো, তখন বনবীরের চিতোর ত্যাগ না করে আর কোন উপায় রইলো না। সে একদিন গভীর রাতে তার আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে দক্ষিনাপথে পালিয়ে গেল।

চিঠি শেষ। নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো মীরাবাঈ। দীর্ঘ পত্র দীর্ঘসংবাদ। চিতোবে দীর্ঘ আবর্তনের শেষে স্থিতি। এর পরের ইতিহাস উদয় সিংহকে নিয়ে। উদয় সিংহ চিতোরের রাণা পদে অভিষিক্ত হয়েছিল। সে ইতিহাস ও দীর্ঘ ইতিহাস। তার মৃত্যু-সংবাদে সে ইতিহাসের ও যবনিকাপাত ঘটলো। মীরাবাঈ-এর স্মরণ-পথ পরিক্রমা করে তা' শেষ হল।

চিঠি শেষ করে শুয়ে পড়লো মীরাবাঈ। তখন অনেক রাত।

॥ ছাব্বিশ ॥

এমন একটা অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ আশা করেনি মীরাবাঈ। তারই বিরুদ্ধ সংস্থা তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাদের মন্দির-প্রাঙ্গনে সভা করবার জন্যে। মীরাবাঈ জানে যে তার বিরুদ্ধ সংস্থার অনেক মানুষ তার সভায় আসা-যাওয়া করে। তার গান শোনে। গতবার আসরে সে তার নিজের গানের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিল, তাতে সকলেই মুগ্ধ। এবং তারই স্রোত প্রবাহিতহয়েছিল বিপরীত সংস্থাতে। বিপরীত মঠের অনেক সাধু-সন্নাসীরা বর্তমানে মীরাবাঈ-এর গানের ব্যাখ্যা শুনতে উৎসুক। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই মীরাবাঈ-এর এই আমন্ত্রণ।

মীরাবাঈ তার আমন্ত্রণ লিপি ভাঁজ করে সনাতনের হাতে দিয়ে বললো ঃ আমি প্রস্তুত। ওদের বলো আজ বিকেলেই সভার আয়োজন করতে। আমি আমার গানের বিশদ-ব্যাখ্যা ওদের শোনাবো এবং সেই সঙ্গে গান-ও।

সনাতন সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

বিপরীত সংস্থার মন্দির মীরাবাঈ-এর মন্দিরের কাছাকাছি। ওরা শুরুতে মীরাবাঈ-এর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনে এগিয়ে আসেনি। বরং ঈর্ষা এবং অহংকারের

ভাবই পোষণ করেছে। যেহেতু এ সংস্থা শ্রীবৃন্দাবনে প্রাচীন, সেইহেতু তারা মনে করে তাদের দাবীও বেশী। মীরাবাঈ শ্রীবৃন্দাবনে এসে কিছুই দাবী করেনি। তার একমাত্র দাবী ছিল শ্রীকৃষ্ণের নাম-গান, গিরিধারীলালের নিত্য সেবা ও সংগীত। সেই নির্মল আনন্দ ও নির্মাল্যের মধ্যে দিয়েই মীরাবাঈ এখানকার মানুষের মনে নিজের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে এবং ধীরে ধীরে বিরুদ্ধ দলও এসে তাকে সমর্থন জানিয়েছে। তার ভাগবত মুখী চিন্তা ও চেতনায় একমত হয়েছে। যার পূর্ণ স্বীকৃতি আজ এই আমন্ত্রণ। আজ এই আমন্ত্রণের ফলে বোঝা গেল যে, সংস্থা হিসাবে তারা এ-অঞ্চলে আদি হলেও অকৃত্তিম নয়। তাদের সনাতনী অধ্যাত্ম-চিন্তার উপরেও মীরাবাঈ তার নিজস্ব ভাবনার ছাপ রাখতে পেরেছে। তাদের প্রভাবিত করতে পেরেছে। অবশ্য এ-কাজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হয়েছে। আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এ কাজ করা হয়নি।

এই মন্দিরের কারুকার্য প্রাচীন। পুরাণের প্রমাণ সর্বত্র। স্থাপত্য রীতি শ্রীবৃন্দাবনে স্মরনীয়। অন্দরে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ। মনি মুক্তা খচিত রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। সামনে চকমিলানো চত্বর। মীরাবাঈ ঘুরে ঘরে সব দেখলো। এ মন্দিরের মোহান্ত মীরাবাঈকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। প্রাচীন কিছু ইতিহাস ও পেশ করলেন। মোহান্ত মীরাবাঈকে ইদানিং খুবই সম্মান করেন। মীরাবাঈ-এর পাণ্ডিত্যে এবং ঈশ্বরীয় অনুভবে তিনি বর্তমানে আস্তাবান। আগে ছিলেন না। আগে বরং তিনি তার বিপরীত মুখী ছিলেন বলা যেতে পারে। এখন তিনি পরিস্কার বুঝেছেন যে, মীরাবাঈ চিতোরের রাজমহিষী। সামাজিক মানে মাননীয়া। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরীয় অনুভব ও অতিমানবীয় শক্তির অধিকারিণী দ্বিতীয়া মহিলা শ্রীবৃন্দাবনে আর কেউ নেই। এখানে মীরাবাঈ একক এবং অদ্বিতীয়া। সুতরাং তিনি সব শেষে বুঝলেন যে, সম্মানীয়া মহিলাকে সম্মান করলে নিজের সম্মানও বাড়ে। কিছু কমে না। এই ধারনার বশবর্তী হয়েই তিনি তার আশ্রমিকদের অনুরোধে মীরাবাঈকে এ মন্দিরে ভাষণ প্রদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মন্দিরের প্রাঙ্গন পার হয়েই প্রান্তর। দীর্ঘ সমান্তরাল ভূমি। সেখানেই মীরাবাঈ-এর ভাষণের আয়োজন হয়েছে। লোক জমায়েত্ হয়েছে প্রচুর। এ মন্দিরের সদস্য বৃন্দ ছাড়াও বৃন্দাবনবাসী অনেকেই আজ এখানে উপস্থিত। মীরাবাঈ-এর আপনজনেরা বিরাট মঞ্চে জনতার মুখোমুখি বসে। মীরাবাঈ মঞ্চে এসে শুরু করলো। কিছুদিন আগে আমি আমার কোন এক ভাষণে 'দাস্য' ভাবের বর্ণনা দিয়েছি এবং ব্যাখ্যা ও করেছি। সেই সঙ্গে আমার মনে পড়ছে আমি ঐ 'দাস্য' ভাবের আমার নিজস্ব রচিত সংগীত ও পরিবেশণ করেছি। আজকে আমি 'সাখ্য' অথবা 'সখা' বা' সখী' এই ভাবের বর্ণনা করবো। এবং ব্যাখ্যা শোনাবো। আমার গানে 'সখা' বা 'সখী' রূপের বর্ণনা ও আছে। তবে আমার গানে 'মাধুর্য্য', রসই বেশী। আমি 'সখী' রূপে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থাপিত করেছি এ কথা ঠিক। তবে তার চেয়ে আমি অনেক বেশী আমার মনের ভাব শ্রীকৃষ্ণের সখীকে জানিয়েছি। তাঁর সখীকে আমি আমার মনের ভাব ব্যক্ত করেছি। কারণ এতেই আমি আনন্দ পেয়েছি বেশী।

আমি যে আমার মনের ভাব তাঁর সখীকে জানিয়েছি, আমার রচিত সেই পর্যায়ের একটি গান আজ এখানে পরিবেশণ করছি। আমার অনুরোধ আপনারা শান্ত হয়ে শুনুন।

মীবাবাঈ গান ধরলো :

"সখী মেরী নীঁদন সানী হো।
পিরাকো পংথ নিহারতে
সব রৈণ বিহানী হো॥
সখিয়ন্ মিল্‌কে গিথ্ দঈ
মন একন্ মানী হো।
বিন্ দেখে কল্‌না পরে,
জীর ঐসী ঠানী হো॥
অংগ অংগ ব্যাকুল ভঈ
সুখ পিয় পিয় বাণী হো।
অংতর বেদন্ বিরহ কী
বহ পিয়ন জানী হো॥
জোঁ্যা চাতক ঘন কো রটে
মছরী জিমি শানী হো।
মীরা ব্যাকুল বিরহনী
সুধ বুধ বিসরাণী হো॥"

মীরাবাঈ অনেকক্ষণ ধরে গানটি পরিবেশণ করে উপস্থিত ভক্ত মণ্ডলীকে শোনালো। সভার সকলেই নির্বাক, নিস্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলো। মীরাবাঈ থামতেই সকলে বলে উঠলো : আমরা গান শুনলাম। এবারে গানের ব্যাখ্যা চাই। বর্ণনা চাই।

জনতার দাবী দেখে মীরাবাঈ-এর ভালোই লাগলো। যারা শুনতে চায়, জানতে চায় এবং বুঝতে চায়, তাদের শুনিয়ে, জানিয়ে এবং বুঝিয়ে আনন্দ আছে। অরসিক কে রস নিবেদন করে কোন ফল নেই। আনন্দ নেই। আজকের আসরে উপস্থিত সকলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে, মীরাবাঈ এর মনে হলো তার গান সার্থক। সাধনা সার্থক। তার অন্তবিহীন পথ-পরিক্রমা সার্থক। কথায় বলে, দুঃখের রজনী দীর্ঘ হলেও অবশেষে মাঙ্গলিক শংখ বাজিয়ে ভোর আসে। আঁধারের সমস্ত কালিমা ধৌত করে দুখিনীকে নির্মল নির্মাল্যে ভূষিত করে।

মীরাবাঈ-এর ও হয়েছে তাই। অনেক দুঃখের রাত পেরিয়ে তবে আজ তার পাশে লোক জমায়েত হয়েছে। তার গান শুনতে চাইছে। গানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনার জন্যে উৎসাহ প্রকাশ করছে। মীরাবাঈ মনে করে এইখানেই তার সাধনার সার্থকতা। সেই কারণে সে খুবই উৎসাহিত হয়ে বললো : আপনারা শান্ত হয়ে শুনুন। আমি আমার পরিবেশিত গানের ব্যাখ্যা বলছি।

সখি, আমার নিদ্রা নেই। প্রিয়তমের পথ দেখে দেখে আমার রাত ভোর হলো। সকল সখিরা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু মন যে আমার একটি কথাও

মানছে না। তাঁকে না দেখলে শান্তি পাওয়া যায় না। আমার জীবন যে এ কথাই মেনে নিয়েছে। আমার অঙ্গ ব্যাকুল। মুখে 'প্রিয়' 'প্রিয়' বাণী। আমার অন্তরে বিরহের বেদনা। আমার প্রিয় সে কথা জানেন না। চাতক যেমন মেঘের আশা করে, মাছ যেমন জল আশা করে, মীরা তেমনই তার প্রিয়তম-কে আশা করে। ব্যাকুল বিরহিনী মীরা আজ বিচার বুদ্ধিহীনা।

মীরাবাঈ আবেগ ভরা কণ্ঠে তার গানের ব্যাখ্যা সকলকে শোনালো। সকলেই বলতে লাগলো ঃ মীরাবাঈ অনন্যা। অসমাপিকা।

মীরাবাঈ বললো ঃ আপনারা আমার গান শুনলেন। গানের ব্যাখ্যা শুনলেন। আমি ধন্য। আমার সাধন-ভজন সার্থক। আমি আজ এখানেই শেষ করছি। আগামী দিনে যদি আবার আমার সময় হয় এবং আপনাদের মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ হয়, তবে আমি আমার গানের প্রসঙ্গে আরও বিসদ আলোচনা করবো। আরও গান শোনাবো।

জনতার জবাব এলো ঃ আজ আমরা আরও কিছু শুনতে চাই। আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনি অন্তত ঃ আর একটি সংগীত পরিবেশণ করুন এবং তার ব্যাখ্যা দিন। আমরা শুনতে উৎসুখ।

মীরাবাঈ বললো ঃ রাত বাড়ছে। অনেকে অনেক দূরে যাবেন। তাঁদের পথ চলায় কষ্ট হতে পারে।

কিন্তু জনতা রাজি নয় দেখে মীরাবাঈ বাধ্য হয়েই বললো ঃ তাহলে এবারে আমি 'মাধুর্য" ভাবের কথা বলবো। এখানে আমি নিজেকে 'মাধুর্য'-ভাবের মাধ্যমে কৃষ্ণের গোপীগণের সঙ্গে তুলনা করেছি এবং নিজেকে গোপীভাবে কৃষ্ণের কাছে উপস্থাপিত করেছি। এখানে আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, গোপী এবং সখী ইত্যাদি ভাব-রসে সিক্ত। আমার রচিত এই পর্য্যায়ের গানের সংখাই বেশী। আমি আজ এখানে একটি 'মাধুর্য্য'-ভাবের গান পরিবেশণ করেই আজকের আসর সমাপ্তি ঘোষণা করবো।

আপনারা শুনুন ঃ

"প্যারে দরসন দীজ্যো আয়।
তুম্ বিন্ রহ্যো ন জায়॥
জল্ বিন্ কঁবল, চংদ্ বিন্ রজনী,
ঐসে তুম্ দেখ্যা বিন্ সজনী॥
আকুল-ব্যাকুল ফিরুঁ রৈণ দিন
বিরহ কলেজো খায়।
দিবস ন ভুখ্ নীদ নহি রৈণা।
মুখসু কখন ন আরৈ রৈনা॥
কহা কহু কুছ্ কহতন আরৈ
মিল্‌কর তপত বুঝায়॥
কুঁ্য তরসাবো অংতর জামী।

আয় মিলো কিরপা কর স্বামী ॥
মীরা দাসী জনম জনম কী
পরী তুম্‌হারে পায় ॥"

মীরাবাঈ গান শেষ করেই বললো: অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। এবারে আমি আমার গানের ব্যাঞ্জনা করেই শেষ করবো।

আমার গানের ব্যাঞ্জনা হচ্ছে:

হে প্রিয়তম, তুমি এসে আমাকে দেখা দাও। তোমাকে ছাড়া যে আর থাকতে পারি না। জল বিনা কমল যেমন, চাঁদ বিনা রাত যেমন, ঠিক তেমনি হে সজনী তুমি এসে দেখো যে, তুমি বিনা আমি আকুল হয়ে রাত দিন ফিরি। বিরহে আমার বক্ষ জ্বলে। দিনে ক্ষুধা নেই, রাতে চোখে ঘুম নেই, মুখে আমি কথা বলতে পারি না। কাকে বলি, কিছুই বলতে পারি না। কেবল তুমি এলেই আমার এ বুকের জ্বালা নিভে যাবে। হে অন্তর্যামী, আর কেন আমাকে বেদনা দাও। হে স্বামী, আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাকে কৃপা করো। মীরা জন্ম-জন্মান্তরের দাসী হয়ে তোমার পায়ে পড়ে আছে।

আমার গানের ব্যাঞ্জনা আমি করলাম। ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণ ভাবনার যে রূপ, যে ভাব ধারার কথা বলা হয়েছে, আমি সম্পূর্ণভাবে সেই ভাব, সেই পথের পথিক। সেই পথ অনুসরণ করেই আমি আমার সাধনাকে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছি।

ভাগবত পুরাণে আবার এই ভক্তি-সাধনাকে নয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভক্তি-সাধনায় ন'টি রূপের ব্যাখ্যায় সেখানে পাওয়া যায়—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সাখ্য ও আত্মনিবেদন। আমার সাধনা এই ন'টি রূপকেও ঘিরে আছে। আমি আমার সাধনায় উত্তোরণের জন্যে এই ন'টি রূপেও শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেছি।

আজ রাত অনেক হলো। আগামী দিনে আবার সময় এবং সুযোগ এলে আমি এই ন'টি রূপের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবো। আজ আপাততঃ শেষ।

সে-দিনের মুখর আসর মৌন ভাবে শেষ হলো। মীরাবাঈ সনাতনকে সঙ্গে নিয়ে নিজের আশ্রমে ফিরে এলো।

॥ সাতাশ ॥

আজকাল মাঝে মাঝেই একটা ক্লান্তি মীরাবাঈকে ঘিরে থাকে। কিছু অবসাদ, কিছু কালিমা মীরাবাঈ-এর মনকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে। সাধন-ভজনে মন বসতে দেয় না। কিছুদিন আগে বৃন্দাবন লীলার বিশদ ব্যাখ্যার জন্যে মীরাবাঈ-এর ডাক এসেছিল। কিন্তু সে যায় নি। জীবনে অনেক সাধন-ভজনই তো হলো। অনেক নিত্য-সেবা আর জনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা। কিন্তু মানসিক শূন্যতা যায় কৈ। আজকাল মানসিক শূন্যতার মধ্যে মাঝে মাঝেই

ভোজরাজকে মনে পড়ে। ভোজরাজ আর মীরাবাঈ। ঘর-সংসার কতোদিনই আর করা হলো। সংসারের স্নিগ্ধতা বুঝতে বুঝতেই ভোজরাজের অকস্মাৎ মৃত্যু। তার-পরেই যৌবনে যোগিনী। এবং পরবর্তী ইতিহাস রিক্ত, নিস্ব ও অপরিসীম তিক্ততায় ভরা। পঙ্কিলতায় পিচ্ছিল। সেইজন্যেই ইদানীং ক্লান্তি অথবা অবসন্নতা এলেই ভোজ-রাজকে মনে পড়ে। তার বিগত বিবাহিত জীবন। ভোজরাজের সঙ্গে তার বিবাহেব কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ঘটনাটা ঘটেছিল নিতান্তই আকস্মিক ভাবে।

ভোজরাজের কথা মনে হলেই তার শৈশব আর কৈশরের কথা মনে পড়ে। শিশুকালের স্মৃতি মীবাবাঈ-কে ঘিরে ধরে। তখন কতই বা বয়স। পাঁচ কি ছয়। পূর্নিমা রাত। বাড়ীর আঙ্গিনায় ঢেলে জ্যোছনা ছড়িয়ে। বাবা রতন সিংহ নানা কাজে বাইরে ব্যস্ত। মা কুসুম কুঁয়ব অন্দবে। আঙ্গিনায় দোলনা টাঙ্গানো হয়েছে। মীরাবাঈ চোখ বুঁঝলে এখনও সেই দৃশ্যটা পরিস্কার দেখতে পায়। ছোট্ট সুন্দরী মীরা দোল পূর্ণিমার রাতে আঙ্গিনায় দোল খাচ্ছে। সখীবৃন্দ তাকে আবীর মাখাচ্ছে। তাকে ফুলের গয়নায় সাজিয়ে দিচ্ছে। তাকে ঘিরে গান গাইছে। কিশোরী মনের করুণ আর্তি। ছোট ছোট ছেলেরাও সে গানে যোগ দিয়েছে। তারা খঞ্জনী বাজাচ্ছে। নাচছে, গাইছে, আনন্দ করছে। তার মাঝে একটি ছেলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে মাথায় চূড়া, গলায় বনমালা, ও হাতে বাঁশী নিয়ে দাঁড়িয়ে। মীরাবাঈ-এর আজও মনে আছে. তাকে দেখেই সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে দোলনা থেকে নেমে তার দিকে এগিয়ে এসেছিল। এবং সে-দিন সেই বালকের মধ্যেই বংশীধারী কৃষ্ণ মূর্তির দর্শন পেয়েছিল। মীরাবাঈ জানে, ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের এই রূপের বর্ণনা আছে। এবং উত্তরকালে মীরাবাঈ এই কৃষ্ণ-মূর্তিরই সাধনা কবে গেছে। নিজেকে গোপী ভাবে সাধনা করেছে। গোপীগণের একজন বলে মনে করেছে। এবং সেই ভাবে আজও তার সাধনা চলেছে।

টুকরো টুকরো ঘটনা। টুকরো টুকরো ছবি। জীবনের ছিঁড়ে যাওয়া পাতার স্মৃতিকথা। মাঝে মাঝে ঢেউ জাগিয়ে মিলিয়ে যাওয়া। যেন খেলা করে গেল।

আর এক দিনের ঘটনা। ভারী অদ্ভুত। মীরাবাঈ-কে আজও অবাক করে দেয়। কুড়কী গ্রামের গিরিধারীলালের মন্দিরে পূজা চলেছে। ভক্তবৃন্দ জমায়েত। মীরাবাঈ সেখানে তার সখীদের সঙ্গে বসে গান গাইছে। সে গিরিধারীলালের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে। সে দেখলো যে গিরিধারীলালের মূর্তি ধীরে ধীরে অপূর্ব জ্যোতি বংশীধারী গোপালে রূপান্তারিত হচ্ছে। এবং পুনরায় গিরিধারীলালের পূর্বের মূর্তিতে ফিরে আসছে।

অলৌকিক ঘটনা মীরাবাঈ-এর জীবনে একটি দুটি নয়। বেশ কয়েকটি। অলৌকিক ঘটনায় কথা ভাবতে গেলে পর পর কয়েকটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। যে সব ঘটনা মীরাবাঈ-এর অধ্যত্ম জীবনকে সুগঠিত করেছে। দীর্ঘ সাধনায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সাধনার ভিৎ শক্ত করেছে।

অলৌকিক ঘটনায় মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, একটি বিবাহে যোগদান। মীরাবাঈ তখন কিশোরী। মীরাবাঈ-এর . মা মীরাবাঈ-কে একটি

বিবাহে যোগদানের জন্যে তৈরী হতে বলছেন। মীরাবাঈ তখন গিরিধারীলালের পূজায় ব্যস্ত। মায়ের কথায় সে তাড়াতাড়ি পূজো শেষ করে বিবাহে যাত্রা করলো। বিবাহ-বাড়ীর কাছাকাছি এসে এবং বিবাহের বাজনা শুনে মীরাবাঈ তার মা-কে প্রশ্ন করেছিল : মা, আমার বর কে ?

কথাটা ভাবলে মীরাবাঈ-এর আজও হাসি পায়। তখন বয়স কম বলেই মীরাবাঈ তার মাকে এ প্রশ্ন করতে পেরেছিল। যাইহোক, সে-দিন মীরাবাঈ-এর মা জবাব দিয়েছিলেন : তোমার বর গিরিধারীলাল।

মীরা : বরকে নিয়ে আমি কি করবো মা।

মীরাবাঈ-এর মা : ভাল ভাল খেতে দেবে। ভোগ দেবে। ভাল ভাল পোষাক পরাবে। সেবা যত্ন করবে। পূজো করবে। প্রণাম করবে। তবে সে তোমার কাছে থাকবে।

মীরাবাঈ সে-দিন চিন্তা করতে করতে বিবাহ-বাড়ীতে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিবাহ-বাড়ীতে এসে বিবাহের বরকে দেখে তার গিরিধারীলালকে মনে পড়েছিল। এবং ক্রমে ক্রমে তার মন গিরিধারীলালের চিন্তায় এমনি আবিষ্ঠ হয়েছিল যে, বিবাহের ঐ বরের মধ্যে নিজের গিরিধারীলালকে দেখতে পেয়েছিল। তার মনে হয়েছিল এখানে বর বেশে গিরিধারীলালই যেন উপস্থিত।

এই ঘটনার পর মীরাবাঈ ক্রমান্বয়ে বেশ কয়েকদিন গিরিধারীলালের স্বপ্ন দেখেছিল। এখনও মাঝে মাঝে মীরাবাঈ-এর মনে হয়, সে কিশোর কালেই গিরিধারীলালকে বেশী ভালবাসতে পেরেছিল। এখন বোধ হয়, তেমন আর পারে না। কিশোর কালের মত এখন আর তেমন করে গিরিধারীলালের প্রতি মন বসাতে পারে না। নানা কাজে এবং নানা কারণে তার মন প্রায়ই বিক্ষিপ্ত থাকে। যাইহোক, পর পর কয়েক দিন রাতে গিরিধারীলালের স্বপ্ন দেখার পর, একদিন অতি প্রত্যুষে একজন সাধু তাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ালো। তার হাতে একটি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ। মীরাবাঈ এ বিগ্রহটি দেখেই চেয়ে বসলো। সাধুজী দিতে অস্বীকার করলো। মীরাবাঈ-ও ছাড়বে না। শেষে মধ্যস্থতা করলেন মীরাবাঈ-এর মা। তিনি এসে মীরাকে অনেক বোঝালেন এবং সাধুকে ভিক্ষা দিয়ে বিদায় করলেন। সাধু বাড়ী ফিরে গেল এবং রাতে স্বপ্ন দেখলো যে ঐ কৃষ্ণ বিগ্রহটি বলছে : তুই আমাকে মীরার কাছে রেখে আয়। পরের দিন ঐ সাধু আবার তাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে হাজির। সে, সব কথা ব্যক্ত করে মীরার হাতে ঐ বিগ্রহটি তুলে দিল। ঐ সাধুর নাম রুহিদাস। তিনি ঐ বিগ্রহটিকে মীরার হাতে তুলে দিয়ে মীরার কানে কানে গিরধরজীর নাম উচ্চারণ করে বলেছিলেন : এই আমার দীক্ষা। সংসারে সব মানুষই সমান। এই তোমার মন্ত্র। সে কত কালের কথা। তবুও মনে হয় এইতো সে-দিন।

উত্তরকালে চিতোরের মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র ভোজরাজের সঙ্গে যখন মীরাবাঈ-এর বিবাহ হয়, তখন মীরাবাঈ এই বিগ্রহটি সঙ্গে নিয়ে ভোজরাজকে প্রদক্ষিণ করেছিল। ফলে বিবাহ-বাসরে নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হয়েছিল।

সংস্কার জড়িত পুরোহিতগণ বলেছিল : চিতোরের রাণারা কালিকা দেবীর পূজারী। একলিঙ্গেশ্বর তাদের গৃহদেবতা। রাণারা শক্তির উপাসক। মীরাবাঈ বিষ্ণুরূপে ভগবান কৃষ্ণের যে অবতরণ, তারই সেবিকা। তায়ই পূজারিণী। মীরাবাঈ পরম বৈষ্ণব। সুতরাং এ বিবাহ সুখের হবে না।

তখন মীরাবাঈ-এর যুক্তি এবং জবাব ছিল যে, এই বিগ্রহ-ই আমার পরম ধন। আমার স্বামী। আমি এ বিগ্রহ সঙ্গে না নিয়ে ভোজরাজকে প্রদক্ষিণ করতে পারি না। মীরাবাব-এর এই কথায় তৎকালীন পুরোহিত মহলে দ্বিমতের সৃষ্টি হয়েছিল। একদিল বলেছিল : এ বিবাহ সুখের হবে না। অপর দল বলেছিল ; এ ধরনের বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ নয়। তবে মীরাবাঈ-এর বিবাহ সুখের হবে না, পুরোহিত মহলে এই বাণীই বেশী উচ্চারিত হয়েছিল।

মীরাবাঈ আজও অনায়াসেই বলতে পারে যে, ভোজরাজ যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন মীরাবাঈ সুখেই সংসার করেছিল। মীরাবাঈ-এর সঙ্গে ভোজরাজের মতে বা পথে কোন অমিল দেখা দেয়নি। বরং জীবিত কালে ভোজরাজ মীরাবাঈকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে ও প্রসারে নানা ভাবে সহযোগিতাই করে এসেছে। ভোজরাজের অকাল মৃত্যু না হলে, মীরাবাঈ সংসার জীবনে অসুখী হবার কোন কারণই ছিল না। কোন এক যুদ্ধে ভোজরাজের আকস্কিক আঘাত প্রাপ্তি ও পরে মৃত্যুর জন্যে মীরাবাঈ-কে কোন কারণেই দায়ী করা চলে না।

যাইহোক, মীরাবাঈ শেষে এ বিগ্রহটিকে সঙ্গে নিয়েই ভোজরাজকে প্রদক্ষিণ করেছিল এবং নিজের প্রাসাদে নিত্যপূজার জন্যে স্থাপন করেছিল। প্রথম প্রথম এই বিগ্রহটি নিয়ে মীরাবাঈ এর সঙ্গে রাণা পরিবারের নানা গোলামাল, মতবিরোধ ও মনমালিন্য দেখা দিয়েছিল। যেহেতু রাণা পরিবারের লোকেরা শক্তির উপাসক, সেইহেতু মীরাকেও তারা শক্তি পূজায় নিয়োজিত করবার চিন্তা করেছিল। কিন্তু ভোজরাজের হস্তক্ষেপে তা সম্ভব হয়নি। মীরাবাঈ এ মূর্তিটিকে নিজের মনের মত করে সাজিয়ে নিত্য-পূজার ব্যবস্থা করেছিল।

কোন একদিন মীরাবাঈ এর শ্বাশুড়ি রাজমাতা রতণ কুঁয়র মীরাবাঈ-এর মন্দিরে এসে অবাক। তখন মীরাবাঈ-এর পূজার জন্যে মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ও মীরাবাঈ-এর স্বামী ভোজরাজের ইচ্ছায়, চিতোর রাজপ্রাসাতে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মীরা সে মন্দিরে তার বিগ্রহটি প্রতিষ্টিত করে পূজা শুরু করেছে।

রাজমাতা রতণ কুঁয়র ঝালী সৌরাষ্ট্র দেশের একটি ছোট রাজ্যের অধিপতি রাও রাজধন ঝালার কন্যা। ছোট রাজ্যের অধিপতির কন্যা হলেও তিনি চিতোরের রাজমাতা। সেই কারণে সেই সময়ে তিনি চিতোরের সর্বশ্রেষ্ট সম্মানীয়া মহিলা। রাণা পরিবারে তাঁকে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা ভয় করতো না এমন মানুষ বিরল ছিল। তিনি কোন মহলেই যেতেন না। সকলেই নিজের নিজের প্রয়োজনে তাঁর মহলে এসে দেখা করতো এবং যথাযথ সম্মান জানাতো। মীরাবাঈ তাঁকে শ্রদ্ধা-সম্মান করলেও তাঁর মহলে বড় একটা যাতায়াত করতো না। সে নিজের মন্দিরে

গিরিধারীলালের নিত্য-পূজা নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। এমন মহিলা রাজমাতা রতণ কুঁয়র ঝালী একদিন হঠাৎ কোন খবর না দিয়ে মীরাবাঈ-এর মন্দিরে এসে উপস্থিত। মীরাবাঈ সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যথাযথ সম্মান সহকারে বসবার জন্য অনুরোধ জানালো। কিন্তু রাজমাতা মীরাবাঈ-এর বিগ্রহটি দেখেই বলে উঠলেন ঃ এ মূর্তি তুমি কোথায় পেলে?

মীরার জবাব ঃ সন্ত রুহিদাসজী আমার দিয়েছেন।

রাজমাতা ; তিনি কি তোমার গুরু?

মীরা ঃ হ্যাঁ।

রাজমাতা ঃ এ মূর্তি আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম।

মীরাবাঈ এর যখন ভোজরাজের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে চিতোর থেকে দূত আসে, তার আগের দিন রাত্রে মীরাবাঈ একটি স্বপ্ন দেখেছিল। মীরাবাঈ, সাধু রুহি-দাসের দেওয়া বিগ্রহের সামনে বসে অনেক রাতে গান গাইছিল ঃ

"নী দ'লড়ী নহি আরে সারী রাত।
কিসবিধ হোয়ী পর ভাত ॥
চমক উঠি স্বপনে সুধ ভূলি।
চংদ্রকলা ন সোহাত ॥
তড়ফ্ তড়ফ্ জীব জায় হমারো
কবরে মিলে দীন নাথ ॥
ভয়ীরে দিবাণী তন সুধ ভূলি।
কোঈন জানী মহারী বাত ॥
মীরা কহৈ বাত সোঈ জানে
মরণ জীবন জিন হাথ ॥"

গান গাইতে গাইতে মীরাবাঈ ঘুমিয়ে পড়েছিল। চারিদিকে ভোগের আয়োজন। পরে এক সময় মীরাবাঈ গানের ক্লান্তিতে বিগ্রদের সামনে আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছিল।

সেইদিন রাত্রেই মীরাবাঈ স্বপ্ন দেখেছিল যে, গিরিধারীলাল বর বেসে মীরার সামনে দাঁড়িয়ে। গলায় বনমালা। মাথায় চূড়া ও হাতে বাঁশী। মীরাবাঈ রাধা-বেশে দাঁড়িয়ে সেই বংশীধারী গিরিধারীলালের গলায় মালা দিচ্ছে।

মীরাবাঈ-এর ঘুম ভাংলো। মীরাবাঈ চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো। মাকে সব কথা খুলে বললো। মা শুনেই অবাক।

সেইদিন সকালেই রাণার দূত মীরার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসে হাজির। মীরার পিতা রতন সিংহ আদর-আপ্যায়ণে তাকে বসালেন। দূত মহারাণার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। রতন সিংহ শুনে অবাক হলেন। দূত বিদায় নিতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে দূতের প্রস্তাবের কথা ব্যক্ত করলেন। মীরার মা অত্যন্ত খুশি হয়ে গিরিধারীলালকে প্রণাম জানালেন।

ভোজরাজের সঙ্গে মীরাবাঈ-এর বিবাহে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ নিয়ে সনাতনী পুরোহিত মহলে নানা মতের সৃষ্টি হলেও ভোজরাজ এ-ব্যাপারে অংশ নেয় নি। বরং বিবাহের

পরে সে নিজেই উৎসাহিত হয়ে তাদের শক্তির উপাসনার মন্দির গুলো দেখিয়েছে। শিব মন্দির, কালিকা মন্দির, এবং শেষে নিজেদের পারিবারিক বিগ্রহ একলিঙ্গদেবের সামনে এসে মীরাবাঈ-কে প্রণাম করতে বলেছে। মীরাবাঈ একলিঙ্গদেবের মূর্তির দিকে তাকাতেই একলিঙ্গদেবের মূর্তি বংশীধারী কৃষ্ণ মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। মীরাবাঈ প্রণাম জানিয়েছে।

ভোজরাজের কথা মনে পড়লে, মীরাবাঈ-এর চোখে জল আসে। ভোজরাজ কোনো দিনও মীরাবাঈকে শক্তি উপাসনায় নিয়োজিত করবার চেণ্টা করেনি। বরং মীরাবাঈ-কে তার সাধনায় সাহায্যই করে এসেছে। ভোজরাজ গিরিধারীলালের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ কুম্ভশ্যামের মন্দিরের পাশে গিরিধারীলালজীর মন্দির তৈরী করে দিয়েছিল। এবং এ মন্দির তৈরীর পেছনে ভোজরাজের পিতা রাণা সংগ্রাম সিংহেরও সমর্থন ছিল। এ কাজে রাজ মাতা রতন কুঁয়র ঝালিও খুশি হয়েছিলেন। কারণ তিনি মীরাকে ভালোবাসতেন এবং তার সাধনার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ভোজরাজের মা রাণী কুঁয়র বাঈ এই মন্দির নির্মাণ ভালো চোখে দেখেন নি। তিনি মীরাবাঈ-কে একটুও দেখতে পারতেন না। মীরাবাঈ এর আচার-ব্যবহার ও তার দিবারাত্র কৃষ্ণ-ভজনাতে তিনি খুশি ছিলেন না। মীরাবাঈ শুনেছিল যে, এ ব্যাপারে একবার তার স্বামী মহারাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে তিনি আলাপ ও করেছিলেন। তিনি তার স্বামীকে বলেছিলেন : শোনা যাচ্ছে এখানে কুম্ভশ্যামের মন্দিরের পাশে গিরিধারীলালের মন্দির নির্মাণ হবে ?

মহারাণা সংগ্রাম সিংহ জবাব দিয়েছিলেন : হাঁ!

তাঁর স্ত্রী তখন কৌতুক করে বলেছিলেন : ভোজরাজ আর মীরা সেই মন্দিরে বসে গান গাইবে আর প্রজারা তা শুনবে ?

সংগ্রাম সিংহ জবাব দিয়েছিলেন : হ্যাঁ!

তাঁর স্ত্রী : গিরিধারীলালের মন্দিরে গান গেয়ে তোমার রাজনৈতিক কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে জানি না। সামনে যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে। চিতোরের স্বাধীনতা আজ বিঘ্নিত।

সংগ্রাম সিংহ : তা হোক। তার জন্যে আমরা তৈরী আছি। প্রস্তুত আছি। টুকরো টুকরো সমস্ত দেশটাকে আমি চেণ্টা করলে এক করে দিয়ে যেতে পারি। কিন্তু রাজত্ব চালাতে পারি না। দীর্ঘদিন রাজনীতি করে এইটুকু বুঝেছি যে, দেশের সাধারণ মানুষকে পাশে না পেলে রাজত্ব চালানো যায় না। আর এ দায়িত্ব ভোজ-রাজ ও মীরাবাঈ-এর। মীরাবাঈ-কে দেশের সাধারণ মানুষ ভালোবাসে, ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। আমরা রাজত্বের দাবীতে, রাণার পদের দাবীতে, সাধারণ মানুষের সম্মান আদায় করি। স্বাভাবিক ভাবে পায় না। কিন্তু মীরাবাঈ-কে ওরা আন্তরিকভাবে সম্মান করে। এটা মীরাবাঈ-এর চারিত্রিক মাধুর্য্য। মীরা রাজমহিষী হয়েও সাধারণ তার অসন-বসন, দৈনন্দিন জীবন ধারণ সাধারণ। সে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি। সেই কারণেই সাধারণ মানুষও তাকে আপনজন ভেবে কাছে কাছে থাকে। সে কাজ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তুমি জানবে, চৈতন্যদেব, গুরু নানক, এঁদের ধর্ম

প্রচারটাই বড় কথা নয়। এঁদের রাজনৈতিক ভূমিকাটিও বড়। এঁরা দেশের নিপীড়িত মানুষকে এক করতে পেরেছিলেন। শুধুমাত্র তলোয়ার দিয়ে তামাম হিন্দুস্থান জয় করা যাবে না। মীরাবাঈ কে'ও প্রযোজন।

কথাগুলো মহারাণা সংগ্রাম সিংহ কতোদিন আগে বলেছিলেন। এই কথাগুলোতে মীরাবঈ এর প্রতি মহারাণা সংগ্রাম সিংহের স্নেহ, ভালবাসা ও বিশ্বাস স্পষ্ট। মীরাবাঈ কথাগুলো আজও ভুলে যায় নি। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের কথা মনে পড়লেই, এই কথা গুলো স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে এবং শ্রদ্ধায় মীরাবাঈ এর মাথা আপনাতেই নত হযে আসে। মীরাবাঈ এর সাধণার তিনি পরিপূর্ণ সমর্থক ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে মীরাবাঈ এর মন্দিরে এসে বসতেন এবং আপন মনে গান শুনতেন। চিতোবের রাণা পরিবারের রাণাদের কখনও কারো সঙ্গে দেখা করতে যাবার কোন রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু মীরাবাঈ-এর ক্ষেত্রে অনেক সময় চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যেত।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহ আর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোজরাজ অর্থাৎ মীরাবাঈ এর স্বামী মীরাবাঈ কে যে সম্মান দিয়েছিল, তার সাধনার যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, তার জন্যে মীরাবাঈ এঁদের স্মবণ না করে পারে না। এর পরে মীরাবাঈ চিতোরে আর কোন সম্মান পায় নি। বরং অত্যাচার, অবিচার আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে চিতোর ত্যাগ করতে হয়েছে।

মীরাবাঈ-এর একটানা সাধন- ভজনের জন্যে ভোজরাজ যে মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ বোধ করতো, সে কথা মীবাবাঈ জানে। মাঝে মাঝে সে ভোজরাজকে একা একা রাজপ্রাসাদ ও তারই সংলগ্ন উদ্যানে আপন মনে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। এ দৃশ্য দেখে মীরাবাঈ মনে মনে ব্যথিত হযেছে। কিন্ত কোন উপায় ছিল না। এদিকে মন্দিরে পুজা-উপাসনা চলছে। অভ্যাগতদের ভীড় উপছে পড়ছে। তাদের ফেলে মীরাবাঈ যায় কি করে। তবে ভোজরাজের এই নিঃসঙ্গতার সুযোগ নিয়েছেন তাঁর মা রাণী কুঁয়ববাঈ। তিনি পুত্রের মানসিক অবস্থার কথা ভেবে মীরাবাঈ-কে সাধন-ভজন ত্যাগ করে রাজমহিষীর কর্তব্য সম্পাদনে হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু মীরাবাঈ সে কাজে রাজি না হওয়ায় তিনি মীরাবাঈ কে নানা ভাবে ভয় দেখিয়েছেন। বলেছেন, তিনি পুত্রকে আবার বিবাহ দেবেন। মীরাবাঈ এর আজও মনে আছে যে, একদিন সন্ধ্যায় তিনি অতর্কিত ভাবে মীরাবাঈ এর মন্দিরে এসে বলেছিলেন : তুমি রাজমহিষী। রাণা বংশের ঠাঁট বজায় রাখা তোমার কর্তব্য। তুমি রাজমহলে ফিরে এসে রাজমহিষীর মতো জীবন-যাপন করো। বিলাস-বৈভব নিয়ে দিন কাটাও। সে-দিন মীরাবাঈ তাকে সরাসরি জবাব দিয়ে বলেছিল যে, এ-কাজ সে করতে পারেনা। সে নিতান্ত সাধারণ বেশে গিরিধারীলালের নিত্য-পুজো নিযেই থাকতে চায়। তখন শ্বাশুড়ী অত্যধিক রাগান্বিত হয়ে মীরাবাঈ-এর নামে দুর্নাম রটাতে থাকে। এতে মীরাবাঈ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে গিরিধারীলালকে বলতে থাকে :

"হেরী ম হাঁসু হরিবিন রহ্যো ন জায়।
সাসু লড়ে মেরী ননদ খিজারে, রাণা রহ্যো রিসায়॥

পহরো ভী রাখ্যো চৌকী বিঠায়ো তালা দিয়ো জড়ায়।
পূব জন্মকী প্রীত পূরাণী, সো ক্যুঁ ছ্যোড়ী জায়।
মীরা কে প্রভু গিরধর নাগর আন্তরণ আরে ম্হারী দায়॥"

হে সখী, আমি হরি বিনা থাকতে পারি না। শ্বাশুড়ী অসন্তুষ্ট হন। ননদ গঞ্জনা দেয়। রাণা বিরক্ত হন। তিনি প্রহরী বসিয়েছেন। দ্বারে তালা দিয়েছেন। কিন্তু আমার পূর্বজন্মের পুরাতন এই প্রেম আমি কি করে ছাড়ি। মীরার প্রভু হচ্ছেন গিরিধারী নাগর। অপরজনকে আমি পছন্দ করি না।

টুকরো টুকরো ঘটনা। টুকরো টুকরো ছবি। অতীত স্মৃতির অতীব অনুভূতি। মীরাবাঈ-এর স্মৃতি-ভাণ্ডারের সঞ্চিত রত্ন। মীরাবাঈ আপন মনে মাঝে মাঝে এই স্মৃতি গুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে, এই রত্নগুলো গলায় প'রে নিজেকে অলঙ্কৃত করবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্মৃতির এই রত্নগুলো মীরাবাঈ কে একটুও অলঙ্কৃত করে না। বরং বলা যায় স্বাভাবিক ভাবে তার কণ্ঠরোধ করে। তার শ্বাসরোধকারী হাঁসুলী হয়ে দেখা দেয়। অনর্থক অশ্রু বিসর্জনে সুযোগ করে নেয়। কিন্তু তবুও মীরাবাঈ এ-স্মৃতি মন্থন না করে পারে না। এ মন্থনে গরল-অমৃত দুই-ই আছে। বেদনা-মাধুর্যভরানো বিকেলে ভোরের ফুল। ক্লান্ত দিনের শেষ রাঙ্গানো রোদ্দুর গায়ে মেখেও, চিন্ময়ী রূপে চেতনায় সদা জাগ্রত।

বিক্রমাজিৎ-এর অত্যাচারে একবার মীরাবাঈ আত্মহত্যার সঙ্কল্প করেছিল।

গভীর রাত। মীরাবাঈ চিতোরের নদীতটে এসে বসলো। শান্ত নদী। কোন ঢেউ নেই। অঢেল জ্যোছনা ছড়িয়ে। আকাশ পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় সামনের উদ্যান ভরে উঠেছে। মীরাবাঈ নদীতটে বসে একাকিনী গান ধরেছিল ঃ

"তুমহারে কারণ সব মুখ ছোড়্যা
অব মোঁহি কঁু তরসারো।
বিরহ বিনা লাগী উর অন্দর
সো তুম আয় বুঝারো॥
অব ছোড়্যা নহিঁ বনৈ প্রভুজী
হঁস্ কর তুরংত ব লাবো॥
মীরা দাসী জনম জনমকী
অংগ সুঁ অঁগ লগারো॥"

তোমার জন্যে সব সুখ ত্যাগ করলাম। আর কেন আমাকে দুঃখ দাও। বিরহের ব্যথায় হৃদয় জ্বলছে। তুমি এসে সে আগুন নেভাও। হে প্রভু! তুমি এখন আমাকে ছেড়ে যেও না। হেসে আমার পাশে এসে দাঁড়াও। মীরা তোমার জন্ম-জন্মান্তরের দাসী। তার অঙ্গে তোমার অঙ্গের স্পর্শ লাগাও।

মীরার গানে সমস্ত আকাশ-বাতাস এবং উদ্যান ভরে উঠেছে। মীরাবাঈ গান শেষ করে গিরিধারীলালকে শেষবারের মত প্রণাম জানিয়ে আত্মহত্যার জন্যে ধীরে ধীরে নদীতে নেমে গেল। কিন্তু তার পরেই এক দিব্য জ্যোতি, নীলকান্তি, বংশীধারী বালক মূর্তির ছায়া, সেই নদীতে ভেসে উঠলো এবং মীরাবাঈ-কে নদী

থেকে তুলে নদীতটে বসিয়ে দিল। সেই নীলকান্তি, দিব্য জ্যোতি, বংশীধারী বালক মূর্তির ছায়া মীরাবাঈ-কে নদীতটে বসিয়ে দেবার পর, মীরাবাঈ অজ্ঞান-অবস্থায় শুনতে পেল সেই বংশীধারী বালকমূর্তির বাণী ঃ

"আমার লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে যাও। সেখানে আমার দর্শন পাবে"। মূর্তি শূন্যে মিলিয়ে গেল। মীরাবাঈ সারারাত অজ্ঞান অবস্থায় নদীতটে পড়ে রইলো। প্রভাতে জ্ঞান এলে সে একাকিনী পথ চলতে লাগলো। পথে দেখা গেল একদল বালক-বালিকা প্রভাতী গান গেয়ে ফিরে যাচ্ছে। সে গানের মূল বক্তব্য ঃ হে গিরিধারীলাল, হে বৃন্দাবন-প্রাণ-গোবিন্দ তুমি এসে দেখা দাও।

মীরাবাঈ চলতি-পথে সে গানে যোগ দিল।

এই ঘটনার পর মীরাবাঈ প্রায়ই চিন্তিত থাকতো। নিজের মন্দিরে বসে প্রায়ই একা একা নদীতটের কথা ভাবতো। তখন থেকেই মীরাবাঈ বৃন্দাবনে আসবার জন্যে নিজের মনকে প্রস্তুত করছিল। বৃন্দাবনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। সেই সময়ে মীরাবাঈ-এর অলৌকিক কীর্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তির কথা নানা লোকমুখে প্রচারিত হচ্ছিলো। নানা লোকের-মুখে মীরাবাঈ এর গুণ কীর্তন শুনে একজন কৌতুহলী প্রবাসী সাধু একদিন মীরাবাঈ এর কাছে এসে বলেছিল ঃ আপনি যেমন গিরিধারীলালের দাসী, আমি তেমন দাস। গিরিধারীলাল আপনার দুঃখ দূর করবার জন্যে আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন। সেই আদেশ অনুসারেই আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনি গিরিধারীলালের আদেশ মান্য করে দ্বিধাহীন চিত্তে আমাকে বরণ করুন।

সে দিন সাধুর কথা শুনে মীরাবাঈ অত্যন্ত অবাক হয়েছিল। ভেবেছিল। লোকটা বলে কি। লোকটার চারিত্রিক ব্যাপারে সে দিন মীরাবাঈ-এর যথেষ্ট সন্দেহ জেগেছিল। কিন্তু তবুও সে সন্দেহ গোপন করে মীরাবাঈ শান্ত ভাবে জবাব দিয়েছিল ঃ গিরিধারীলালের আদেশ আমার শিরধার্য। আপনি অনেক দূর থেকে কষ্ট করে আমার কাছে এসেছেন। সুতরাং আগে আপনি বিশ্রাম করুন। আমি আপনার আহারের জোগাড় করি। পরে আপনি যা আদেশ করবেন, আমি তাই করবো।

মীরাবাঈ-এর কথা শুনে সে-দিন ঐ সাধুজী খুবই খুশি হয়েছিলেন।

মীরাবাঈ সাধুজীর জন্যে নানাবিধ আহারের ব্যবস্থা করলো। এবং শেষে বিশ্রামের জন্যে সকল সাধুদের মাঝে তার শয্যার ব্যবস্থা করলো।

তা'দেখে সে-দিন সাধুজী বলেছিলেন ঃ আপনি আমার সঙ্গে কোন নির্জন স্থানে চলুন। আপনার সঙ্গে আমার সাধন বিষয়ে অনেক কথা আছে।

সাধুর কথা শুনে মীরাবাঈ-এর মাথায় আগুন জ্বলছিল। কিন্তু মীরাবাঈ জানে যে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত মানুষদের মাথা গরম করতে নেই। উত্তেজিত হতে নেই। ক্রোধ বৈষ্ণবধর্মে অবধারিত পরিত্যাজ্য। সহনশীলতা ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা বৈষ্ণবধর্মের অবশ্য করনীয় বিষয়। এই কথা মনে রেখেই সে-দিন মীরাবাঈ খুব ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিয়েছিল ঃ সাধুজী, আমি তো

ত্রিভুবনে এমন স্থান দেখি না, যেখানে আমার প্রিয় গিরিধারীলাল নেই। তা' ছাড়া চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও অন্যান্য দেবগণ জগতের যাবতীয় কাজের সাক্ষী-স্বরূপ সর্বত্র অবস্থান করছেন। তাঁরা দেখতে পান না, অথবা পাপ-পুণ্যের সাক্ষী হন না, এমন স্থান তো নেই সাধুজী। আমি আপনার জন্যে নির্জন স্থান কোথায় পাবো ?

মীরাবাঈ-এর কথা শুনে সাধুজী অনেকক্ষণ মীরাবাঈ-এর দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে স্থান ত্যাগ করেছিল।

মীরাবাঈ এই ধরনের সাধুর আর মুখোমুখি হয়নি। এ একজনই মাত্র। মীরাবাঈ মনে করে এ-সব হচ্ছে গিরিধারীলালের পরীক্ষা। তিনি ভক্তের শুধু ভক্তিই পরীক্ষা করেন না। নৈতিক বল ও দেখে নেন। মীরাবাঈ-এর বিশ্বাস মানুষকে ঈশ্বরমুখী হতেই হবে। এবং নানা সঙ্কট ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে তার উত্তোরণ ঘটবে। এ-পথে আসতে গেলে নিয়তই পরীক্ষা। পরীক্ষা ছাড়া পথ নেই।

তৎকালীন যুদ্ধ ক্লান্ত মানুষ যখন স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীভগবানের কাছে নিজের মুক্তির পথ খুঁজতে চাইল, তখন তারা হাতের সামনে পেল দুটি দেবতাকে। শিব এবং বিষ্ণু। কারণ এই দুই দেবতার পুজো অনেক আগে থেকেই প্রচলিত। বিষ্ণুর যারা উপাসক, তাদের বলা হয় বৈষ্ণব। তেরশ' শতাব্দীতে উত্তর ভারতে যে ভক্তিরসের বন্যা বয়ে যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে তাঁরা শ্রীভগবানকে পেতে চেয়েছেন ভক্তি, ভালবাসা, পুজো ইত্যাদির মাধ্যমে। সেখানে যুক্তি-তর্ক বড় হয়ে ওঠেনি। যুক্তি-তর্ক দিয়ে ভগবানের আকার-নিরাকার অথবা তাঁকে পাবার পথের কথা কেউ ভাবেনি। এই ভক্তি-ভাবনার ওপর অখণ্ড বিশ্বাস আনতে সাহায্য করেছে তৎকালীন বিখ্যাত একটি বই 'ভাগবত পুরাণ'। এখানে বিষ্ণুকে কৃষ্ণ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এদিকে দক্ষিণ ভারত থেকে রামানুজ, বিষ্ণু পুজোর পুরোধা হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ ভাল ভাবেই এগিয়ে এসেছে। মানুষ ভক্তি-ভাবনায় বিশ্বাসী হয়ে পুজো-পার্বনেই নিজের মানসিক প্রস্তুতির চেষ্টা চালিয়েছে। সেই সময়ে রাজপ্রাসাদ থেকে শুরু করে পল্লী কুটিরের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ঐ একই ভাবনায় পুষ্ট ছিল। একই ভাবনায় ভাবিত এবং একই ভক্তি রসে আপ্লুত ছিল। মীরাবাঈ মনে করে, এই ভক্তি রসের ফসল হিসাবেই এসেছে কাব্য, সংগীত ও গাঁথা। তৎকালীন বিখ্যাত কবিরা ভক্তি-রসের মাধ্যমেই কবিতা রচনা করেছেন এবং ভক্তি-রস প্রচার করেছেন। এঁরা কবিতায় যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, সাহিত্যের গুণ বিচারে তা' অনবদ্য এবং সেই কারণেই এঁরা আজও অমর। এঁরা সাহিত্য ও অখণ্ড ভক্তি-বিশ্বাসের জোরেই আজও সমস্ত মানুষের মনে স্থায়ী আসনে বসে আসেন। মীরাবাঈ ও সেই ভক্তিরসের মাধ্যমেই কৃষ্ণকে পেতে চেয়েছে। এবং এ-কথা মীরাবাঈ শ্রীবৃন্দাবনের অনেক সভাতেও ব্যক্ত করেছে। কৃষ্ণকে ভালবাসার মাধ্যমেই নিজের মুক্তির পথ খুঁজেছে। এবং সেই কারণেই তার সংগীত রচনা ও পরিবেশন। মীরাবাঈ মনে করে তার এই সংগীত রচনা ও পরিবেশনের নেপথ্যে রয়েছে তারই ইষ্ট দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ও বিভূতি।

মীরাবাঈ যত আসরেই গান গেয়েছে সকলেই মুগ্ধ হয়েছে। তার কারণ হিসাবে মীরাবাঈ মনে করে যে, তার গান মূলত ভক্তি-মূলক। ভক্তি-ভাবনাকে কেন্দ্র বিন্দু করে এবং ভক্তি-বিশ্বাসকে অখণ্ড রেখে তার জীবন চারণা, সংগীত রচনা এবং পরিবেশনা। তার গানের মূল উৎস কৃষ্ণ ভজনা। কৃষ্ণকে দর্শন পাবার তীব্র আকুতি ও তাঁকে না পাবার বেদনা বোধ। সেই কারণেই মীরাবাঈ মনে করে যে তার পদ অথবা কাব্যকে যদি বিচার করতে হয়, তাহলে ভক্তির মাধ্যমে আসতে হবে। যেহেতু তার পদ অথবা কাব্য ধর্ম-বিশ্বাস ও ভক্তি-ভাবনাকে ঘিরে আছে। ভক্তি-সাহিত্যে মীরাবাঈ আদি ও অকৃত্রিম। ভক্তি-ভাবনা বা ধর্ম-বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে মীরাবাঈ-এর সাধনা অথবা কাব্য বিচার অসম্ভব। মীরাবাঈ একটা কথাই তার ভক্তদের বোঝাতে চেয়েছে যে, তার সাধনার মূল কথা হচ্ছে, নিজের জন্ম ও পুনরজন্মের যে বৃত্ত, তা থেকে নিজেকে বাইরে নিয়ে আসা এবং অতি মানবীয় শক্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই সাধনার পথে অগ্রসর হবার যে মাধ্যম সে বেছে নিয়েছিল, সেটা ভক্তি, পুজা ও ধর্মভাব। এবং ভক্তি, পুজা ও ধর্মভাবের প্রতীক হিসাবে সে আশ্রয় নিয়েছিল কৃষ্ণের কাছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই সে মনে করেছিল, আশ্রয়দাতা ও মুক্তিদাতা।

মীরাবাঈ শ্রীবৃন্দাবনের অনেক সভাতেই বলেছে, যে-কৃষ্ণকে সে আশ্রয়দাতা ও মুক্তিদাতা হিসাবে ভজনা করেছে, সে-কৃষ্ণ মহাভারতের বীর যোদ্ধা নয়, সে-কৃষ্ণ ভাগবত পুরাণের ননী চোর, গোচারক, এবং প্রেমিক কৃষ্ণ। বৃন্দাবন লীলার কৃষ্ণ, গোপী পরিবৃতা কৃষ্ণ। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ। মীরাবাঈ কৃষ্ণকে ভজনা করেছে গোপীরূপে। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে গোপীরূপে কৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি ও ভালবাসা সেটাই শ্রেষ্ট। কারণ তাতে গভীরতা অনেক বেশী।

ভাগবত গীতায় ভক্তির যথার্থ অর্থ বোঝাতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:

আমার প্রতি মন রাখো। আমার প্রতি অনুরক্ত থাকো। আমার জন্যে জীবন উৎসর্গ করো। আমি বিশ্বাস করি এবং আমি অঙ্গীকার করছি, তুমি আমার দেখা পাবে। কারণ তুমি আমার প্রিয়।

মীরাবাঈ এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে সারা জীবন কৃষ্ণকে অনুসরণ করে এসেছে। জীবনের দুর্দিনে ও সুদিনে, বিপদে ও আপদে সে কৃষ্ণের সহচরী বলে মনে করেছে। কৃষ্ণকে ভক্তি ও পুজার মাধ্যমে সেবা করাকেই সে জীবনের সব পাওয়ার শেষ পাওয়া বলে মনে করেছে।

মীরাবাঈ মনে করে ভক্তের ভক্তিই বড় কথা। সে কোন জাতিভুক্ত সেটা নয়। রৈদাস জাতিতে চামার। কিন্তু মীরাবাঈ ক্ষত্রিয় বংশীয়া হয়েও তাঁকেই গুরু পদে বরণ করেছিল। তার কারণ রৈদাসের ভক্তি, সংস্কার উত্তীর্ণ জ্ঞান। মীরাবাঈ বিশ্বাস করে, সংস্কার উত্তীর্ণ জ্ঞানই গুরুর জাতি। গুরুর কুল।

উপনিষদেও দেখা যায় যে ব্রাহ্মণেরা সমিৎ পাণি কুশ হস্ত হয়ে আত্মজ্ঞানের উপদেশের জন্যে জ্ঞানী ক্ষত্রিয় রাজাদিগের শরণাপন্ন হতেন। পিতা ও গুরু

ব্যাসদেবের উপদেশও যখন শুকের আত্মজ্ঞান স্ফুরণ হল না, তখন ব্যাসদেব পুত্রকে যজমান রাজর্ষি জনকের কাছে উপদেশের জন্যে পাঠালেন। তিনি জনকের কাছে কোন প্রকার যোগৈশ্বর্য্য দেখতে নিষেধ করলেন এবং আকাশ পথে না গিয়ে পাদচারে জনকের নিকট গিয়ে অতি বিনীত ভাবে হাত জোড় করে তাঁর নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করতে উপদেশ দিলেন।

শুকদেবও পিতার আদেশ অনুসারে রাজর্ষি জনকের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে গুরু বলে সম্বোধন করে নিবেদন করলেন ঃ

সংসারড়ম্বর মিদং কথং অভুত্থিতং গুরো।
কথং প্রশমমায়াতি যথাবৎ কথয়াস্তমে ॥

আত্মজ্ঞান গুরুই সদ্‌গুরু। জাতিতে চামার হয়েও রৈদাস আত্মজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। সেই কারণেই মীরাবাঈ আত্মজ্ঞান লাভের জন্যে রৈদাসকেই স্বীকার করে নিয়েছিল। সে আজকে কতকাল হলো। তারপর মীরাবাঈ এর কত পথ-পরিক্রমা। জীবনের কত পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে। সুখে, দুঃখে, নানা অভিজ্ঞতার পণ্য বোঝাই করে। পরবর্তী জীবনে রৈদাসের সঙ্গে মীরাবাঈ-এর আর দেখা হয়নি। কিন্তু তবুও আজও মীরাবাঈ তাঁকে ভুলে যায়নি। বরং বিপদে-আপদে তাঁকেই আগে স্মরণ করে।

সদগুরু কারো ভাগ্যে সহজে ঘটে না। মীরাবাঈও সহজে গুরুলাভ করেনি। প্রাণে যখন বৈরাগ্য আসে, সংসারে কোন জিনিষের প্রতি মন যখন আর নিয়োজিত করা না যায়, অথচ অন্য কোন আশ্রয়ও পাওয়া যায় না, তখনই লোকে উপদেষ্টার অনুসন্ধান করে। মীরবোঈ ও তার দাদু দুদাজী মারফৎ দেশ-বিদেশের সদ্‌গুরুর জন্যে অনেক অনুসন্ধান করেছিল এবং শেষে জ্ঞানী সাধু রৈদাসের দেখা পেতে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। মীরাবাঈ তার ভক্তবৃন্দকে বার বার বলেছে যে, আমি দেশ-বিদেশে খোঁজ নিয়েছি, এমন কোন বৈদ্য আছেন কিনা, যিনি প্রকৃত তত্ত্ব জানেন। কিন্তু কেউ সন্ধান দিতে পারেনি। অবশেষে আমার ভাগ্যে সাধু রৈদাসকে গুরুরূপে পেলাম। তিনি আমাকে স্বরূপ জ্ঞান দিলেন।

ঐসা বৈদ মিলৈ কোঈ দেশ-বিদেশ পিছানী।
খোজত ফিরোঁ ভেদবা ঘরকো, কোঈ ন করত বখানী ॥
রৈদাস সন্ত মিলে মোহি সতগুরু, দীনহা সুরত সহদানী ॥

সদ্‌গুরু লাভ হলেই শিষ্য কৃতকৃত হয় না। গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধনা করতে করতে শেষে সাধনার চরম ফল আত্মানুভূতি জন্মায়। মীরাবাঈ এর ও তাই হয়েছে। মীরাবাঈ সনাতনকে বলেছে ; গুরু আমাকে একটি বিশেষ শব্দ লক্ষ্য করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি নিদ্রিত ছিলাম। সেই শব্দ শুনেই আমি জেগে উঠলাম এবং গুরুদত্ত সেই শব্দের অনুশীলন করতে করতেই আমার আত্ম প্রতীতি জন্মালো। ভব ব্যাধির চিকিৎসার জন্যে সদ্‌গুরুর তুল্য বৈদ্য আর নেই। আমি সেই পরম গুরুর আশ্রয়েই থাকবো। শাস্ত্রে ও দেখা যায় ঃ গুরো ঃ পরতং নাস্তি, তস্মাৎ সমপুজয়েদ্ গুরুম্"।

রৈদাস সদগুরু। মীরাবাঈ-এর দীক্ষা গুরু। ভোজরাজ তার স্বামী হলেও অনায়াসেই সদ্‌গুরুর পদে বসানো যায়। ভোজরাজ দীর্ঘজীবী হলে মীরাবাঈ দীর্ঘদিন ধরে তাকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানাতে পারতো। ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু ভোজরাজের আকস্মিক মৃত্যুতে কিছুই সম্ভব হয়নি। ভোজরাজের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যখন চিতোর থেকে দূত আসে, তখন শুধুমাত্র মীরাবাঈ-এর পিতা রতন সিংহ-ই অবাক হয়নি। মীরাবাঈ-ও অবাক হয়েছিল। তখন মীরাবাঈ-এর বয়স বেশি না হলেও চিতোর সম্পর্কে সে অনেক কিছু শুনেছিল। সত্য মিথ্যা মিলিয়ে চিতোর গড় তার মনের আকাশে নানা রঙ্গিন আলপনা এঁকেছিল। চিতোর গড়ের রাণা মহলে তার আগমন ঘটবে, এ বিশ্বাস কোন দিনও তার মনে দানা বাঁধেনি। বিবাহের পর চিতোরের বিলাস বৈভব তার মনে কোন দাগ না কাটলেও ভোজরাজকে ভালোই লেগেছিল। ভোজরাজের পাশে দাঁড়িয়ে সে নিজের পূর্ণতা আশা করেছিল। সাধন-সিদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিল।

বিবাহের পর একদিন ভোজরাজ মীরাবঈ-এর মন্দিরে এসে একখানা পুরোনো পুঁথি হাতে দিয়ে বলেছিল: এটা পুরোনো পুঁথি বলে অবহেলা কোরো না। এ পুঁথি আমাদের চিতোর গড়ের ইতিহাস। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের পূর্ণ পরিচিতি। তুমি এই চিতোর গড়ের বধূ হয়ে এসেছো। সুতরাং আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ইতিহাস তোমার জানা উচিত। আমি আশা করবো তুমি উৎসাহ নিয়ে এই পুঁথিখানা পড়বে এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কীর্তিগাঁথা ও সঠিক ইতিহাস জেনে রাখবে। কারণ এ ইতিহাস জানা তোমার একান্ত প্রয়োজন।

মীরাবাঈ সে দিন হাসি মুখে পুঁথিখানা হাতে নিয়ে বলেছিল: আমার পিতা চিতোরের 'সংগ্রাম পারিষদেব' সদস্য। চিতোর অধিকারের জন্যে অনেকেই লড়াই করেছেন। চিতোবের সংগ্রামী রাণাবা সংগ্রাম করে এই চিতোর দীর্ঘদিন ধরে ঠেকিয়ে রেখেছেন। এ সব গল্প আমি আমার পিতার মুখে অনেক বার শুনেছি। তবুও চিতোরের পূর্ণ ইতিহাস এবং রাণা পরিবারের কীর্তিগাঁথা জানবার জন্যে আমি বরাবরই কৌতুহলী। এই পুঁথিটি পেয়ে আমার খুবই সুবিধা হলো। আমি নিশ্চয়ই পড়বো। এবং একদিন সময় করে মীরাবাঈ সত্যিই চিতোরের ইতিহাসটা পড়ে ফেলেছিল। এবং পড়ে লাভবানই হয়েছিল।

অনেকে মনে করেন, এ দুর্গ নির্মান করেন মহাভারতের ভীম। আবার কিছু কিছু ঐতিহাসিকের মতে এ দুর্গের নির্মাতা চিত্রংগদ। তিনি মৌর্যদের প্রধান ছিলেন এবং এ দুর্গে সতেরো শতকে রাজত্ব করে গেছেন। তিনি এ দুর্গের নাম দিয়েছিলেন চিত্রকুট। মেওয়ারের মুদ্রায় এই নাম পাওয়া যায়। মীরাবাঈ জানে যে দুর্গের মধ্যে তাঁর নামে একটি রাজপ্রাসাদ ও একটি জলাশয় আছে। চিত্রাংগদের পরে আর কোন মোর্য্য রাজা এখানে রাজত্ব করেছেন কিনা তা ঐ পুঁথিতে লেখা নেই। তবে সর্বজন স্বীকৃত মত হচ্ছে, বাপ্পারাওয়াল এই চিতোর আরবদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। এরপর তিনি কাবুল, কান্দাহার, ইরান, তুরান ইত্যাদি জয় করেন। এই বংশ চিতোরে ১২০ বছর রাজত্ব করে গেছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে বাপ্পারাওয়ালের আগে

চিতোরে রাজত্ব করে গেছেন মোরী বংশের রাজারা। বাপ্পারাওয়াল শেষ মোরী বংশের ভাগ্নে। মোরী বংশের শেষ রাজা তাঁর রাজ্যের সামন্তবর্গের জায়গীর কেড়ে নেবার ফলে, তাঁরা জোট বেঁধে মোরীরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে বাপ্পারাওয়ালকে সিংহাসনে বসান। বাপ্পারাওয়াল গিহেলাট্ বংশীয় হলেও মেবারের শীশোদিয়া বংশীয় রাজবৃন্দের আদি পুরুষ। এই বংশ সূর্য বংশ থেকে উৎপন্ন। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব থেকে এই বংশের আবির্ভাব। লব লবকোট বা লাহোর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বংশধরেরা দীর্ঘদিন সেখানে রাজত্ব করেন। লব-বংশের যে শাখা থেকে মেবারের রাণাদের উৎপত্তি, সেই শাখার অন্যতম রাজা কনক সেন সেখান থেকে চলে এসে দ্বারকায় নিজের রাজ্য স্থাপন করেন। সেই সময়ে এই বংশ সেন বংশ নামে পরিচিত ছিল। এরপর এই সেন-বংশীয় রাণারা স্থান পরিবর্তন করে অন্য স্থানে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে। এই স্থান পরিবর্তনের ফলে এবং আরও নানা কারনে এই বংশ ঘেলোট্ বংশ নামে পরিচিত হতে আরম্ভ করে। এই ঘেলোট্ বংশ প্রথমে অহর্যবংশ ও পরে শীশোদিয়া বংশে পরিণত হয়। শীশোদীয়া বংশের প্রথম পুরুষ বাপ্পারাওয়াল। তারপর থেকেই মেবারের রাণারা শীশোদীয়া বংশীয় বলে পরিচিতি লাভ করে।

কনক সেন লাহোর থেকে সৌরাষ্ট্র প্রদেশে চলে আসেন এবং সেখানে বীর নগর নামে একটি নগরী স্থাপন করেন। তাঁর চার পুরুষ পরে বিজয় সেন নামে একজন পরাক্রমশালী রাজা বিজয়পুর, বিদর্ভ ও বল্লভীপুর নামে তিনটি নগরী স্থাপন করেন। এবং নিজের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে আসেন বল্লভীপুরে। বল্লভীপুরের রাজারা সূর্য ও অগ্নির উপাসক ছিলেন। এই বংশের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন শিলাদিত্য। শিলাদিত্য কোন এক যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর পত্নীগণ তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হন। কিন্তু রাজমহিষী পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন বলে সহমৃতা হতে পারেন নি। সেই সময়ে তিনি রাজধানীতে ছিলেন না। তিনি ছিলেন পিতৃগৃহে। শিলাদিত্যের মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি রাজধানীতে ফিরে আসছিলেন। পথে একটি গুহার অভ্যন্তরে তিনি সন্তান প্রসব করেন। শত্রুরা যাতে তার পুত্রকে হত্যা করতে না পারে সেই কারনে তিনি 'বীরনগরে' কমলাবতী নামে একজন ব্রাহ্মণ পত্নীর হাতে তাঁর পুত্রের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার দিয়ে শত্রুদের হাতে ধরা পড়বার আগেই আত্মাহুতি দেন।

কমলাবতী 'বীরনগরীতে কোন এক দেবালয়ের সেবিকা ছিলেন। তিনি স্বয়ং ও পুত্রবতী ছিলেন। তবুও রাণী পুষ্পবতীর পুত্রকেও নিজের পুত্রের মত পালন করেছিলেন। গুহাজাত পুত্রবলে তিনি রাজকুমারের নাম রেখেছিলেন 'গোহা'। উত্তর কালে এই 'গোহা'-ই গোহাবংশের প্রতিষ্টাতা।

এই 'বীরনগরে'ও বাপ্পারাওয়ালের জীবনহাণীর আশঙ্কা দেখে কমলাবতী তাকে ভান্দীয়ার দুর্গে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেখানেও তার জীবনহাণীর আশঙ্কা অনুমান করে তাকে শেষে 'পরাশরারণ্যে' নিয়ে যাওয়া হয়। সেই অরণ্যের মধ্যভাগে 'ত্রিকুট' নামে এক পর্বত আছে। তার পাদদেশে 'নগেন্দ্র' নামে এক নগরীর অবস্থান।

সেখানকার রাজা ছিলেন নগেন্দ্র এবং তাঁর নামেই সে-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। গিরিগুহা বেষ্টিত এই রাজ্যেই বাপ্পারাওয়ালের শৈশব কাল অতিবাহিত হয়। এখানে প্রাচীন দেব-দেবীর অনেক মন্দির আছে। এখানকার অধিবাসীরা অতীত কাল থেকেই মহাদেব অথবা একলিঙ্গের উপাসক। চিতোর গড়ের বাপ্পারাওয়াল থেকে শুরু করে সকল রাজারাই শৈব। শিবের উপাসক। মহারাণারা একলিঙ্গকে নিজেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলে মনে করেন। আর নিজেদের মনে করেন এ দেবতার প্রতিনিধি অথবা দেওয়ান।

বাপ্পারাওয়াল সম্পর্কে নানা গল্প প্রচলিত আছে। শোনাযায়, গিরি-গুহা বেষ্টিত এ 'নগেন্দ্র' নগরে বাপ্পারাওয়াল ছেলেবেলায় গরু চরাতেন। একদিন তিনি মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে এক নিকুঞ্জবনে বসে আছেন। এমন সময় সোলাঙ্কি বংশের নগদা-রাজ্যের রাজার মেয়ে তার সঙ্গিনীদের নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। সে-দিন ছিল ঝুলন উৎসবের দিন। নগদা-রাজ্যের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সেই দিন স্ত্রী-পুরুষ একত্রে ঝুলনে ঝুলতে হয়। কিন্তু সেই সোলাঙ্কি কন্যা ও তার সখীবৃন্দ ঝুলনের দড়ি সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। সুতরাং তারা বাপ্পারাওয়ালের কাছে গিয়ে তাঁকে একটা বড় দড়ি এনে দিতে অনুরোধ জানালো। বাপ্পারাওয়াল প্রথমে রাজি হলেন না। পরে অনেক অনুনয়ের পর একটি সর্তে রাজি হলেন। তাঁর সর্ত হলো, আগে খেলার মাধ্যমে একটি বিবাহ-অনুষ্ঠান পালন করা হবে। পরে ঝুলন যাত্রা। সোলাঙ্কি-কন্যা ও তার সখীবৃন্দ রাজি হয়ে গেল। কারণ এতে তাদের ঝুলন যাত্রার যে ইচ্ছা, সেটা ফলবতী হবে। ফলে ঐ নিকুঞ্জবনে একটি বিবাহ-অনুষ্টান পালন করা হয়। বিবাহ-অনুষ্ঠানে বাপ্পারওয়াল নায়ক ও সোলঙ্কি-কন্যা নায়িকা সাজলেন ও তার সঙ্গিনীগণ সখী। নায়িকার সখীরা সোলাঙ্কি-কন্যার আঁচলের সঙ্গে নায়কের উত্তরীয় বেঁধে দিলেন। এবং দুজনকে হাতে হাতে বেঁধে একটা গাছের নীচে দাঁড় করালেন। তারপর সকলে একত্রে সেই গাছটাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। এই ভাবে এক প্রকার শাস্ত্র মতেই তাঁদের বিবাহ কাজ শেষ হল। সেইদিন সেই সোলাঙ্কি-কন্যা বাপ্পারাওয়ালের এক রকম স্ত্রী বলেই গণ্য হল।

কিন্তু এই ঘটনার পর বাপ্পারাওয়ালের মনে হল তাঁকে এবারে হত্যা করবার একটা চেষ্টা হতে পারে। নগদা-রাজ্যের রাজার কানে যদি এ-খবর যায়, তবে তিনি বাপ্পারওয়ালকে খুঁজে বার করবেন এবং উচিত মত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এ-কথা মনে হতেই বাপ্পারাওয়াল নগদা রাজ্য ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। এবং এই পলায়নই তাঁর উত্তর-জীবনে তাঁকে কীর্তিমান হতে সাহায্য করলো।

তিনি পালিয়ে যাবার কিছুদিন পরেই সোলাঙ্কি-কন্যার এক রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব এল। সেই উপলক্ষ্যে সোলাঙ্কি রাজার কুলপুরোহিত রাজকন্যার হাতের রেখা বিচার করতে বসলেন। এবং দীর্ঘ সময় হাতের রেখা বিচার করে বললেন যে, রাজনন্দিনীর বিবাহ আগেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। কুলপুরোহিতের

কথা শুনে রাজ পরিবারের লোকেরা অবাক। তাঁরা এমন একটা ঘটনা শোনবার জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। তখন নগদা-রাজ্যের রাজা সমস্ত ঘটনা জানবার জন্যে কিছু গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই গুপ্তচরেরা যথাযথ খবর নিয়ে এল। কবে বিবাহ-কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কোথায় হয়েছে। এবং এ বিবাহ-সভায় কারা উপস্থিত ছিল। ফলে সমস্ত ঘটনাই সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল। এবং রাজপরিবারে এক অশান্তি ঘনিয়ে এল।

সোলাঙ্কি রাজ শেষে বাপ্পারওয়ালকে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্যে লোক লাগালেন, তাকে ধরে রাজসভায় আনবার জন্যে। বাপ্পারাওয়াল সে খবর জানতে পেরে দু'জন বিশ্বস্ত ভিল্-কে নিয়ে সেই রাজ্য ত্যাগ করে আরও গভীর বনে গিয়ে আত্মগোপন করে রইলেন। তাঁর দিন খুবই কষ্টে কাটতে লাগলো। যে দু'জন ভিল্ এই গোপন খবর দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, তাঁদের একজনের নাম বালেয়ো ও অপর জনের নাম দেবা। বালেয়ো একজন গুহাবাসী ও দেবা সোলাঙ্কি বংশীয়। উত্তর কালে মোরী বংশীয় রাজার কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নিয়ে বাপ্পারাওয়াল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন এই বালেয়ো-ই তার নিজের আঙ্গুল কেটে রক্ত দিয়ে বাপ্পারাওয়ালের কপালে রাজটীকা পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই কারণে চিতোরের মহারাণার বংশধরগণ অভিষেক কালে রাজললাটে রাজটীকা ধারণের অধিকার দীর্ঘ দিন ভোগ করে এসেছেন।

বাপ্পারাওয়াল যখন গভীর বনে আত্মগোপন করে কাটাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে একটা অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। এবং সেই অলৌকিক ঘটনাই তার ভবিষ্যত জীবনকে সম্ভাবনাময় করে তোলে। নিভৃত-বাসকালে বাপ্পারাওয়াল প্রতিদিন গরু চরাতে যেতেন এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন। ঘরে ফিরে এলে, গৃহস্বামী গরু দোহন করে একটু ও দুধ পেতেন না। গৃহস্বামী ভাবলেন বাপ্পারাওয়াল প্রতিদিন গরু ঘরে আনবার আগে দোহন করে খেয়ে নিচ্ছে। তিনি এই ধারনার বশবর্তী হলেন বটে তবে বাপ্পারাওয়ালকে মুখে কিছু বললেন না। পরে একদিন থাকতে না পেরে তিনি তাঁর সন্দেহের কথা বাপ্পারাওয়ালকে জানালেন। বাপ্পারাওয়াল এই দোষারোপে রেগে আগুন হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। তিনি গোপনে অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। এবং শেষে অনুসন্ধানে জানতে পারলেন যে, এ-সন্দেহ একটুও অমূলক নয়। কারণ তিনি দেখলেন যে দুগ্ধবতী গাভী প্রতিদিনই সন্ধ্যায় দুধ-শূন্য অবস্থায় বাড়ী ফিরে আসছে। তিনি অবাক হলেন এবং সেইদিন থেকে গাভীর চলাফেরার প্রতি নজর রাখতে লাগলেন। একদিন তিনি দেখলেন যে, অলৌকিক ধেনু কোন একটি গুহামধ্যে প্রবেশ করে একটি কুঞ্জের কাছে নিজেই স্বতস্ফূর্ত ভাবে নিজের দুধ ঝরিয়ে দিচ্ছে। এবং সেই কুঞ্জের পাশে একজন মহাপুরুষ আপন মনে ধ্যানস্থ আছেন। অবস্থা দেখে বাপ্পারাওয়াল অতিমাত্রায় চিন্তিত হলেন। বাপ্পারাওয়াল তখন নানাভাবে এ মহাপুরুষের ধ্যান ভাঙ্গাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোন ভাবেই সফল হতে না পেরে শেষে এক বিরাট চিৎকার করে উঠলেন। ফল ভালই হল। মহাপুরুষের ধ্যান

ভাঙলো। তখন বাপ্পারাওয়াল সেই মহাপুরুষকে স্তব-স্তুতি করে জানতে পারলেন যে, এই মহাপুরুষ হলেন প্রজাপতি হারিত। তিনি এতদিন এখানে আত্মগোপন অবস্থায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

প্রজাপতি হারিত বাপ্পরাওয়ালের পরিচয় জানতে চাইলেন। বাপ্পারাওয়াল তাঁর নিজের পরিচয় যতদূর জানা ছিল জানালেন। এবং তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। প্রজাপতি হারিত অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন।

প্রজাপতি হারিতের সঙ্গে বাপ্পারাওয়ালের যোগাযোগের সূচনা এইভাবেই। তারপর বাপ্পারাওয়াল প্রায় প্রতিদিনই সেখানে এসে বসতেন। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রজাপতি হারিতকে প্রণাম জানাতেন। এবং পর্যাপ্ত দুধ দোহন করে তাঁর সেবার জন্য দিতেন। প্রজপতি হারিতও বাপ্পারাওয়ালের ব্যবহারে অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে নানা উপদেশ দিতেন। দিনে দিনে তাঁদের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো। শেষে একদিন প্রজাপতি হারিত নিজে বাপ্পারাওয়ালের ললাটে ত্রি-পুণ্ডক টীকা প্রদান করে, তাঁকে শৈব-ধর্মের গূঢ়তত্ত্বে দীক্ষা দিলেন। এবং তাঁকে ভগবান একলিঙ্গের প্রতিনিধি বা দেওয়ান পদে অভিষিক্ত করলেন। উত্তর-কালে মেবারের সমস্ত রাণারাই বাপ্পারাওয়ালের বংশধর হবার ফলে, তাঁরা সকলেই একলিংগের পূজারী ছিলেন এবং একলিঙ্গের প্রতিনিধি বা দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হতেন। বাপ্পারাওয়ালের জীবনের শুভ-সূচনা এখানেই শেষ নয়। এরপরও তিনি একলিংগের পূজা করে এবং প্রজাপতি হারিতের সেবার মাধ্যমে সিংহ-বাহিনী ভবানীর দর্শন লাভ করেছিলেন। শোনা যায়, দেবী স্বহস্তে বাপ্পারাওয়ালকে বিশ্বকর্মা নির্মিত এক অপূর্ব কুণ্ডক্ উপহার দিয়েছিলেন। সেই কুণ্ডক্ চিতোর গড়ে রাণা বংশে পুরুষাণুক্রমে বিদ্যমান ছিল। লোকে বলে, অত সুন্দর কুণ্ডক্ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় নি। শোনা যায়, মা ভবানী নিজে হাতে তাঁকে নানা অস্ত্রে বিভূষিত করে দিয়েছিলেন। এবং তার বিনিময়ে বাপ্পারাওয়ালের কাছ থেকে শুধুমাত্র ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি দাবী করেছিলেন। প্রজাপতি হারিতও ঐ স্থান ত্যাগের পূর্বে বাপ্পারাওয়ালকে নানা ভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন।

বাপ্পারাওয়াল আগেই তাঁর পবিচাবিকার মুখে শুনেছিলেন যে তিন মোরী বংশের ভাগ্নে। এখন তিনি দেব বলে বলীয়ান হয়ে কিছু সহচর সংগে নিয়ে অরণ্য প্রদেশের গুপ্তস্থান ত্যাগ করে সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। অরণ্য প্রদেশ ত্যাগ করে যাবার সময় ত্রিগড় পাহাড়ে মহর্ষি গোরক্ষানাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষির পাদপদ্মে ভক্তিভরে প্রণাম জানান। মহর্ষি তাঁর ভক্তিতে প্রীত হয়ে একখানা দ্বি-ফলক খড়্গ উপহার দেন। বাপ্পারাওয়াল সেই মন্ত্রপূত খড়্গ, মা-ভবানীর অস্ত্র এবং প্রজাপতি হারিতের আশীর্বাদ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজের সহচরদের সঙ্গে নিয়ে চিতোর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

বাপ্পারাওয়াল চিতোর গড়ের প্রতিষ্ঠাতা। বাপ্পারাওয়ালের বংশ থেকে চিতোর-রাণা বংশের সূত্রপাত। এবং চিতোরের রাণারা যে পুরুষানুক্রমে শৈব

শক্তির সাধক এবং একলিঙ্গের পূজারী, এর সূচনা বাপ্পারাওয়ালের কাল থেকেই। বাপ্পারাওয়ালই রাণাবংশের উত্তর পুরুষ। তখন চিতোর গড়ে রাজত্ব করতেন মোরী-বংশীয় রাজারা। বাপ্পারাওয়াল যে মোরী-বংশের ভাগ্নে, এ-কথা তিনি জানতেন। তিনি সদলবলে চিতোর গড়ে এসে মোরী-বংশীয় রাজাকে নিজের পরিচয় প্রদান করলেন। মোরী-বংশের রাজা বাপ্পারাওয়ালের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে এবং গোপনে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, সে সত্যিই মোরী-রাজার ভাগ্নে। তখন মোরী-রাজ বাপ্পারাওয়াল কে নিজের সামন্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে, তার ব্যায় বহনের জন্যে একটা জমিদারি প্রদান করলেন। মেবারে তখন সামন্ত-তন্ত্র-রাজ্যপ্রণালী প্রচলিত ছিল। ফলে মোরী-রাজ অসংখ্য সামন্ত-বর্গে পরিবেষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই যুদ্ধের সময় রাজাকে সৈন্য সাহায্য করবার সর্তে এক-একটি জমিদারি অথবা জায়গির ভোগ করতেন। বাপ্পারাওয়াল অত্যন্ত সৎচরিত্র, বীর ও দৈব্যশক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। বাপ্পারাওয়াল অন্যান্য সামন্তদের চেয়ে যথেষ্ট ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ার ফলে, অল্পদিনেই রাজার অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। বাপ্পারাওয়ালের প্রতি রাজার এই ধরনের অনুগ্রহ দেখে অনেক সামন্ত রাজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁরা রাজাকে আর সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন না। ঠিক এমন সময়, মোরী রাজ্য এক বৈদেশিক শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হল। মোরী-রাজ যথা নিয়মে তাঁর সামন্তবর্গকে যুদ্ধের জন্যে সৈন্য দিতে আদেশ করলেন। কিন্তু অসন্তুষ্ট সামন্তবর্গ তাঁর আদেশ পালন করলেন না। বরং প্রত্যেকেই তাঁদের জায়গির মোরী-রাজ-কে ফিরিয়ে দিলেন। এবং বলে পাঠালেন যে, নবাগত সামন্ত যুবকের প্রতি তাঁর যখন এতই অনুগ্রহ, তখন তাঁকেই যুদ্ধে প্রেরণ করা হোক।

সামন্তবর্গের এই ধরণের বিরূপ মনোভাব দেখে মোরী-রাজ তাঁদের জয়াগির থেকে বঞ্চিত করলেন এবং বাপ্পারাওয়ালকে সেনাপতি পদে বরণ করে যুদ্ধে পাঠালেন। বাপ্পারাওয়াল নিজের চেষ্টায় ও বীরত্বে শত্রুকে পরাস্ত করে মোরী-রাজ-কে রক্ষা করলেন।

এদিকে সামন্ত-বর্গেরা মোরীরাজের নিকট উপযুক্ত সম্মান না পেয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে চিতোর ছেড়ে চলে গেলেন। মোরী-রাজ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে শেষে তাঁদের ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা ফিরে আসতে অস্বীকার করলেন। এবং বলে পাঠালেন যে, তাঁরা এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। এদিকে সামন্ত-বর্গেরা বাপ্পারাওয়ালের শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব ও উদারতা দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা একত্রে আলাপ-আলোচনা করে বাপ্পারাওয়ালকে চিতোরের রাজসিংহাসনে বসবার এক প্রস্তাব পাঠালেন। বাপ্পারাওয়াল দেখলেন যে, চিতোরের সিংহাসনে বসবার এই একটা সুযোগ। তিনি মোরী রাজার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও, সে-কথা সাময়িক ভাবে ভুলে গিয়ে এবং মোরী-রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন।

তখন সমস্ত সামান্তবর্গ-বাপ্পারাওয়ালকে আবার সেনাপতি পদে বরণ করে চিতোর আক্রমণ করলেন। এবং চিতোর বাপ্পারাওয়ালের হাতে এলো।

শোনা যায়, বাপ্পারাওয়ালেব অসংখ্য পুত্র-সন্তান জন্মেছিল। এবং উত্তরকালে তারা নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। জীবনের শেষের দিকে তিনি তাঁর বিজয়ী সেনাদের নিয়ে প্রতীচ্য দেশ অধিকার করতে গিয়েছিলেন। এবং রাজচ্যুত সকল মুসলমান রাজাব কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন। এইসব মুসলমান কন্যাদের গর্ভেও বাপ্পারাওয়ালের ঔরসে অসংখ্য সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করেছিল। বাপ্পারাওয়াল এই দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে আর চিতোরে ফিরে আসেননি। শোনা যায়, তিনি তুরস্ক প্রদেশ জয় করে সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

বাপ্পারাওয়াল ইস্পাহান, গান্ধার, কাশ্মীর, ইরান, ইরাক ও তুরান ইত্যাদি সকল রাজ্য জয় করে ; সেই সব রাজ্যের রাজাদের কন্যাগণকে বিবাহ করেছিলেন। সেই সব স্ত্রীর গর্ভে তাঁর মোট ১৩০টি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। উত্তরকালে এই সব পুত্রেরা তাদের মায়ের নামে এক একটি জাতি প্রতিষ্ঠা করে। এদের বলা হয় 'নশেরা পাঠান'। আবার অন্য দিকে বাপ্পারাওয়ালের হিন্দু স্ত্রীদের গর্ভে মোট পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করে ২০০। তারা উত্তরকালে "অগ্নি-উপাসী সূর্য বংশী" নামে পরিচিত হয়।

বাপ্পারাওয়াল মৃত্যুর আগে মেরুপর্বতের পাদমূলে সমাধিস্থ হন এবং মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত প্রজাদের মধ্যে ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে মৃতদেহ নিয়ে প্রবল ঝগড়া সৃষ্টি হয়। মুসলমান প্রজারা ও সন্তানেরা বাপ্পারাওয়ালের মৃতদেহকে কবর দিতে চায় এবং হিন্দু প্রজারা এবং সন্তানেয়া চায় পুড়িয়ে দিতে। যখন এই ঘটনা একটা আন্দোলনের রূপ নিল, তখন একজন হিন্দু প্রজা বাপ্পারাওয়ালের মৃত দেহের বস্ত্র সরিয়ে দেখলো যে, সেখানে আর কোন মৃতদেহ নেই। সেখানে অসংখ্য পদ্ম ফুল পড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে সকলেই অবাক। তখন তাদের বিবাদ মিটে গেল। তারা তখন সেই সব পদ্মের বীজ নিয়ে সামনের হ্রদে ফেলে দিল। পরে এই সব বীজ থেকে সেই হ্রদে অসংখ্য পদ্ম ফুলের গাছ উৎপন্ন হয়েছিল।

ভোজরাজ নিজে চিতোর গড়ের ইতিহাসের যে পুরোনো পুঁথি মীরাবাঈ-এর হাতে তুলে দিয়েছিল, মীরাবাঈ সে-পুঁথি একবার নয় বার বার পাঠ করেছে। এবং বাপ্পারাওয়ালের ইতিহাস পড়ে ও তাঁর শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছে। বাপ্পারাওয়ালের আমল থেকে চিতোর গড়ের যে খ্যাতি শুরু তা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলে এসেছে বীর হাম্বীর, চুণ্ডা, রাণাকুম্ভ ও মহারাণা সংগ্রাম সিংহ পর্যন্ত। এবং তারপর মহারাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্রদের আমল থেকে চিতোর গড়ের পতনের শুরু যা আজও অব্যাহত। মীরাবাঈ এখনও জানে না, এ পতনের শেষ কোথায়। আবার কোনোদিনও চিতোর গড় তার পূর্বখ্যাতি ফিরে পাবে কিনা। বাপ্পারাওয়াল থেকে শুরু করে মহারাণা সংগ্রাম সিংহ পর্যন্ত যে অব্যাহত খ্যাতি চিতোর গড় পেয়ে এসেছে, তা আবার পাবে কিনা। আবার রাজতিলকে ভূষিত হবে কিনা।

ভোজরাজের দেওয়া সেই পুরোনো পুঁথিটা আজও তার কাছে আছে। ভোজ-

রাজের উপহার হিসাবে সে আজও সযত্নে সেই পুঁথি সংরক্ষণ করে চলেছে। অবকাসে পড়ে আর শ্রদ্ধায় মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখে।

পুরোনো পুঁথির ঘটনাগুলিকে স্মরণ করতে গিয়ে, মীরাবাঈ-এর আজ আবার নতুন করে ভোজরাজকে মনে পড়লো। মীরাবাঈ বিশ্বাস করে যে, ভোজরাজ বেঁচে থাকলে চিতোর গড়ের এ পতন ঘটতো না। চিতোর গড়ের ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হত।

পুরোনো পুঁথির ভাবনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মীরাবাঈ আজ আর একবার ভোজরাজকে মনে মনে প্রণাম জানালো।

॥ আঠাশ ॥

ক্লান্ত মন আর শরীর নিয়ে আসরে এসে দাঁড়ালো মীরাবাঈ। আজ কয়েক মাস হলো একটা ক্লান্তি, একটা ছায়াঘন তমিস্রা মীরবাঈ-এর মন ও শরীরকে ঘিরে আছে। কিশোরীমনের অস্পষ্ট ভালোবাসা প্রতিভাত হয়েছিল যৌবনে যোগিনী রূপে। সে ভালোবাসা ঘিরেছিল গিরিধারীলাল আর ভোজরাজকে কেন্দ্র করে। তারপর সূর্য মধ্যাহ্ন গগন ছেড়ে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। যৌবনের যোগিনী রূপ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এসেছে। রূপান্তরিত হয়েছে প্রোঢ়ত্বের কৃষ্ণ-প্রেমে। তখন ভোজরাজ গত। প্রোঢ়ত্বের ক্লান্তিতে তখনই সাধনায় মাঝে মাঝে এসেছে নৈরাশ্য। জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে। চলতি নৌকার ডানে-বাঁয়ে মেরেছে ঢেউ। মাঝে মাঝে ঝড়-তুফানে আকাশ ছেয়ে গেছে। তখনই মীরাবাঈ ভেবেছে এই বুঝি তার সাধনার পতন ঘটলো। সে কৃষ্ণপ্রেম থেকে বিচ্যুত হলো। দীর্ঘ নিরলস সাধনার সমাধি ঘটলো। আর তখনই অতীত তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। বলেছে : আমি আছি। আমার ঘেরাটোপে তোমার অতীত-যৌবনের অনাঘ্রাত ফুলের সুবাস আজও আছে। ভোজরাজ আর তোমার দ্বৈত-জীবনের মুকুলিত মালিকা আজও শুকিয়ে যায়নি।

মীরাবাঈ-এর প্রোঢ়ত্বের ক্লান্তি যখনই অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, তখনই তার চিতোরকে মনে পড়েছে। সেই কারণেই আজকাল মীরাবাঈ-এর মন চিতোর গড়ের বাপ্পারাওয়াল থেকে শুরু করে মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ও সব শেষে ভোজরাজ কে স্পর্শ করে।

আজকাল মীরাবাঈ সাধন ও সংগীত নিয়ে বড় একটা মনোনিবেশ করে না। সনাতনকে নিয়ে মন্দির দর্শনে যায় আর ঘরে বসে অতীতের পুণ্য স্মৃতির মালা গাঁথে।

আজকেও সেই কাজে ব্যস্ত ছিল মীরাবাঈ। সনাতন 'বৃন্দাবন সংস্থার' ডাক নিয়ে এলো। বললো : ওরা আপনাকে চাইছে। আপনার সাধনার কথা শুনতে চায়। সংগীতের ব্যাখ্যা চায়। আগে যেমন করেছিলেন॥

মীরাবাঈ আপত্তি জানিয়েছিল। বলেছিল ঃ ওদের বলে দাও আমি যাব না। গিয়ে লাভ কি ? সাধনা আসরে বসে হয় না। সাধনা হয় নিভৃতে। আসরের মানুষরা যদি সাধনা করতে চায়, তাহলে প্রতি-প্রত্যুষে আমার মন্দিরে আসুক। সাধন-ভজন করুক। আমি তো বলেছি যে, আমার মন্দিরের দরজা সকলের জন্য খোলা। আসর তো অনেক হল। আসরে এসে কি হবে।

কিন্তু সনাতন সে-কথা শোনেনি। 'বৃন্দাবন সংস্থার' অনুরোধেব কথা শুনিয়ে সে মীবাবাঈ-কে রাজি করিয়ে আসরে নিয়ে এসেছে।

আসর মানেই একটা আসুরিক শক্তিব প্রকাশ। অনেকটা নদীব বুকে প্রবাহিত ঊর্মিমালার মত। অবিরাম বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নদীর নীচে যে অতলবাহিত মন্দস্রোত তা এখানে অনুপস্থিত। অতলবাহিত মন্দস্রোতেব সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নিভৃত সাধনায়। ঘরে বসে।

আসবের গোলমাল আব থামে না। সনাতন হাত ইশাবাই সকলকে বসতে বললো। আসবে জায়গা কম। জমায়েত বেশী। সেই কারণেই গোলমাল।

মীরাবাঈ তাকিযে তাকিয়ে সব দেখলো। তারপব এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে শুরু করলো ঃ

ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণ ধারনার যে রূপ, যে ভাবধারার কথা বলা হয়েছে, আমি সম্পূর্ণ ভাবে সে ভাবের এবং যে পথেব পথিক। আমি সে পথ অনুসরণ করেই আমার সাধনাকে পূর্ণ করতে চেয়েছি। ভাগবত পুরাণে আবার এই ভক্তি সাধনাকে নয় ভাগে ভাগ করা হযেছে। ভক্তি-সাধনার ন'টি রূপের ব্যাখ্যা সেখানে পাওয়া যায়। যেমন ঃ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সাখ্য ও আত্মনিবেদন। আমার সাধনা এই ন'টি রূপকেও ঘিরে আছে। আমি আমার সাধনার উত্তোরণের জন্যে এই ন'টি রূপেও কৃষ্ণকে ভজনা করেছি। আমার মনে হয়, আমি আগের আসরেও এই ন'টি রূপের কথা বলেছি। কিন্তু তার ব্যাখ্যা করবার অথবা সংগীত পরিবেশনের সুযোগ পায়নি। আজকে যদি সময় পাই, তাহলে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে ঐ ন'টি রূপের ব্যাখ্যা করবো।

. প্রথমে আমি 'শ্রবণ' সম্পর্কে একটি সংগীত পরিবেশন করবো। যার অর্থ কৃষ্ণের বাঁশী শুনে তার জন্যে উতলা হয়ে এগিয়ে যাওয়া।

আপনারা ধৈর্য্য ধরে এবং নিঃশব্দে আমার গান শুনুন।

"দরস বিনু দুখন লাগে নৈন।
জবসে তুম বিছরে মেরে প্রভুজী,
কবহুঁ ন পায়োঁ চৈন।
সবদ সুনত মোরী ছতিয়াঁ কাংপৈ
মীঠে লাগে তুম বৈন।
এক টকটকী পংথ নিহারাঁ
ভই ছমামী রৈন॥
বিরহ বিথা কাসুঁ কহুঁ সজনী

বহু গঙ্গী করবত ঐন ॥
মীরা কে প্রভু কবরে মিলোগে
দুখ মেটন সুখ দেন ॥"

দর্শন বিনা নয়ন যে ব্যথিত। হে প্রভু, যে-দিন থেকে তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, সেই দিন থেকে আর শান্তি নেই! শব্দ শুনে আমার বুক কেঁপে ওঠে। তোমার বাণী আমার মিষ্টি লাগে। এক দৃষ্টে পথের দিকে চেয়ে আছি। এক রাত যেন ছ'মাসের মত দীর্ঘ বলে মনে হয়। হে প্রিয়তম, আমি আমার এ বিরহ-ব্যাথা কাকে জানাবো? এ ব্যথা যে আমার বুকে করাতের মত আঘাত করছে। হে মীরার প্রভু, তুমি বলো কবে আমার দুঃখ মিটিয়ে সুখ দিতে আসবে।

এবারে আমি কীর্তনের ওপরে গান গাইবো। আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন কী ভাবে করেছি, তা জানাবো।

"মহাঁরে ঘরে আজ্যো প্রীতম প্যারা
তুমি বিনু সব জগ খারা।
তনমন ধন সব ভেঁট করুঁ
অন্তর ভজন করুঁ মৈঁ থারাঁ ॥
তুমু গুনবংত বড়ে গুণ সাগর
মৈ হুঁজী অওগণ হারা
মৈ নিগুনী গুনু একো নাঁহী
তুঝমেঁ জী গুনু সারা ॥
মীরা কহে প্রভু কবঁহি মিলোগে
বিন দরসন দুখিয়ারা ॥"

হে প্রিয়তম, আমার ঘরে এসো। তুমি বিনা এ জগৎ স্বাদহীন মনে হয়। আমার তনু-মন-ধন সবই নিবেদন করবো। তোমাকে ভজনা না করে আমি আনন্দ পাই না। তুমি গুনবান, গুণের সাগর। আমি অপগুণে আত্মহারা। আমি গুণহীন। কোন গুণ আমার নেই। কিন্তু তোমার সব গুণই আছে। হে মীরার প্রভু, তুমি কবে এসে আমার সংগে মিলিত হবে। তোমার দর্শন বিনা আমার চিত্ত বেদনায় ভরে ওঠে।

এবারে স্মরণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি কি ভাবে স্মরণ করেছি।

"সাজন ঘর আবো মীঠা বোলা
কবকী খড়ী পংথ নিহারুঁ
থাঁহুঁ আয়া হোসী ভলা ॥
আবো কিসংক সংক মত মানো
আয়াঁহী সুখ রহেলা ॥
তনমন বার করুঁ ন্যোছাবর।
দীজ্যো স্যাম মোহেলা ॥
আতুর বহুত বিলংব নহিঁ করণা

আয়াঁহী রংগ রহেলা ॥
তেরে কারণ সব রংগ ত্যাগা
কাজল তিলক তসোলা ॥
তুম দেখ্যাঁ বিন কলন পরতহৈ
কর ধর রহী কপোলা ॥
মীরা দাসী জনম জামকী
দিলকী ঘুংড়ী খোলা ॥”

হে মধুর ভাষী, তোমার প্রিয়ের ঘরে এসো। কতদিন আর পথ চেয়ে থাকবো। তুমি এলে আনন্দ হয়। তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে এসো। শঙ্কা মেনো না। তুমি এলেই সুখ। এ তনু-মন তোমাকে উৎসর্গ করবো। আমি আমাকে আমার মোহন শ্যামকে নিবেদন করবো। আমি আকুল হয়েছি। আর বিলম্ব কোরো না। এলে রঙ্গ পূর্ণ হবে। তোমার জন্যেই আমি আমার সব রঙ্গ ত্যাগ করেছি। কাজল, তিলক, তম্বুল সব। তোমাকে না দেখলে আমাব সময় কাটে না। কপালে হাত দিয়ে বসে থাকি। মীরা তোমার জন্ম-জন্মান্তরের দাসী। আজ সে তার সমস্ত হৃদয় উজার করে দিয়েছে।

এবারে পদ সেবা। কৃষ্ণের চরণ পদ্মে নিজের সেবা। আমি কি ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পদ্মে নিজেকে অর্পণ করেছি।

“তুমু সুনো দয়াল মুঁহারী অরজী
ভোঁসাগর মেঁ বহি জাত হুঁ
কাঢ়ো তো থাঁরী মরজী ॥
য়ো সংসার সগো নহিঁ কোঈ
সাঁচা সগা রঘুবরজী ॥
মাত-পিতা অরুঁ কুটুম্ব কবীলো
সব মতবল কো গরজী
মীরা কী প্রভু অরজী শুনলো
চরণ লগাও থাঁরী মরজী ॥”

হে দয়াল, আমার আর্জি শোনো। এ ভব-সাগরে আমি ভেসে চলেছি। তুমি যদি বাঁচাও সে তোমারই মর্জি। এ সংসারে আমার কেউ নেই। সত্য শুধু রঘুবরজী। মা-বাবা, আত্মীয়, কুটুম্ব সকলেই নিজের গরজে আছে। হে মীরার প্রভু, আমার আর্জি শোনো। যদি তোমার মর্জি হয়, তবে দয়া করে তোমার চরণে স্থান দাও।

আপনারা বসুন। অধৈর্য্য হবেন না। গোলমাল করবেন না।

এবাবে আমি ‘অর্চনা’ ও ‘বন্দনা’ সম্পর্কে সংগীত পরিবেশন করবো। আমি কি ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্চনা ও বন্দনা করেছি তা’ আপনাদের জানাবো।

“পিরা ইত্নী বিনতী সুন মোরী
কোঈ কহিয়োরে জায়

অওরণ স্যুঁরস বতিয়া করত হো
হমসে রহে চিত চোরী
তুমি বিন মেরে অওরণ কোঈ
মৈঁ সরণাগত তোরী ॥
আবন কহ্ গয়ে অজহুঁন থায়ে
দিবস রহে অব থোরী ॥
মীরা কে প্রভু কবরে মিলোগে
অরজ করাঁ কর জোরী ॥"

হে সখি, তোমরা গিয়ে বলে এসো, প্রিয় যেন আমার এই মিনতিটুকু শোনে। অন্যের সঙ্গে রসালাপে মেতে আছে। আমার চিত্ত শুধু হরণ করে চলে গিয়েছে। হে প্রভু, তুমি ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই। আমি তোমারই শরণাগত। আসবে বলে চলে গেছ। আর এলে না। দিন শেষ হয়ে আসছে। হে মীরার প্রভু, কব জোড় করে মিনতি জানাচ্ছি, কখন এসে মিলিত হবে বলো।

এর পরে আসছে 'দাস্য' ও 'সাখ্য' সম্পর্কে সংগীত পরিবেশন ও ব্যাখ্যা। আমার যতদূর মনে পড়ছে আমি গত আসরে এ প্রসঙ্গে বিসদ আলোচনা করেছি ও গান শুনিয়েছি। স্থতরাং আজ ও প্রসঙ্গের আলোচনা ও গান থেকে আমি বিরত থাকবো।

এবারে শেষ পর্য্যায়ের গান 'আত্মনিবেদন'। আমি কি ভাবে আমার নিজের মনের অবস্থা ও অনুভূতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্যক্ত করেছি তা, আপনাদের জানাবো।

"পপইয়া প্যারে
কর কো বৈর চিতা র্য্যো
মৈঁ সূতী ছী অপনে ভবন সেঁ
পিয় পিয় করত পুকার্য্যো ॥
দাধ্যা উপর লূন লগায়ো
হিবড়ে করবত সার্য্যো ॥
উঠি বৈধী বৃচ্ছকী ডালী
বোল বোল কণ্ঠ সা র্য্যো।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর
হরি চরণাঁ চিত ধার্য্যো ॥"

হে প্রিয় পাপিয়া, তুমি কত দিনের শত্রুতা স্মরণ করে আজ এমন করছো। আমি আমার ভবনে শয়নে রত। তুমি কেন পিউ পিউ করে ডাকছো। তোমার এ গান আমার দগ্ধ মনে লবণ দেওয়ার মত মনে হচ্ছে। বৃক্ষের শাখায় বসে কণ্ঠ ছেড়ে একি গান তোমার? হে মীরার প্রভু প্রিয়তম গিরিধর, আমি হরির চরণে আমার মন অর্পণ করে আছি।

আমি আগেই বলেছি যে আমার সাধনা ভাগবত পুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে রূপের বর্ণনা আছে তার সাধনা। ব্রজরাজ কৃষ্ণের সাধনা। গোপীগণ পরিবৃত

কৃষ্ণের সাধনা। আমি গোপীগণের একজন হয়েই কৃষ্ণকে পেতে চেয়েছি। আমার সাধনার মধ্যে ভাগবত পুরাণে ভক্তির যে ন'টি রূপের বর্ণনা আছে তার বিকাশ ছাড়াও তার পদাবলীতে আশা, আকাংখা, হতাসা, অনুরাগ ও আনন্দ ইত্যাদির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, আমার সাধনার সংগে এই সমস্ত অনুভব ও যুক্ত। আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নানা ভাবে পেতে চেয়েছি। ঋতুর ওপরেও আমার অনেক গান আছে। বিশেষতঃ বর্ষা ঋতুর ওপরে। বর্ষাকাল নির্জন একাকীত্বের কাল। মিলন পিয়াসী মন স্বাভাবিক ভাবেই প্রিয়ের আগমন ইচ্ছা করে। প্রিয়ের আগমন প্রতিক্ষা করে এবং মন রাগে-অনুরাগে ভরে ওঠে। আমি এবার ঋতুর ওপরে লেখা আমার একটি গান শোনাবো।

"পিয়া মোহিঁ আরত তেরী হো
আরত তেরে নামকী, মোহিঁ সাঁঝ সবেরী হো।
য়া তনকে দিবলা করুঁ, মনসা করুঁ বাতী হো॥
তেল জলাউঁ প্রেমকো, বালুঁ দিন রাতী হো॥
পটিয়া পাড়ু জ্ঞানকী, মতি মাঁগ সবারুঁ হো।
পিয়া তেরে কারণ ধন, জোবণ বারুঁ হো॥
সেজড়িয়া বহু রংগিয়া, বহুফুল বিছায়া হো।
রেন গঈ তারা গিনত, প্রভু অজহুন আয়াহো॥
আয়া সাবন ভাদবাঁ, বরসা রিতু আঈ হো।
মেহা ঘটা ঘন ঘেরি নৈনন ঝারি লাঈ হো॥
মাতা-পিতা তুম কো দিয়ো তুমহী ভুল গয়ো হো।
তুম তজি অওর ভতার কো মন মে নহিঁ আনোঁ হো॥
তুস হো পুরে সাইয়াঁ, পুরা সুখ দীজো হো।
মীরা ব্যাকুল বিরহণী, অপনী কর লীজে হো॥"

আমার জীবনে হে প্রিয়, তোমার আরতি হোক। সকাল-সন্ধ্যা তোমার নামের আরতি আমার অন্তরে জ্বলিত হোক। এ তনুকে দীপ এবং মনকে বাতি করবো। প্রেমের তেলে জ্বালাবো। সে দীপ দিনে রাতে জ্বলবে। জ্ঞানের মাদুর বিছিয়ে সকলের কাছে সুমতি ভিক্ষা করবো। হে প্রিয়, তোমার জন্যে ধন, যৌবন উৎসর্গ করবো। এ শয্যা বহুরঙের বহুফুলে বিছিয়ে রাখবো। রাতের তারা গুনতে গুনতে প্রভাত এলো। কিন্তু প্রভু এলেন না। শ্রাবণ-ভাদ্র এসেছে। বর্ষা ঋতু এসেছে। মেঘের ঘনঘটা ঘিরে নয়নে জল নামছে। আমার মাতা-পিতা আমাকে তোমাকেই দিয়েছেন। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে গেছ। আমার মন তুমি ছাড়া অন্য কোন স্বামীকে স্মরণ করে না। হে প্রভু, তুমিই আমার পূর্ণ স্বামী। পূর্ণ সুখ তুমিই আমাকে দিতে পার। ব্যাকুল-বিরহিণী মীরাকে এবারে তুমি আপন করে নাও।

হোলী উৎসব কৃষ্ণলীলার উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আমার মনে যে বেদনা নির্ঝরিত হয়েছে তার একটি গান পরিবেসন করেই আজকের আসর আমি সমাপ্তি ঘোষণা করবো। রাত বাড়ছে। মানুষের ধৈর্য্য কমছে। সুতরাং আজ আর

নয়। আজকের আসরে আমি যত গান পরিবেশন করলাম, কোন আসরেই এত গান পরিবেশন করিনি। এবং তার বিসদ ব্যাখ্যাও আপনাদের সামনে তুলে ধরিনি। আমার গান সম্পর্কে আপনাদের যে কৌতুহল ছিল, যে জিজ্ঞাসা ছিল, আসা করি আমি তা মেটাতে পেরেছি। আজকের আসরের শেষ গান 'হোলী উৎসবের' গান। কৃষ্ণলীলার শ্রেষ্ঠ উৎসবের গান। আমি আশা করি আপনারা ধৈর্য্য ধরে শুনবেন।

"হোলী পিয়া বিন মোহি'ন ভাবে
ঘর আঁগন ন সুহাবে॥
দীপক জোর কহা করু হে লী
পিয় পরদেশ রহাবে।
সুনী সেজ জহর জ্যুঁ লাগে
মুসক মুসক জিয়জাবে।
নীদ নহি' নৈন আবে॥
কব কী ঠাঢ়ী মৈ' মগ জোউ'
নিসদিন বিরহ সতাবে
কহা কহু কহতন আবে
ছিবড়ো অতি অকুলাবে
পিয়া কব দরস দিখাবে
ঐসা হৈ কোই পরম সনেহী
তুরত স'দেসা লাবে
রা বিরিয়াঁ কব হোসী মোকু'
হ'স কর নিকট বুলাবে
মীরা বিন হোলী গাবে॥"

প্রিয়া বিনা আমার হোলী ভালো লাগে না। তিনি না এলে এ গৃহ অঙ্গন শোভা পায় না। দীপক জেবলে কি হবে? আমার প্রিয় পরদেশে। শূন্য এ শয্যা বিষের মতো মনে হয়। শুষে শুষে প্রাণনা। কবছে। নয়নে নিদ্রা আসে না। কতদিন আমি দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে আছি। নিশিদিন বিরহ বেদনা দিচ্ছে। মুখে কোন কথা আসে না। হৃদয় ব্যাকুল হয়েছে। প্রিয় কবে দর্শন দেবে। এমনকি কেহ স্নেহময় আছে, যে আমার প্রিয়ের সংবাদ এনে দেবে? সেদিন কবে হবে যে প্রিয়তম এসে আমার কাছে হেসে দাঁড়াবে এবং আমার সঙ্গে হোলী গান গাবে।

আমার সংগীত পরিবেশন আজ এখানেই শেষ হলো। আমি আমার গানের মাধ্যমে ভক্তি-ভাবের কিছুটা ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করলাম। আমি যে বিভিন্ন ভাবে কৃষ্ণ-বন্দনা করেছি, এই সব গানে তার একটা ইতিবৃত্ত হয়তো আপনারা খুঁজে পাবেন। আমার গানে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশই মূল কথা। গানের পদের চেয়ে আমি গানকেই প্রাধান্য দিয়েছি বেশী। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমার রচিত পদে অনেক ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিশেষভাবে ব্রজভাষা, গুজরাটি ও মাড়োয়ারী। তবে আমি আগেই বলেছি যে, আমার কৃষ্ণ-ভজনার মূল উদ্দেশ্য

ও উৎস হচ্ছে সংগীত। গানের স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তিতেই আমি আমার মনের কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করবার চেষ্টা করেছি।

অনেক রাত হলো। আজ এখানেই শেষ। আগামীদিনে যদি আবার সময় এবং সুযোগ আসে তবে আমি আমার সাধনার উত্তোরণ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আপনাদের সামনে পেশ করবো। আগামী বেশ কিছুদিন আপনারা আর আমার দেখা পাবেন না। আমি আমাব সাধনার গভীরে অবগাহনেব জন্যে দ্বাবকায় গমন কবরো। সনাতন রইলো। আপনাবা প্রযোজনে সনাতনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আজ শেষ।

আজ সভা ভাংতে অনেক রাত হয়ে গেল। এমন রাত আগে কখনোই হয়নি। এমন গান ও তার ব্যাখ্যা মীরাবাঈ আগে কোনো সভাতে করেনি। মীরাবাঈ আজ স্বভাবতই ক্লান্ত। সে আব অপেক্ষা না কবে সনাতনকে নিয়ে আশ্রমে রওনা হয়ে গেল।

॥ উনত্রিশ ॥

আজকাল রাতে ঘুম আসে না। প্রায় রাতই জেগে কাটাতে হয়। ক্লান্তিতে শরীর, মন সর্বক্ষণই ঘিরে থাকে। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে ইদানীং মীরাবাঈ নিজেকে নিস্ব, নিঃসঙ্গ মনে করে। সাধনায় নৈবাশ্য আসে। কি পেলাম আর কি পেলাম না, তার হিসাব কষতে আজকাল মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কিশোরকাল থেকে শুরু করে যৌবন অতিক্রান্তে বৃন্দাবন বাসিনী মীরাবাঈ-এর মন আর চলতে চায় না। মন বার বারই বলে: অনেক হলো। এবারে সব শেষ করে নির্জনে নিভৃতে নিমগ্ন হও। যাত্রা-পথ শেষ হয়ে আসছে। চরৈবেতির দিনের চড়াই-উৎরাই আর নয়।

নির্জন রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে সামনের খোলা জানালায় এসে দাঁড়ালো মীরাবাঈ। আকাশে অনেক তারার মেলা। ফুটি ফুটি জ্যোছনায় সারা অঙ্গনে আলো-আঁধারের খেলা। নদীতে আজ কোনো নৌকা নেই। ঘাটে বাঁধা। জ্যোছনার হিমানী মেখে নদীর জল তরতরিয়ে বযে যাচ্ছে মহাকালের সাক্ষী হয়ে। এরা সবাই থাকবে। হয়তো মীরাবাঈ-এর গানও কিছুদিন বেঁচে থাকবে। কিন্তু মীরাবাঈ মনে করে তার দিন ফুরিয়ে আসছে।

আজ আর সামনে আত্মীয়-পরিজন বলে কেউ নেই। সনাতন তার পুত্রবৎ এবং একান্ত শিষ্যও বটে। বর্তমানে মীরাবাঈ-এর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সাক্ষী ও সহানুভূতি হচ্ছে সনাতন। সনাতনকেই সব কিছু জানাতে হয়।

নিদ্রাহীন রাতে যদি মীরাবাঈ নির্জনে জানালায় এসে দাঁড়ায় তবে ইদানীং দু'জনকে মনে পড়ে। গিরিধারীলাল আর স্বামী ভোজরাজ। গিরিধারীলালের সেবা করবার সুযোগ মীরাবাঈ দীর্ঘদিন পেলো। কিন্তু ভোজরাজকে সেবা করবার সুযোগ মীরাবাঈ বেশী দিন পায় নি। মাত্র কয়েকটি বছর। তার মধ্যেও ভোজরাজের দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব এসেছে। ভোজরাজের পিতা সংগ্রাম সিংহের চার স্ত্রী।

অতএব ভোজরাজের দ্বিতীয় বিবাহে অসুবিধা কি? দ্বিতীয় বিবাহের যুক্তি হচ্ছে মীরাবাঈ সন্তানহীনা। আজকে মীরাবাঈ নিঃসঙ্গ জীবনে সন্তানের কথা যে একেবারে ভাবে না, তা' নয়। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে একজন অবলম্বনের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। এবং নারী জীবনে সে অবলম্বন পুত্রই শ্রেয়। কিন্তু সে-দিন যৌবনের কর্মমুখর জীবনে, সাধনায় স্বপ্রবৃত্ত অনুভবে মীরাবাঈ সে-দিন এ সব চিন্তা মনে আমল দেয়নি। কেউ এ প্রসঙ্গ তুললেও নীরব থেকেছে। অথবা প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে সে প্রশ্নের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে।

কিন্তু সে-দিন রাণী কুঁয়রবাঈ ভোজরাজের জীবনে সমাপ্তি ঘোষণা করতে চাননি। তিনি পরিষ্কার প্রস্তাব নিয়ে তার স্বামী মহারাণা সংগ্রাম সিংহের কাছে হাজির হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তব্য ছিল, যেহেতু মীরাবাঈ-এর কোন পুত্র সন্তান হচ্ছে না, সেইহেতু ভোজরাজের আবার দ্বিতীয় বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন। এ প্রয়োজন বংশ রক্ষার খাতিরে। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ মীরাবাঈ কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মীরাবাঈ-এর সাধনার প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল। এ ছাড়াও মীরাবাঈ-এর রাজনীতির জ্ঞানকেও তিনি সমীহ করতেন। সেই কারণে তিনি তাঁর স্ত্রী রাণী কুঁয়রবাঈ এর প্রস্তাব সরাসরি মেনে না নিয়ে, ভোজরাজের মত নিতে বলেছিলেন। রাণী কুঁয়রবাঈ ভোজরাজের কাছে যাবার আগে, মীরাবাঈ-কে ভোজরাজের দ্বিতীয় বিবাহের ভয় দেখিয়ে ছিলেন। আজ এই নিদ্‌হারা নির্জন রাতে জানালায় দাঁড়িয়ে মীরাবাঈ সে কথার, যে জবাব দিয়েছিল, তা স্মরণ করতে কোন অসুবিধা হয় না। সে-দিন মীরাবাঈ রাণী কুঁয়রবাঈ এর মুখ থেকে যা শ্রবণ করেছিল, তা আজও তার স্মরণে আছে এবং মীরাবাঈ আসা করে যে, তার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তা স্মরণে থাকবে। সে-দিন মীরাবাঈ-এর পরিষ্কার জবাব ছিলঃ মেরে তো গিরধর গোপাল, দুসরো না কোঈ।

মীরাবাঈ-এর কাছে কোন প্রকার সুবিধা না হওয়ার তিনি উপায়হীন হয়ে ভোজরাজের কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করেছিলেন। সে-দিন ভোজরাজও আপত্তি জানিয়েছিল। তার মত ছিল, মীরাবাঈ-এর পাশে দাঁড়াতে পারে এমন মেয়ে দুর্লভ।

এ-কথা শুনে রাণী কুঁয়রবাঈ খুবই দুঃখিত হয়ে বলেছিলেনঃ যুবরাজকে সাধারণ ভাবে দু'টি বিবাহ করা একান্ত প্রয়োজন। একটি প্রয়োজন রাজমহলের জন্যে। অপরটি প্রয়োজন রাজনীতির জন্যে। প্রতিবেশী শক্তিশালী রাজাকে আত্মীয়তা সূত্রে বেঁধে রাখা।

কিন্তু ভোজরাজ এ সব যুক্তি অগ্রাহ্য করেছিল। তার কাছে এ সব কথা যুক্তিহীন বলে মনে হয়েছিল। ভোজরাজের সম্মতি না পেয়ে রানী কুঁয়রবাঈ ক্ষুব্ধ চিত্তে নিজের মহলে ফিরে গিয়েছিলেন।

মীরাবাঈ জানে এবং এখনও বিশ্বাস করে যে, তাকে ঘিরে তখন রাজমহলের মহিষীদের মধ্যে নানা মতৈক্য সত্বেও তার এবং ভোজরাজের দাম্পত্য জীবন কিন্তু একটুও অসুখের ছিল না। দাম্পত্য জীবনে তারা সুখী ছিল। তার কারণ ভোজরাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে মীরাবাঈ-এর পরামর্শ নিতে কুণ্ঠিত হতো না।

এ সব জীবন চিত্র। ভাবতে গেলে নানা ভাবনাই মনে আসে। কোন একদিন ভোজরাজ মীরাবাঈ-কে বলেছিল : আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি হবো মহারাণা। আর তুমি হবে মহারাণী। আমাদের সামনে যুদ্ধ আসছে। হয়তো আবার লড়তে যেতে হবে। শুনতে পাচ্ছি, সুলতান ইব্রাহীম লোদী দিল্লী থেকে ফৌজ নিয়ে রওনা হবে। আমাদের ফৌজও তৈরী হচ্ছে। পরিচলনা করবেন স্বয়ং মহারাণা। তোমার পিতা রত্নসিংহ এবং পিতৃব্য বীরমদেবজীও আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

মীরাবাঈ সে-দিন বলেছিল : যুবরাজকেও কি যেতে হবে ?

যুবরাজ জবাব দিয়েছিল : যেতে হবে। যদি এই যুদ্ধ জিত্‌তে পারি এবং শেষে তামাম হিন্দুস্থান যদি আমাদের হাতে আসে, তবে তুমি হবে তামাম হিন্দুস্থানের মহারাণী এবং আমি স্বীকার করি যে, সে যোগ্যতা তোমার আছে।

ভোজরাজের সে-দিনের কথাটা মীরাবাঈ-এর ভালই লেগেছিল। কিন্তু তবুও সে বলেছিল : তামাম হিন্দুস্থান চিতোরের রাণাদের দখলে আসা প্রায় অসম্ভব।

ভোজরাজ সে-কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বলেছিল : কেন ?

মীরাবাঈ-এর জবাব ছিল পরিস্কার। সে বলেছিল : মারওয়াড়ের রাঠোরদের সঙ্গে চিতোরের রাণাদের গোলমাল। রাণাজীকে আগে সেটা মেটাতে হবে। রাজপুত রাজাদের প্রধান বলে রাণাজীকে সকলকে স্বীকার করে নিতে হবে। কার্য্যক্ষেত্রে সেটা প্রায় অসম্ভব। যোধপুরের রাজা, রাও গঙ্গা রাণাজীর প্রতিদ্বন্দী। এ বিরোধ মিটবে বলে মনে হয় না। রাণাজী বীকানীরের সঙ্গে মারওয়াড়ের একটা মনোমালিন্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন নিতান্তই রাজনীতির প্রয়োজনে। সেটা অন্য রাজারা ভাল চোখে দেখেননি। পূর্ব সীমান্ত হাতে রাখবার জন্যে রাণাজী স্বয়ং বিয়ে করেছেন বুঁদী-কন্যা কারমেতবাঈ-কে। আর মেড়তীয়া রাঠোরদের দলে আনবার জন্যে পুত্রবধূ করে এনেছেন আমাকে। সেই কারণে আগামী যুদ্ধে আমার বাবা ও জ্যেষ্ঠতাত যুদ্ধে যাচ্ছেন। আসলে দাম্পত্য জীবনেও রাজনীতি। আমবা রাজনীতি ছাড়া কিছু বুঝি না। বুঝতে চাই না।

এ কথার জবাবে সেদিন ভেজরাজ যা বলেছিল তা মনে পড়লে আজও মনে রং ছড়ায়। সেদিন ভোজরাজ বলেছিল : আমি—আমি তোমাকে ভালবাসি মীরা।

মীরাবাঈ হেসে জবাব দিয়েছিল : আমিও বাসি। তবে—

মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ,
জাকে সির মোর মুকুট, মেরে পতি সোঈ ॥

এ কথায় ভোজরাজ-কে বোঝানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ভোজরাজের মা-কে বোঝানো সম্ভব ছিল না। তিনি সহজে হার স্বীকার করবার পাত্রী ছিলেন না। তিনি একদিন মীরা ও ভোজরাজের মহলে আড়ি পাতলেন, তাদের কথা শোনবার জন্যে। তিনি শুনতে পেলেন তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে, সামনে যুদ্ধের কথা, সুলতান ইব্রাহীম লোদীর এগিয়ে আসার কথা। বাবর, জৌনপুর, গুজরাটের রাজনীতির কথা। তিনি হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। পরে আর একদিন তিনি শুনলেন ভোজরাজ বলছে : চারিদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এবার আমাদের যুদ্ধে যেতে হবে মীরা।

মীরাবাঈ সে-দিন যে জবাব দিয়েছিল, সে-জবাব সে বহুবার বহুজনকে দিয়েছে। সে বলেছিল ঃ অস্ত্র দিয়ে দেশ জয় করা যায় কিন্তু দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। দেশকে এক সূত্রে বাঁধা যায় না। তাকে বাঁধতে গেলে লাগে ভালবাসা। যেমন চৈতন্যদেবের ভালবাসা। বাংলাদেশে সুলতান হোসেন শাহর রাজত্ব। বর্তমানে তাঁর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা। ধন-দৌলত, ব্যবসা, বাণিজ্য সবই। কিন্তু তার মধ্যেই এক জীবনবোধ জাগিয়ে তুলেছেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য। তাঁর বক্তব্য ছিল, স্বৈরাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ এক হও। জোট বাঁধো। চৈতন্যদেবের কোন রাজশক্তি নেই। অথচ কাজী তাঁর কাছে পরাজিত।

মীরাবাঈ-এর কথা শুনে সে-দিন ভোজরাজ আনন্দে উৎসাহিত হয়ে বলেছিল ঃ আমিও তাই চাই মীরা! সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা আমিও ভেবেছি। আমিও ভেবেছি যে সাধারণ মানুষকে কাছে না পেলে রাজত্ব চালানো যায় না। মহারাণার ও তাই মত। তিনি এ-কাজটা আমাকে আর তোমাকে দিয়ে করাতে চান।

মীরাবাঈ জবাব দিয়েছিল ; টুকরো টুকরো দেশটাকে এক করতে হবে গুরুনানক সন্ত কবীর আর চৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করে। সাধারণ মানুষকে এক করে। সৈন্য-সামন্ত আর অস্ত্র দিয়ে নয়।

ভোজরাজ খুশি হয়ে বলেছিল ঃ আমি জানি। আমি জানি মীরা। আমাদের সামনে যুদ্ধ। আপাততঃ ইব্রাহীম লোদীর সঙ্গে। তারপর আবার তোমাকে নিয়ে আলোচনায় বসবো।

সে-আলোচনায় আর বসা হয়নি। আজকে নির্জন রাতে মীরাবাঈ পুরোনো দিনের স্মৃতি চারণ করতে করতে এইখানে থেমে গিয়ে দু'ফোটা চোখের জল ফেললো। ভোজরাজের কথা মনে হলেই চোখে জল আসে। তারপরেই নিজেকে সামলে নিতে হয়।

সে-দিন ভোজরাজের মা গোপনে তাদের আলোচনা শুনে সেই যে ফিরে গেলেন তারপর আর এ মুখো হননি।

চিতোরে তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি। ফৌজ তৈরী হচ্ছে। স্বয়ং মহারাণা সৈন্য পরিচালনা করবেন। সঙ্গে ভোজরাজ। সুলতান ইব্রাহীম লোদীর ফৌজ দিল্লী থেকে রওনা হয়েছে। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের পাশে থাকবেন মীরার পিতা রত্নসিংহ ও মীরার পিতৃব্য বীরমদেবজী।

সে-দিন চিতোরের বিরাট বাহিনী চিতোর দুর্গের পদনপোল থেকে শুরু করে পর পর দশটি পোল পার হয়ে গাম্ভরী নদীর ধার ধরে বেঁকে চলে গিয়েছিল।

রাজমহিষীরা নিজেদের প্রাসাদের গবাক্ষ পথে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখেছিলেন এবং এই সব বীরদের বিজয় গর্বে ফিরে আসবার কামনা করেছিলেন।

মীরাবাঈ সে-দিন দেখেছিল, পরিপূর্ণ যুদ্ধের পোষাকে ভোজরাজ পদন-পোল পার হয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর মীরাবাঈ নিজের মন্দিরে ফিরে এসে গিরিধারীলালের নিত্য-সেবার নিজের মনকে নিয়োজিত করবার চেষ্টা করেছিল।

তখন যুদ্ধের খবর রোজই আসতো। দু'একদিন পরেই খবর

এলো ভোজরাজ যুদ্ধে মারাত্মক ভাবে আহত। তাকে চিতোরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

চিতোরে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল ভোজরাজ-কে। মারাত্মক জখম।

সে-দিন সকলে বলেছিল, ভোজরাজ আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। চিতোরের ভাবী মহারাণা ভোজরাজের আর মহারাণা হবার সুযোগ আসাবে না। বর্তমান মহারাণার এখন থেকেই ভাবতে হবে যে, আগামী দিনে মহারাণা কে হবে। ভোজরাজের পরবর্তী ভাই রতন সিংহ না আর কেউ।

রতন সিংহের মা ধনবতী বাঈ অনেকদিন ধরেই নিজের ছেলের জন্যে মনে মনে একটু গোপন আশা পোষণ করছিলেন। সেবারে তিনি আশান্বিত হয়েছিলেন। ভোজরাজ মারা গেলে তাঁর পুত্র রতন সিংহ-ই মহারাণা পদের দাবীদার। ধনবতী বাঈ নিজের পুত্র রতনসিংহ-কে রাণা করবার জন্যে সে-দিন দল গড়তে শুরু করেছিলেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন তাঁর ভাই মালদেবকে। যিনি মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ভোজরাজের জন্যে এবং চিতোবের পারিবারিক গৃহ-বিবাদের জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিলেন। মাঝে মাঝেই তিনি তখন উদ্বিগ্ন প্রকাশ করতেন। কিন্তু মুখে তেমন কিছু বলতেন না।

রতন সিংহ ভবিষ্যতে রাণা হবে, সে-দিন এতে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। রাও সুরজমল, করমচাঁদ, অম্বরের পৃথিরাজ, এরা কেউ সে-দিন রতন সিংহ-কে চায়নি। তাদের ধারণা ছিল, রতন সিংহ মারওয়াড়ের ভাগ্নে। রতন সিংহ মহারাণা হলে ধনবতীবাঈ এর ক্ষমতা বাড়বে। এটা কাবো পছন্দ ছিল না।

কারমেতনবাঈ মহারাণার সংগ্রাম সিংহের তৃতীয়া স্ত্রী। তাঁর পুত্র বিক্রমাজিৎ সিংহ। কিন্তু কারমেতনবাঈ সে-দিন চুপচাপ ছিলেন। কারণ সে-দিন তাঁর পুত্র বিক্রমাজিৎ-এব মহারাণা হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্ত তবুও সকলে সে-দিন বিক্রমাজিৎ সিংহ-কেই যুবরাজ হিসাবে চেয়েছিল।

কারমেতনবাঈ এর দলে সে-দিন ছিলেন, তার ভাই সুরজমল, মীরাবাঈ-এর পিতা রত্ন সিংহ এরং মীরাবাঈ-এর পিতৃব্য বীরমদেবজী। কিন্তু তবুও সে-দিন কারমেতনবাঈ মনে কোন আশা পোষণ করেননি।

গৃহ-বিবাদের জন্যে সে-দিন এই দুই রাণীর মুখ দেখাদেখি বন্ধছিল।

এই গোলমালের মধ্যেই ভোজরাজের মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসছিল। ভোজরাজ সে-দিন শেষ শয্যায় শুয়ে মীরাবাঈ-কে বলেছিল; আমাদের স্বপ্ন সফল হলো না মীরাবাঈ। তামাম হিন্দুস্থানকে ভালাবেসে এক করবার আর সময় পাওয়া গেল না। তুমি জানবে মীরা, আমার মৃত্যু নেই। আমি লক্ষ মানুষের মনে, জনতার মনে ছড়িয়ে থেকে তোমার গান শুনবো। তুমি গান গাইবে।

মীরাবাঈ-এর গান খুবই ভালবাসতো ভোজরাজ।

ভোজরাজকে সে-দিন আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

মীরাবাঈ আর শুয়ে থাকতে না পেরে সামনের জানালায় এসে দাঁড়ালো।

শেষ-রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ফুটি ফুটি ভোর। একটু পরেই সূর্য্য উঠবে। প্রতিদিনের কাজ শুরু হবে। দিন থেকে রাতে কালের চক্র ঘুরতে থাকবে। মীরাবাঈ জীবনের এতো পথ ঘুরে ঘুরেই আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিন নিজের গ্রাম ছিল সত্য। তারপর চিতোর। যৌবনের কর্ম মুখর দিন। জীবনের সঙ্গে যোগ যুক্ত করবার সাধনা। পরে শ্রীবৃন্দাবন। সাধনার উত্তোরণ। পূর্ণবৃত্তে এসে পরিপূর্ণতা লাভ। একদিন এ সবই সত্য ছিল। আজ স্বপ্ন ও স্মৃতিতে এসে স্থান নিচ্ছে। সবই ছবি হয়ে যাচ্ছে। অতীত স্মৃতি। শুধু তারমধ্যে একজন মানুষই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বিরাজমান। সে ভোজরাজ। আর অন্যজন গিরিধারীলাল। ভোজরাজ আর গিরিধারীলাল। অনন্ত আকাশে দুটি বিভাসিত তারকা। মীরার আকাশে ভাসমান। মীরাবাঈ জীবনে এই দুইজনকে ভুলে যায়নি। কোনদিনও ভুলে যেতে পারবে না। ভালবাসার সিক্ত রসে গাঁথা দুটি ফুলের একটি মালা। মীরাবাঈ সারা জীবন ধরে এই দুই জনকেই ভালবেসে এসেছে। গিরিধারীলালের ঈশ্বরীয় প্রেম এই মর্তভূমিতে ভোজরাজে রূপান্তরিত। মীরাবাঈ মনে করে ভোজরাজের ভালবাসা, সে সাধনার মাধ্যমে ভাগবত্ত প্রেমে আ-জীবন উত্তীর্ণ করে দেবার চেষ্টা করে এসেছে। আবার অন্য দিকে গিরিধারীলালের প্রেম এই ভুমিতে নামিয়ে এনে ভোজরাজের মধ্যে প্রকাশিত করবার চেষ্টা করেছে। আজ ভোজরাজ নেই। গিরিধারীলালের সাধনাও শেষ হয়ে আসছে। বার্ধক্যে এই বারাণসীতে বসে সারা জীবনের ভালবাসার হিসাব নিতে গিয়ে বুঝলো যে, ভালবাসা শুধু বেদনাই বহন করে। ভালবাসার পথ কণ্টকাকীর্ণ। পায়ে কাঁটা বেঁধা, রক্ত ঝরা পথ বেয়ে বেয়ে তবেই মনের মানুষের দর্শন। মীরাবাঈ-এর আগে যদি এ-কথা জানা থাকতো, তাহলে এ জটিল পথে পা বাড়াতো কিনা আজ ভাবনার বস্তু। আজকে সে যেন প্রতিটি মানুষকে জানাতে চায় যে ভাবাসার পথ জটিল পথ। কণ্টকাকীর্ণ পথ। দীর্ঘ সাধনায় তবে উত্তোরণ। এবং উত্তোরণ সম্পর্কেও অনিশ্চিত্। সাফল্য আসতেও পারে। আবার নাও পারে। সুতরাং তোমরা এ বিপদ সঙ্কুল পথে পা বাড়িও না। আমি আজ আমার জীবনের মূল কথা, অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছি ঃ

"জো মৈ এসা জানতী
প্রেম কিয়ে দুঃখ হোয়।
নগর ঢ়িড়রা পীটঁতি
প্রেমণ কী জৈ কোয়॥"